এখন, জষ্ঠি মাসের এই বিকেলে গোটা আকাশ জুড়ে গলা কাঁসার রং ধরে আছে। পশ্চিম দিকের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর সন্ধ্যে হবার কথা। তবু এখনও রোদে ছুরির ধার। গরম বাতাস আগুনের ভাপ ছড়াতে ছড়াতে উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

নিচে ছোটনাগপুরের চাষের ক্ষেত। জায়গাটার নাম গারুদিয়া। এখানে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, চৌকো তেকোণা ছ-কোণা আট-কোণা, নানা মাপের নানা আকারের অগুণতি জমি। বহুকালের প্রাচীন আকাশের তলায় হাজার হাজার বছরের পুরনো সব শস্যক্ষেত্র পৃথিবীর গায়ে নানারকম জ্যামিতিক নকশা এঁকে পড়ে আছে।

চাষের ক্ষেতগুলোর একধারে হাইওয়ে। এই সড়ক দিয়ে একদিকে রাঁচী, আরেক দিকে পাটনার বাস যায়। গেল বছর বর্ষায় দক্ষিণ কোয়েলের বন্যায় হাইওয়ে ভেঙেচুরে গিয়েছিল। ঠিকাদাররা ভাঙা সড়কে মাটি ফেলেছে, তবে এখনও পীচ-টীচ পড়ে নি। বাস, ট্রাক, সাইকেল-রিকশা কিংবা বয়েল-গাড়ি অনবরত ছোটাছুটির ফলে বড় সড়কে সবসময় ঘন হয়ে ধুলো উড়ছে। ধুলোর চিকের আড়ালে ওদিকটা ঝাপসা। হাইওয়ের ওধারে দক্ষিণ কোয়েলের একটা রোগা সরু খাত এই জষ্ঠি মাসের রোদে শুকিয়ে ধু-ধু মরুভূমির মতো দেখায়।

অনেক দূরে আকাশ যেখানে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে মাটিতে নেমেছে সেখানে ছোটনাগপুরের একটা ছোটখাটো রেঞ্জ। এধারে ওধারে ট্যারাবাঁকা চেহারার কিছু কিছু সীসম গাছ, হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা ঢ্যাঙা তাল, ঝোপঝাড় কি আগাছার জঙ্গল ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছে।

একদিকে হাইওয়ে, আরেক দিকে ছোটনাগপুর রেঞ্জ—মাঝখানে এই গারুদিয়া তালুকের যাবতীয় জমিজমার মালিক একজন—রাজপুত ক্ষত্রিয় রঘুনাথ সিং। সড়কের ওধারে দক্ষিণ কোয়েলের পাড় ধরে

যত চাষের জমি সে-সব মিশিরলালজীর। ঐ জায়গাটার নাম বিজুরি —বিজুরি তালুক।

এখন এই গারুদিয়া মৌজার সব জমিতে হাল-লাঙল চলছে। পুরো চৈত্র আর বৈশাখ মাস রোদে পুড়ে পুড়ে মাটি ফুটিফাটা হয়ে আছে। দু-আড়াই মাস এক কণা বৃষ্টি পড়ে নি। বৃষ্টি দূরের কথা, এদিকের আট-দশটা তালুক বা মৌজার তিন-চার লাখ মানুষ ছিটেফোঁটা মেঘও দেখে নি। ফলে মাটি এখন পাথরের চাঙড়া হয়ে আছে।

রাজপুত রঘুনাথ সিং-এর একটা ছ-কোণা ক্ষেতে এখন বয়েল-টানা লাঙল চালাচ্ছে ধর্মা বা ধম্মা। তাঁদের গাঁও-মহল্লার মানুষজন অবশ্য ধম্মাই ডাকে। এ ডাকটা খাতির বা স্নেহবশতঃ। সে একাই না, চারদিকের অন্য সব জমিতেও লাঙল ঠেলছে ধাওতাল, রামনগিন, ঢোড়াইলাল, বুধেরি, এমনি আরো অনেকে। তাদের সঙ্গে শক্তসমর্থ মেয়েরাও জমিতে নেমেছে। লাঙলের ফলায় মাটি উপড়ে ফেলার পর তা থেকে কোদা (এক ধরনের আগাছা) কিংবা আগের সালের ফসলের শুকনো শেকড়-বাকড় বেছে একধারে জড়ো করে রাখছে।

রাজপুত রঘুনাথ সিং-এর তালুকে ধর্মা একজন বেগার-খাটা ভূমিদাস। সে শুধু একাই না, তার ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে যারা এখন মাটি চষছে তারাও তা-ই। কিন্তু এই ভূমিদাসদের জীবন বা সমাজের ইতিহাস এখন না।

ধর্মার বয়েস তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রং পোড়া তামার মতো। চৌকো মুখ, চওড়া মাংসল কাঁধ, পাথরের চাঙড়ার মতো বিশাল বুক, হাত দুটো কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত নেমে এসেছে, আঙুলগুলো মোটা মোটা এবং থ্যাবড়া, হাতের পাঞ্জা দুটো প্রকাণ্ড। তার কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, মুখে খাপচা খাপচা পাতলা দাড়ি-গোঁফ। পরনে হাতকাটা লাল গেঞ্জি আর ডোরা-দেওয়া ইজের। ঘামে ময়লায় সেগুলো চিটচিটে। গলায় কালো কারে রুপো-বাঁধানো বাঘনখ ঝুলছে।

বাঁ হাতের শক্ত মুঠে চেপে লাঙলের ফলা যতটা সম্ভব মাটির গর্ভে ঢুকিয়ে বয়েল দুটোর পিঠে ছপটি হাঁকায় ধর্মা, আর থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'উর-র-র, উঁ-র-র, উর-র-রা—'

জষ্ঠি মাসে রোদের হল্কায় তেজী বয়েল দুটোর চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকে। তবু জন্তু দুটো প্রাণপণে লাঙল টানে।

এদিকে লাঙলের ফালের ঘা লেগে পাথুরে মাটি থেকে আগুনের ফুলকি ছুটতে থাকে যেন।

যাই হোক না, মানুষ বা জন্তুর এখন রেহাই নেই। রঘুনাথ সিং দিন সাতেক আগে পাটনা গেছেন। তালুকের আর বাজার-গঞ্জের লোকজনরা বলাবলি করছিল, তিনি নাকি এবার এখানকার 'এম্লে' (এম-এল-এ) হবেন। সেই সব ব্যাপারেই দরকারী কাজে তাঁর পাটনা যাওয়া। ধর্মারা শুনেছে তিনি এম্লে বনার 'বাত পাক্কী' করে ফিরে আসার পর চাষের জন্য পালামৌর কিছু ওঁরাও, সাঁওতাল আর অচ্ছুৎ ক্ষেতমজুব আনা হবে। ওরা ফুরনের কিষাণ। চাষের মরসুমে ফী বছরই ওদের আনা হয়। মরসুম ভর কাজ করে। আবাদের কাজ শেষ হলেই ওদের বিদায় করা হয়। ফের ওরা আসবে সেই ফসল কাটার সময়। ক্ষেতিবাড়ি থেকে ধান, গেঁহু, বজরা, মুগ, মসুর, কলাই বা রবিচাষের ফসল কেটে রঘুনাথ সিংয়ের খামারে তুলে দিয়ে, ফিরে যাবে। কিন্তু যতদিন না রঘুনাথ সিং পাটনা থেকে ফিরছেন এবং ওঁরাও. সাঁওতাল বা ভূমিহীন কিষাণরা আসছে ততদিন ধর্মাদের এবং তাদের লাঙল-টানা জন্তুগুলোর জিরেন নেই। রঘুনাথ সিং হুকুম দিয়ে গেছেন, এ ক'দিনে অন্তত আধাআধি জমি চষে ফেলতেই হবে। কেননা আষাঢ়ে 'বারিষ' নামলে একদিনও দেরি করা হবে না; সঙ্গে সঙ্গে বীজ রোয়া শুরু করতে হবে।

লাঙল চালাতে চালাতে কোয়েলের শুকনো খাতের ওপারে তাকাল ধর্মা। শানানো রোদে চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে যায় তার। তা ছাড়া সারা গা বেয়ে ঢলের মতো ঘাম ঝরছে। কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা চোখের ওপর এসে পড়ে। হাতের পিঠে চোখ মুছে আবার তাকাল ধর্মা। মিশিরলালজীর তালুকেও লাঙল পড়েছে। তবে বয়েল-টানা লাঙল না, 'মিশিনের' লাঙল অর্থাৎ ট্রাকটর। গনগনে আকাশের তলায় ট্রাকটরের ভট ভট শব্দ আগুনের মতো লু-বাতাসে ভর করে খা-খা মাঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

রঘুনাথ সিংয়ের জমিনে চাষ-আবাদের হাল মান্ধাতা কি তার বাপ-ঠাকুরদার আমলের মতো। সেই বয়েল, সেই লাঙল। পুরানা জমানা এখানে হাজার বছর ধরে অনড়। আর কোয়েলের ওধারে মিশিরলালজীর জমিনে নয়া জমানা এসে গেছে। ওখানে পুরানা যুগের জন্তু অর্থাৎ বয়েল আর কামারের তৈরি লাঙল অচল। ক'বছর

হল ওখানে চাষের কাজে 'মিশিন' চলছে।

ধর্মা ভাবল, মিশিরলালজীর মতো রঘুনাথ সিং যদি 'মিশিনের' লাঙল আনাতেন! কিন্তু কোনদিন আনাবেন বলে তো মনে হয় না। তাঁর কাছে মানুষ আর বয়েলের মতো জানোয়ারগুলোর বড় কষ্ট!

পাশের জমি থেকে হট্টাকাট্টা চেহারার আধবুড়ো গণেরি অন্য দিনের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ন ঘটা (মেঘ), ন বারিষ (বৃষ্টি)। ধুপ আগ য্যায়সা (রোদ আগুনের মতো), মিট্টি পাত্থর বনী (মাটি পাথর হয়ে গেছে)। বহোত তখলিফ—'

ওধারের আরেকটা ক্ষেত থেকে ধাওতাল অভ্যাসবশে বলে উঠল, 'জেঠ মাহিনা (জ্যৈষ্ঠ মাস) কব খতম হোগি মালুম ন পড়ি—'

আরেক জন বলল, 'আকাশ থেকে যদি এরকম আগ গিরতে থাকে, আদমী নায় বাঁচেগা, নায় বাঁচেগা। সব মর যায়েগা।'

সবাই চারদিক থেকে সমস্বরে বলতে লাগল, 'হাঁ। অব রামজী ভরোসা। হো রামজী তেরে কিরপা—'

জ্যৈষ্ঠ মাসে আগুনমাখা আকাশের তলায় যেদিন থেকে হাল-লাঙল পড়েছে সেদিন থেকেই মানুষগুলো রোজ এই কথাই বলে আসছে। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে কবে আষাঢ় পড়বে, কবে জলকণা-ভরা কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাবে, জ্বলন্ত মাঠ-ঘাট আর বাতাসের উত্তাপ জুড়িয়ে কবে এই পৃথিবী স্নিগ্ধ এবং শীতল হবে সেই দিনের আশায় ওরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ধর্মা আবছাভাবে চারপাশের মানুষের কথাবার্তা শুনছে। তবে নিজে কিছু বলছে না। কোনদিনই সে কিছু বলে না। তার বাপ, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ—তিন-চার পুরুষ ধরে ফী বছর তারা রঘুনাথ সিংদের এই জমি লাঙলের ফলায় চৌরস করে আসছে। শুধু কি তারাই, চারপাশের বুধেরি, গণেরি, ধাওতাল—এমনি সবাই পুরুষানুক্রমে রঘুনাথ সিংয়ের জমি চষে আসছে। আকাশ থেকে রোদই ঝরুক কি আগুনই পড়ুক, জমি তাদের চষতে হবেই। পৃথিবীর মাটি ক্ষতবিক্ষত আর উথলপাথল করে বছরের পর বছর রঘুনাথ সিংদের জন্য ফসল ফলানো ছাড়া তাদের উপায় নেই। অহেতুক হা-হুতাশ করে কী হবে? তাদের জন্য যুগ-যুগান্ত ধরেই তো এই কষ্ট জমা হয়ে আছে।

ধর্মার জমিতে সে একলাই নেই। তাদের মহল্লার মেয়ে কুশীও রয়েছে।

ক'বছর ধরে ধর্মা মাঠে নামলেই কুশী তার লাঙলের পেছন পেছন ছুটতে থাকে। শুধু ক্ষেত চষার মরসুমেই না, বীজ রোয়া, নিড়ান দেওয়া, ফসল কাটা এবং পরে সেই ফসল রঘুনাথের গুদামে তোলা—সব কাজেই সারা বছর কুশী ধর্মার গায়ে ছায়ার মতো লেগে আছে। এখন এই জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মার লাঙলের ফালে মাটির ছিলকা উঠে আসার পর সেগুলো থেকে শুকনো শেকড়-বাকড় আর আগাছা বেছে সাফ করে যাচ্ছে সে।

কুশীর বয়েস উনিশ-কুড়ি। মাজা কাঁসার মতো গায়ের রং। গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, সাদা ঝকঝকে দাঁত, ভাসা ভাসা সরল নিষ্পাপ চোখ, মাথাভর্তি জট পাকানো ঝুপসি চুল। তার শক্ত গড়নের টান টান চেহারা সতেজ কোন গাছের কথা মনে পড়িয়ে ছায়।

কুশীর পরনে মোটা বনাতের হেটো রঙিন শাড়ি আর হলদে রঙের খাটো জামা। ঘামে শাড়ি ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। হাতে তার কাঁসার কাংনা, নাকে ঝুটো পাথর বসানো চাঁদির নাকফুল।

জষ্ঠি মাসের বেলা যত লম্বাই হোক, অফুরন্ত তো নয়। ধীর চালে হলেও সূর্যটা আকাশের ঢাল বেয়ে একসময় আরো অনেকখানি নেমে যায়। পশ্চিম দিকটা এখন তাজা রক্তের মতো টকটকে লাল। রোদের তাতও বেশ কমে এসেছে। মাথার ওপর দিয়ে সবুজ রঙের এক ঝাঁক বুনো তোতা ডানায় বাতাস চিরে চিরে চেঁচাতে চেঁচাতে কোয়েলের শুকনো খাতটার দিকে উড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের ট্রিহি ট্রিহি ডাক দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল।

সূর্য ডুববার ঠিক আগে আগে মাঠ থেকে ধর্মারা লাঙল তুলে ফেলে। আজও তুলতে যাবে, আচমকা পেছন থেকে কুশীর তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, 'হুই—দেখ দেখ—' বলে হাইওয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

ভুরুর ওপর হাত রেখে শেষ বেলার রোদ ঠেকাতে ঠেকাতে দূরে হাইওয়ের দিকে তাকায় ধর্মা। চারপাশের জমিতে যারা মাটি চষছিল তারাও কুশীর গলা শুনেছে। সেই লোকগুলোও চোখ আড়াল করে কুশীর আঙুল বরাবর হাইওয়ের দিকটা দেখতে লাগল।

বড় সড়কে এখন গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই। গোটা কয়েক সাইকেল-

রিকশা আর বয়েল-গাড়ি ঢিমে তালে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। তবে লাল ধুলোর কুয়াশাটা মাথার ওপর অনড় হয়ে আছেই।

খুবই মামুলী দৃশ্য ; আখছার চোখে পড়ে। এ আর দেখবার কী আছে? বিরক্ত গলায় ধর্মা গজগজিয়ে উঠল, 'সাইকিল রিকস আউর বয়েলকা গাড্ডি কা দেখেগা?'

কুশী সামনে এগিয়ে এল, 'নায় নায়, উ দেখ—'

এবার চোখে পড়ল। হাইওয়েটা মাঠের মাঝখান দিয়ে অনেকদূরে যেখানে ধু-ধু হয়ে গেছে সেখানে কালো কালো দুটো ফুটকি দেখা যাচ্ছে। ফুটকি দুটো দ্রুত এদিকে ছুটে আসতে থাকে। নাঃ, কুশীর উনিশ বছরের তেজী চোখের জোর আছে। তিন মাইল তফাত থেকে ও সব দেখতে পায়। একেবারে বাজপাখির নজর।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগে কুশী আবার বলে ওঠে, 'মালুম হোতা, বড়ে সরকারকা মোটরিয়া (মোটর)। সামমে (সামনে) জরুর মুনশীজী হোগা—'

কুশীর কথাই ঠিক। দেখতে দেখতে সেই চলন্ত কালো ফুটকি দুটো খানিকটা এগিয়ে এসে একটা পুরনো আমলের বড় বড় চাকাওলা হুডখোলা মোটর আর একটা হাড় বার-করা লঝঝড় সাইকেল হয়ে যায়। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—মোটরটার পেছনের সীটে গলায় যুঁই আর গোলাপের মালা ঝুলিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বসে আছেন বিশাল চেহারার মধ্যবয়সী বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। তাঁর দু পাশে এবং ফ্রন্ট সীটে ঠাসাঠাসি করে রয়েছেন তাঁরই জনা কয়েক দিলকা দোস্ত—প্রাণের বন্ধু। রঘুনাথ সিংয়ের এইসব পেয়ারের বন্ধুবান্ধবের কথা পরে।

মোটরটার কয়েক গজ আগে আগে একটা সাইকেল চালিয়ে আসছে মুনশী আজীবচাঁদজী। এক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরেছে সে, আরেক হাত দিয়ে একটা চোঙা মুখের কাছে ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনবরত কী যেন বলে যাচ্ছে। এতদূর থেকে তার কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মুনশীজীর বয়েস ষাটের কাছাকাছি। রস-বার-করে-নেওয়া আখের ছিবড়ের মতো চেহারা, হাত-পা এবং আঙুল গাঁট পাকানো। ছুঁচলো মুখে মুড়োনো গোঁফ, চোখ দুটো দু আঙুল করে গর্তে ঢোকানো। লম্বা বাঁকানো নাকের ওপর নিকেলের গোল বাই-ফোকাল চশমা

ঝুলছে। পরনে ধুতি, ধুতির তলায় শার্ট গুঁজে তার ওপর ধুসো কোট। জামার পকেটে সুতো-বাঁধা পকেট-ঘড়ি। মাথায় টুপি। তাকে দেখামাত্র ধূর্ত শেয়ালের কথা মনে পড়ে যায়। গারুদিয়া এবং আশেপাশের আট-দশটা তালুকের লোকজন জানে মুনশী আজীবচাঁদ রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুকুর। সর্বক্ষণ তার একমাত্র কাজ হলো মালিক বড়ে সরকারের পায়ের তলায় বসে কুঁই কুঁই করে ল্যাজ নাড়া আর দুনিয়ার তাবৎ আদমীর পেছনে কারণে বা অকারণে লাগা। তার ভয়ে গারুদিয়া তালুকের সব মানুষ তটস্থ হয়ে থাকে।

আজই যে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং পাটনা থেকে ফিরে আসবেন, ধর্মারা জানত না। তবে মুনশীজী নিশ্চয়ই জানত।

হাইওয়েটা পশ্চিম দিকে আড়াই মাইল গেলে সড়কের ধার ঘেঁষে রেল স্টেশন। এ-জায়গার নামেই স্টেশনটার নাম, অর্থাৎ গারুদিয়া। ধর্মারা যখন রঘুনাথ সিংয়ের জমি চষছে, তখন কোন ফাঁকে মুনশীজী সামনের সড়ক ধরে বড়ে সরকারকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল, কেউ খেয়াল করেনি।

এক সময় মোটর আর সাইকেলটা কাছাকাছি এসে পড়ল। এবার মুনশীজীর কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। গলার শিরাগুলো নারকেল দড়ির মতো ফুলিয়ে সে চিৎকার করে করে বলেছিল, 'হট যা, হট যা—বড়ে সরকার আ রহা হ্যায়। হট যা, হট যা—'

রিকশা, বয়েল কি ভৈসা গাড়িগুলো সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে কিনারে সরে গিয়ে গিয়ে রাস্তা করে দিতে লাগল। রিকশাওলা, বয়েল গাড়িওলা, ভৈসা গাড়িওলা এবং যারা সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তারা সবাই সসম্ভ্রমে রঘুনাথ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে জোড়হাতে বলতে লাগল, 'নমস্তে মালিক—' কিংবা 'নমস্তে বড়ে সরকার—'

মুনশীজীর গলার স্বর ক্রমাগত চড়ছিলই, 'আ রে হট যা, হট যা। এম্নে বড়ে সরকার যা রহা হ্যায়। হট যা রিকশাবালা, হট যা বয়েল গাড়িবালা, হট যা পায়দলবালা—' চিৎকারের চোটে তার চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন।

প্রাচীন আকাশের তলায় আধ-চষা মাঠের মাঝখানে আঁকা গুহাযুগের আদিম কোন চিত্রের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে যেতে থাকে ধর্মারা।

কিছুক্ষণ পর পুবদিকের একটা বাঁক ঘুরে ধুলোর ঝড় ওড়াতে ওড়াতে মুনশীজীর সাইকেল আর বড়ে সরকারের মোটরখানা অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপরও বেশ খানিকটা সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ধর্মারা। হঠাৎ পাশের ক্ষেত থেকে বুধেরি বলে উঠল, 'কা, বড়ে সরকার এম্লে হো গৈল?'

অন্য সবাই চারপাশের ক্ষেতগুলোতে বলাবলি করতে লাগল, 'হো গৈল—কা?'

'আ রে, নায় নায়—' আধবুড়ো গণেরি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আভি তক বড়ে সরকার এম্লে নায় বনি—'

সবাই গণেরির দিকে তাকাল, 'কী করে বুঝলে চাচা?'

জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা গণেরির। এই পৃথিবীতে পঞ্চাশ-ষাট বছর বেঁচে আছে সে। বহুকালের পুরনো চোখ দিয়ে অনেক কিছু দেখেছে, বহুকালের পুরনো কান দিয়ে অনেক কিছু শুনেছে। এখানকার বেগারখাটা ভূমিদাসেরা তার যে কোন মতামতকে খুব দামী মনে করে।

গণেরি বলল, 'এম্লে এ্যায়সা এ্যায়সা হওয়া যায় না। তার আগে চুনাও (নির্বাচন) হয় না? পাঁচ সাল আগে চুনাও হয়েছিল, মনে নেই? মোহর মেরে মেরে তোরা বাকসে (বাক্সে) ভোটের কাগজ ফেলে আসিস নি?'

সবার মনে পড়ে গেল। একসঙ্গে তারা বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, আভি ইয়াদ পড়ি—'

বুধেরি বলল, 'তাহলে এম্লে বনবার আগেই মুনশীজী বড়ে সরকারকে এম্লে বলছে কেন?'

গণেরি বলল, 'ও হারামী একটা কুত্তা, দিন-রাত জিভ দিয়ে বড়ে সরকারের নাগরা সাফাই করছে। শালে এম্লে বলে বলে মালিককে খুশ করছে। ওর মুখে তিনবার থুক। এক, দো, তিন —' বলে পর পর তিন বার মাটিতে থুতু ফেলল। ঘেন্নায় তার মুখ কুঁচকে যাচ্ছে।

অন্য সকলে কথা বললেও ধর্মা চুপচাপই রয়েছে। ওরা যা বলাবলি করছে, সে-সবই তার জানা। ভোট না হলে যে এম্লে বনা যায় না, এ-কথা ছোটবেলা থেকেই সে শুনে আসছে। পাঁচ সাল আগে এখানে শেষ যে ভোট হয়ে গিয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল কম। তাই

ছাপানো কাগজে মোহর 'ছাপ্পা' মেরে বাক্সে ফেলা হয়নি। এবার অবশ্য তার ভোটের উমর হয়েছে। কিন্তু যাদের বয়েস অনেক, দুনিয়ায় বহুকাল ধরে টিকে আছে তাদের তো জানা উচিত, ভোট না হলে এম্লে বনা যায় না। বার বার ছাপানো কাগজে মোহর মেরে এলেও কেন যে তারা এম্লে বনার নিয়মকানুন ভুলে যায়, কে জানে। সে কিন্তু এই মুহূর্তে ভোট, এম্লে, বড়ে সরকার ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ কিছুই ভাবছিল না। অন্য একটা কারণে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিল।

বড় সড়কের ওধারে কোয়েলের মরা খাত ধরে খানিকটা গেলে একটা সাবুই ঘাসের জঙ্গল। গরমকালের বিকেলে ওখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বগেড়ি পাখি এসে পড়ে। আজকাল কুশী আর সে রোজই ওখানে বগেড়ি ধরার জন্য দশ-বারোটা করে ফাঁদ পেতে আসে। সড়ক কি ব্রিজ তৈরির ঠিকাদাররা বগেড়ির মাংস ভীষণ পছন্দ করে। অঢেল কাঁচা পয়সা ওদের হাতে। দামও দেয় ভাল। ডজন তিন সাড়ে তিন রুপাইয়া।

টাকার খুবই দরকার ধর্মার। কাল সন্ধ্যেয় বাঁশের তৈরি যে ফান্দাগুলো তারা পেতে রেখে এসেছিল সেগুলোর ভেতর ক'টা বগেড়ি পড়েছে, জানার জন্য বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। আচমকা ধর্মা অন্যদের তাড়া লাগাল, 'সূরুয ডুবতে চলল। এবার লৌটবে (ফিরে যাবে) তো, না ক্ষেতিতে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

অন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'হঁ-হঁ, লৌটনা তো জরুর – '

রোজ সকালে রঘুনাথ সিংয়ের খামার থেকে হাল-বয়েল নিয়ে মাঠে আসে ধর্মারা। সূর্য ডোবার আগে পশু এবং লাঙল সেখানে বুঝিয়ে দেবার পর নিজেদের ঘরে ফিরতে পারে।

একটু পরে দেখা গেল, হাল-বয়েলের মিছিল চলেছে বড় সড়কের দিকে। হাইওয়েতে এসে ধর্মা কুশীকে বলল, 'তুই জঙ্গলে ফান্দাগুলোর কাছে যা। বয়েল আর লাঙল জমা দিয়ে আসছি।'

কুশী বলল, 'তুরন্ত চলে আসিস!'

'হাঁ।'

'দের নায় করনা—'

'নায়।'

কুশী আর দাঁড়াল না। হাইওয়ে থেকে নেমে দক্ষিণ কোয়েলের শুকনো খাতের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। যতদূর চোখ যায়, পড়ন্ত বেলার নির্জীব আলোয় লক্ষ কোটি ঝিকমিকে বালির দানা ছড়ানো দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতে একটি তামাটে চেহারার যুবতী ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। এখন কুশী ছুটছে, ছুটছে আর ছুটছে।

পেছন দিকে দেখা যায়, বিজুরি তালুকের ট্রাকটরগুলোও ফিরে যাচ্ছে। আজকের মতো ওদেরও কাজ শেষ।

এদিকে সারাদিন পর ক্লান্ত পশু এবং তাদের সঙ্গী মানুষেরা ধুলো ওড়াতে ওড়াতে বড় সড়ক ধরে রঘুনাথ সিংয়ের খামারের দিকে এগিয়ে চলল।

দুই

হাইওয়েটা যেখানে গিয়ে বাঁক নিয়ে ডাইনে ঘুরেছে, সেখান থেকে খানিকটা গেলে একটা ধুলোবোঝাই মেটে রাস্তা পড়ে। এত ধুলো যে পায়ের গোছ অব্দি ডুবে যায়। রাস্তাটা বড় সড়কের গা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় প্রথমে পড়ে রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়ি। ঢেউ-টিনের চাল আর দশ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল দেওয়া পঁচিশ-তিরিশটা বিরাট মাপের লম্বা লম্বা টানা ঘর পর পর দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, এই ঘরগুলো নানারকম শস্যে বা ফসলের বীজে সারা বছর বোঝাই হয়ে থাকে। আগের বছরের ধান, গেঁহু, জনার, মকাই, তিল, মুগ, মসুর, তিসি, সর্ষে, মাড়োয়া ইত্যাদি বিক্রি হয়ে যাবার পর নতুন বছরের ফসল তুলে গোলাঘরগুলো ভর্তি করে রাখা হয়।

ঘরগুলোর সামনের দিকে পনের-কুড়ি বিঘে জায়গা নিকিয়ে পরিষ্কার তকতকে করে রাখা হয়েছে। ওখানে ফসল শুকিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করা হয়। তারপর গোলায় তোলার পালা।

তকতকে জায়গাটার এক ধারে অনেকগুলো টিনের চালা। ঐ চালাগুলোর তলায় রঘুনাথ সিংয়ের শ-খানেক লাঙল-টানা বয়েল আর শ-খানেক গাড়ি-টানা মোষ থাকে। এতগুলো পশুর তদারকির জন্য রয়েছে বিশ-পঁচিশটা লোক। পশুগুলোকে দানাপানি দেওয়া,

চান করানো, বোখার হলে দশ মাইল দূরের শহর থেকে ভিটিনারি (ভেটারিনারি) ডাগদর ডেকে এনে দাওয়াই কি সুঁই ফোটানো— যাবতীয় কাজই তাদের করতে হয়। এ বাবদে রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে পেটের খোরাকি আর সারা বছরের জন্য খানতিনেক করে মোটা সুতোর জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই পায় না ওরা। ধর্মাদের মতো ওরাও পুরুষানুক্রমে বেগার দিয়ে চলেছে।

গরু-মোষের চালাগুলোর গায়ে হাল-লাঙল আর গাড়ি রাখার জায়গা। ওখানে উঁচু উঁচু চালা বানানো হয়েছে।

খামারবাড়ির গায়ে কতকগুলো নীচু নীচু মাটির ঘর। ঘরগুলো এখন খালি পড়ে আছে। চাষের কাজের জন্য বছরে মাস তিনেকের জন্য যে মরসুমী ফুরণের কিষাণদের নিয়ে আসা হয়, এ-বছর তারা এখনও আসেনি। ওরা এলে ওই ঘরগুলোতে থাকে।

ধর্মারা খামারবাড়িতে এসে দেখল অন্য দিনের মতো একেবারে সামনের ঘরটার দাওয়ায় পুরু গদির ওপর বসে আছে হিমগিরিনন্দন ঝা। রঘুনাথ সিংয়ের এই খামারটার পুরো দায়িত্ব তার ওপর। আর এই বারান্দাটা হলো তার সেরেস্তা। মর্যাদা বাড়াবার জন্য সে নিজে আংরেজি করে বলে কানটোল রুম (কনট্রোল রুম)। সকাল ছ'টা থেকে রাতের সিকি ভাগ পর্যন্ত এখানে বসে বসেই কিষাণ খাটানো, জমি চষার সময় হাল-বয়েল দেওয়া, সন্ধ্যেয় তাদের খোরাকি মেপে দেওয়া, ফসল রোয়ার দিনে কিষাণদের ভাগে ভাগে বীজ বেঁটে দেওয়া থেকে কোন গোলায় কী জাতের ফসল থাকবে তার হেফাজত করা পর্যন্ত সব দিকে হিমগিরিনন্দনের কড়া নজর। এমনিতে আর সব মানুষের মতো তার এক জোড়াই চোখ। কিন্তু আদতে হিমগিরির চোখ হলো হাজার খানেক। দুটো ছাড়া বাকী সবই অদৃশ্য। তার চোখে ধুলো ছিটিয়ে কারো ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

এই মুহূর্তে গদিতে বসে ধীর চালে অনবরত পা নাচিয়ে চলেছে হিমগিরি। এই পা নাচানোটা তার অনেককালের আদত। তার সামনে রয়েছে একটা উঁচু কাঠের ডেস্ক।

লোকটার বয়েস বাহান্ন-তিপান্ন। গোলগাল চেহারা ভারী নাক, মোটা ভুরুর তলায় ঢুলু-ঢুলু চোখ। বাইরে থেকে ঢুলু-ঢুলু ঘুমন্ত দেখলে কী হবে, এমন সজাগ তীক্ষ্ণ চোখ ভূ-ভারতে কারো নেই। মাথার কাঁচা-পাকা চুল প্রায় চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা, পেছন দিকে এক

গোছা লম্বা টিকির মাথায় ফুল বাঁধা। কপালে চন্দনের ছাপে দেবনাগরী হরফে লেখা 'জয় রাম, জয় রাম, জয় কিষুণ, জয় কিষুণ।' পরনে মোটা সুতোর পাড়হীন ধুতি আর কুর্তা।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ এই লোকটার চামড়া খুবই মিহি, মসৃণ আর তেলতেলে। গারুদিয়া তালুকের মানুষেরা বলে, 'ওর গা বেয়ে 'মাখ্খন' গড়িয়ে পড়ে।' লোকেরা আরো বলে, 'এই ঝা লোকটা হলো লাকড়া (নেকড়ে)। বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং-এর অনেকগুলো পোষা জন্তু রয়েছে। তাদের মধ্যে একটা লাকড়া, একটা সিয়ার (শিয়াল)। একজন হিমগিরিনন্দন ঝা, আরেকজন মুনশী আজীবচাঁদ।'

পা নাচাতে নাচাতে ধর্মাদের দিকে তাকাল হিমগিরি। বলল, 'এখনও তো সূরুয পুরা ডোবে নি, এর ভেতরেই কাম হয়ে গেল! হারামজাদাগুলো বহোত ফাঁকি দিচ্ছিস।' লোকটার গলার স্বর যেমন সরু তেমনি চড়া, কানের পর্দায় ছুঁচের মতো বিঁধে যায়। ঐ রকম মোটা ভারী তেল চুকচুকে শরীরের ভেতর থেকে কী করে যে এমন স্বর বেরোয় সেটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

ধর্মারা কেউ কিছু বলল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্বলন্ত আকাশের তলায় সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জমি চষার পরও বছরের পর বছর, আবহমান কাল ওরা ফাঁকি দেবার কথাই শুনে আসছে। কিন্তু হিমগিরিনন্দনের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস কারো নেই।

হিমগিরি ফের বলল, 'আজ যা করার করেছিস, কাল সূরুয ডোবার আগে জমিন থেকে হাল-বয়েল তুলে ফেললে খোরাকি কাটা যাবে। কানমে বাতঠো ঘুষল হো (কানে কথাটা ঢুকল)?'

সবাই ঘাড় কাত করে জানালো—ঘুষেছে।

'যা, আভি হাল ঔর বয়েলিয়া জমা কর—' বলেই ডেস্কের তলা থেকে পেটমোটা একটা দুধের বোতল বার করে গলায় উপুড় করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বগ বগ করে শব্দ উঠতে লাগল।

ধর্মারা জানে ঐ ডেস্কের তলায় দশ বারোটা দুধের বোতল সাজানো আছে। খাঁটি মোষের দুধ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খানিকক্ষণ পর পর দুধ খেয়ে যায় হিমগিরি। একেবারে বেড়ালের ধাত। বোতল বোতল স্নেহজাতীয় বস্তু গলা দিয়ে শরীরে ঢোকার ফলেই তার চামড়া এত মিহি, এত মোলায়েম আর জেল্লাদার।

বোতল শেষ করে একটা পৈতলের ডিবে থেকে আর ক্ষুরে এক খিলি পান
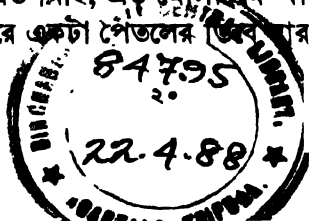
মুখে পুরল হিমগিরি। যতবার দুধ ততবার পান।

হিমগিরি যখন পান চিবুচ্ছে তখন ধর্মারা ওধারের বয়েল আর মোষ রাখার চালায় গিয়ে পশুগুলোকে জমা দিয়ে পাশের চালায় হাল-লাঙল রেখে এল। গরু মোষ এবং লাঙল-টাঙল বুঝে নেবার জন্য চালাগুলোতে অন্য লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। একটু এদিক ওদিক হলে তারা চেঁচিয়ে হিমগিরিকে জানিয়ে দেবে।

ধর্মা আর দেরি করল না। কোয়েলের খাতে সেই সাবুই ঘাসের জঙ্গলে কুশী দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বয়েল দুটো আর লাঙল নিয়ে ওধারের চালাগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

সামনের চালাটায় বাজেপোড়া তালগাছের মতো চেহারার আধ-বুড়ো রামধনিয়া ক্ষুদে ক্ষুদে গোল চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার হাত-পায়ের শিরাগুলো দড়ির মতো জট পাকানো। অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা আর আখাম্বা সে। সকালে এর কাছ থেকেই হাল-বয়েল নিয়ে গিয়েছিল ধর্মা। এগিয়ে গিয়ে সে বলে, 'এ লে, তুহারকা বয়েলিয়া আউর—'

রামধনিয়া লাঙলটা নিয়ে চালার একধারে খাড়া করে রাখে। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে বয়েল দুটোকে দেখতে থাকে। একটা বয়েলের আগাপাশতলা দেখা হয়ে যাবার পর একটা ছোকরাকে ডেকে পশুটাকে রাতের খাদ্য কিছু জাবনা দিতে বলে। তারপর দ্বিতীয় পশুটাকে লক্ষ্য করতে করতে আচমকা সেটার নাকে লম্বা কাটা দাগ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা-জড়ানো চেরা গলায় চেঁচায়, 'বয়েলিয়াকা নাক পর ক্যায়সা চোট হুয়া রে?'

কেমন করে বয়েলটার নাকে চোট লাগল, ধর্মা জানে না। খুব সম্ভব লাঙল টানার সময় জমির কাঁটাগাছ খেতে গিয়ে বা শক্ত শেকড়-টেকড়ে লেগে কেটে থাকবে। কিন্তু সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ অক্ষত একটি জন্তু দিয়ে সন্ধ্যেয় চোটলাগা অবস্থায় তাকে সহজে ফেরত নিতে চাইবে না রামধনিয়া। তাদের মতোই অচ্ছুৎ এই লোকটা এবং পেটভাতার ক্রীতদাস। তবু পুরুষানুক্রমে বড়ে সরকারের নৌকরগিরি করে করে তার আদতটাই খারাপ হয়ে গেছে। রঘুনাথ সিংয়ের জমিজমা, অচেতন এবং জীবন্ত তাবত সম্পত্তি সে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। সবই অভ্যাস। রক্তের মধ্যে প্রবাহিত বহু জমানার প্রাচীন সংস্কার।

এখনই রামধনিয়া বয়েলের নাকের আঁচড় নিয়ে গলার স্বর সাত

পর্দা চড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে হিমগিরিনন্দন চেঁচামেচির কারণটা জেনে যাবে। তার ফলাফল কী হতে পারে ভাবতেই গল গল করে ঘামতে শুরু করল ধর্মা। কাঁপা ভীত গলায় সে বলে, 'মালুম নায় রামধনিয়া ভাই—'

রামজীকা অসীম কিরপা, রামধনিয়া আজ কেন যেন চেঁচায় না। শুধু বলে, 'বহোত হোঁশিয়ার রহনা ধম্মা! মনে রাখিস তোর চাইতে এই জানবরের দাম অনেক বেশি। তুই মরলে কুছু হবে না। মগর এই বয়েলটার কুছু হলে বড়ে সরকারের পান শো (পাঁচশ), হাজার রুপাইয়া বরবাদ।'

ধর্মা মাথা নাড়ে, মনে রাখবে। তারপর রামজীর পায়ে মনে মনে দশবার মাথা ঠেকিয়ে ভাবে, একটা ফাঁড়া কাটল। সে আর দাঁড়ায় না, রামধনিয়ার কাছ থেকে সরে আসে। ওদিকে বয়েলটা রামধনিয়ার হাত থেকে সেই ছোকরার জিম্মায় চলে যায় এবং জন্তুটা তার রাতের বরাদ্দ কুচনো খড়, খোল এবং ভেলিগুড়ের মিশ্রিত মণ্ড পেয়ে যায়।

ধর্মার পর অন্য সবাই বয়েল লাঙল জমা দিতে থাকে।

বয়েলটয়েল বুঝিয়ে ধর্মারা যখন চলে যাবে সেই সময় হিমগিরি তদের ডাকল, 'শোন্—'

ধর্মারা কাছে এগিয়ে এলে হিমগিরির ঘুমন্ত ঢুলুঢুলু চোখ একেবারে বদলে গেল। চরকির মতো চোখ দুটো গণেরি, বুধেরি, ধর্মা থেকে শুরু করে সবগুলো মেয়ের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। খানিকক্ষণ দেখার পর ভুরু কুঁচকে বলল, 'সবাইকে তো দেখছি, ওহী ছোকরিয়া কঁহা গৈল?'

গণেরি জিজ্ঞেস করল, 'কৌন?'

'কুশী।'

গণেরি উত্তর দেবার আগে ধর্মা বলল, 'কুশী আয়ী নহী। ক্ষেতিসে চলি গয়ী।'

তীক্ষ্ণ সরু গলায় হিমগিরি চেঁচিয়ে উঠল, 'ঝুট। ছোকরিয়া কামমে নহী আয়ী। এক রোজ আদমী নহী ভেজা তো ব্যস কাম চৌপট। পেটের দানা এ্যায়সা এ্যায়সা মেলে!'

অন্য দিন সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দশবার করে জমিতে লোক পাঠায় হিমগিরি। নিজেও কখনও কখনও গিয়ে হানা দেয়। উদ্দেশ্য, কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা, সেটা লক্ষ্য রাখা। আজ ইচ্ছে করেই

লোক পাঠায় নি হিমগিরি। মাঝে মাঝে একটু ঢিলে দিয়ে সে দেখতে চায় কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কি না।

ধর্মা বলল, 'আয়ী সরকার। হামনিকো সাথ থী। পুরা রোজ কাম কিয়া থী।'

'ঝুট, পুরী ঝুট। শুনা হ্যায় উয়ো ছোকরিয়াকো সাথ তুহারকো পেয়ার চালু হো গ্যয়া। উসকী বাঁচানেকো বাহানা। ছোকরির এক রোজের খোরাকি আমি কাটব।'

'নায় নায় দেওতা, এ্যায়সা নায় করনা। উ আয়ী আ নহী আয়ী, সব কোইকো পুছো—এ গণেরি চাচা, এ বুধেরি চাচা, এ ঢোড়াইয়া, এ এতোয়ারী, এ শনচারী বোল্ তু লোগ, বোল্ না—' সবার দিকে ঘুরে ঘুরে কাকুতি মিনতি করতে লাগল ধর্মা। সারাদিন ঝলসানো রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে কুশী। তবু একটা ঝুটা অজুহাত তুলে তার খোরাকি কাটতে চাইছে এই মৈথিলী বামহনটা। কিন্তু কিছুতেই তা হতে দেবে না ধর্মা।

গণেরিরা এবার বলে উঠল, 'হঁ দেওতা, কুশী পুরী রোজ ক্ষেতিমে থী। আভি গৈল—ভগোয়ান রামজী কসম।'

হিমগিরি বলল, 'ঠিক আছে, আজকের দিনটা ছেড়ে দিলাম। লেকিন এক বাত, কাল থেকে সুবে সবাইকে এখানে আসতে হবে, আবার সামকো কাম পুরা হবার পরও সবাই আসবি। কানমে ঘুষল?'

অর্থাৎ সত্যি সত্যি ধর্মারা হাজিরা দিচ্ছে কিনা সেটাই এভাবে দেখতে চায় হিমগিরি। সবাই মাথা কাত করে জানালো কাল থেকে তারা দু'বারই এখানে আসবে।

একটু চুপচাপ। সবাইকে দেখতে দেখতে শনিচারীর ওপর নজর আটকে গেল হিমগিরির। জাবর কাটার মতো চাকুম চুকুম করে পান চিবিয়েই যাচ্ছিল সে। শনিচারীকে দেখতে দেখতে তার ভুরু কুঁচকে যেতে লাগল। মেয়েটার পেটে পাঁচ-ছ মাসের বাচ্চা রয়েছে।

শনিচারী লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিল না, একেবারে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে ঘাড় নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

বেশ খানিকটা সময় শনিচারীকে দেখার পর হিমগিরি গলার স্বর ঈষৎ চড়িয়ে বলে ওঠে, 'হারামজাদী কুত্তী—'

সবাই চুপ করে থাকে।

হিমগিরি আবার বলে, 'দো সাল আগে না একটা বাচ্চা হয়েছে তোর?'

শনিচারী উত্তর দেয় না। জগতের সবটুকু সঙ্কোচ সারা গায়ে মেখে নতচোখে দাঁড়িয়েই থাকে।

এদিকে হিমগিরি হঠাৎ ক্ষেপে উঠল যেন, 'মুহ্ সে বাত নিকালতে নহী! বহোত শরমবালী; হাঁ কি নায়—বোল্, বোল্—'

শনিচারী সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, 'জী দেওতা—'

'এখন তো বড়ী শরম। লেকেন মরদের সিনার ওপর সিনা চড়িয়ে না শুলে নিদ আসে না—ক্যা?'

শনিচারী চুপ।

অশ্রাব্য একটা খিস্তি দিয়ে হিমগিরি এবার বলে, 'হর সাল বাচ্চা পয়দা করবি। বাচ্চার বাহানা করে দো মাহিনা করে কামে ফাঁকি মারবি—এ নহী চলেগি। নায় কাম তো নায় খোরাকি। কানমে ঘুষল?'

'কানমে ঘুষল' শব্দ দুটো হিমগিরির কথার মাত্রা। শনিচারীরা ঘাড় কাত করে জানায় কানে ঢুকেছে।

সোমবারী, গাংনী, কুঁদরী—এমনি জনকয়েক সাদী-হওয়া যুবতী মেয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা চোখ ছোট করে এবার তাদের দিকে তাকায় হিমগিরি; সরু চাপা গলায় বলে, 'তোদের মতলব কী রে জোয়ানী মুরগীরা?'

কেউ উত্তর দিল না।

হিমগিরি বলে, 'একটা বাত মনে রাখিস। আপনা আপনা মরদদের সাথ জেয়াদা মজা লুটবি না। হর সাল মুরগীর মত যদি আণ্ডা পাড়িস আর ক্ষেতির কাম বন্ধ হয়ে যায় লাথ মারকে মারকে একেক জনের পাছার হাড্ডি তুড়ে দেব। কানমে ঘুষল?' বলেই বোতল বার করে গলায় বগ বগ শব্দ তুলে আবার খানিকটা ভয়সা দুধ খেয়ে মুখ মোছে। তারপর পান চিবুতে চিবুতে ফের বলে, 'আচ্ছা করকে শুনে রাখ, দশ সাল বাদ বাদ এক এক আণ্ডা। দো বাচ্চার পর ফুল ইস্টপ। গরমিন কানুন বানিয়ে দিয়েছে। কানমে ঘুষল?' মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কথা বলে সে।

সবাই নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচকিরির মতো পানের পিচ ফেলে হিমগিরি আবার বলে, 'ভাদই (ভাদ্র) মাসের কুত্তীর দল। মওকা পেলেই পেট ফোলাবার ধান্দা !'

কুঁদরী নামের মেয়েটা—তার রুক্ষ লালচে চুল ঝুঁটিবাঁধা, বুক যেন জোড়া পাহাড়, পাতলী কোমর, দেওদার গাছের গুঁড়ির মতো উরু—খুবই হাসিখুশি সে, তবে ডাকাবুকো। ভয়ডরটা তার কম, বামহন, অন্য উঁচা জাত, মুনশী, কাউকেই বিশেষ রেয়াত করে না। তাদের সামনাসামনি মুখের ওপর কিছু বলে না, তবে আড়ালে যা বলে তাতে ভয়ে অন্যদের বুক কাঁপে। তা ছাড়া তার জিভ ভীষণ আলগা, মুখে কোন কথাই আটকায় না। সোমবারীর কানের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, বুড়া লাকড়াটা ক্যা কহল রে! ছোকরিদের এহী সিনা, এহী কোমর, এহী জোয়ানি নিয়ে মরদের পাশে শোবে আর 'মরদ মেরে কাল্পন দুলহানিয়া' বলে তার সিনার ওপর যখন তার আওরতকে তুলে নেবে তখন এই বামহনটার কথা মনে থাকবে ?'

সোমবারী খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে দ্রুত চারপাশ দেখে নেয়, তারপর বলে, 'বেশরম—'

কুঁদরী বলতে লাগল, 'মরদ যখন আটার মতো ডলতে থাকে তখন শরম লাগে না ? শুনলেই বেশরম—ও হো-হো-হো—'

'চুপ হো যা। কোই শুনেগা—'

'শুনুক। দশ সাল বাদ বাদ এক এক আণ্ডা! তার আগে হলে বামহনটা পাছার হাড্ডি তুড়ে দেবে! ওহো-হো-হো, হাড্ডি তোড়নেবালা! বুড্ডা লাকড়ার মুখে তিন লাথ, তিন বার থুক—' বলে গুনে গুনে তিনবার থুতু ফেলল কুঁদরী।

সোমবারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'চুপ হো কুঁদরিয়া—চুপ হো যা—'

ঘুমন্ত হলে কী হবে, হিমগিরির চোখ হলো শকুনের চোখ আর কান দুটো কুকুরের কান। সে কুঁদরীদের দিকে তাকাল। কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যা বাত ? কী হয়েছে ?'

কুঁদরীটার মুখ আলগা, দুম করে কিছু বলে ফেলতে পারে, তার ফলাফল হবে খুবই খারাপ। তাই সোমবারী দম-আটকানো গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কুছ নায় দেওতা, কুছ নায়। এয়সা—দুসরা বাত—'

ধারাল সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে হিমগিরি। তবে আর কোন প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'কুঁদরী বহোত হারামী ঔরত।'

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সূর্যটা মিনিট কয়েক আগে ডুবে গেছে। হাল্কা অন্ধকার ছোটনাগপুরের এই অঞ্চলটার গায়ে উলঙ্গবাহার শাড়ির মতো জড়িয়ে রয়েছে।

ধর্মা ভয়ে ভয়ে একসময় বলে, 'বামহন দেওতা, আপহিকো হুকুম হো তো ঘর লৌট যায়—' কুশী অনেকক্ষণ কোয়েলের খাতে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার জন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিল সে।

তা ছাড়া আজ তাদের খোরাকি নেবার দিনও না। রঘুনাথ সিংয়ের চাষের জমিতে পেটভাতায় কাজের বদলে তাদের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ তা তারা রোজ পায় না ; একদিন পর পর পায়। কাল তু'দিনের খোরাকি তারা হিসেব করে নিয়ে গেছে। আবার আসছে কাল সারাদিন ক্ষেতিতে কাজের পর তু'দিনের খাদ্য পাবে।

হাল-লাঙল রাখার যে টানা টিনের চালাগুলো রয়েছে তার ওধারে যে তালাবন্ধ লম্বা চালাটা, সেখান থেকে ধর্মাদের ভাগের খাদ্য মেপে দেওয়া হয়।

যা বলার বলা হয়ে গেছে। হিমগিরি বলে, 'যা—' কিন্তু ধর্মারা যখন ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে সেই সময় কী মনে পড়ে যেতে খুব ব্যস্তভাবে ডেকে ওঠে, 'আরে শুন্ শুন্—'

সবাই ঘুরে দাঁড়ায়, 'জী—'

'ঘরে লৌটবার আগে একবার বড়ে সরকারের মকান হয়ে যা।'

বড়ে সরকার অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের সঙ্গে ধর্মাদের এমনিতে সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই। অত উঁচুতে যাবার সাহসও তাদের কোনদিনই হয় না। তাদের যাবতীয় কাজ-কারবার হিমগিরিনন্দনের সঙ্গে। হঠাৎ বড়ে সরকারের মকানে কেন তাদের যেতে হবে, সেটা ভেবে পায় না তারা। ধর্মারা মনে করতে পারে না, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং কখনও তাদের নিজের মকানে ডেকেছেন কিনা। শুধু তাদেরই না, রঘুনাথ সিংয়ের বাপ-ঠাকুরদা ধর্মাদের বাপ-ঠাকুরদাকে কখনও ডেকেছেন বলে তারা শোনেনি। একই সঙ্গে ভয় এবং কৌতূহল তাদের পেয়ে বসে।

হিমগিরি এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। বড়ে

সরকার এবার 'এম্লে' হতে যাচ্ছেন। তাই নিজের লোকেদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলবেন। পাটনা থেকে ফিরেই তিনি খবর পাঠিয়েছেন, বছরের পর বছর যারা তার কাছে কাজ করছে সেই সব আপনা আদমীরা জমিন থেকে ফিরলেই যেন তাঁর মকানে পাঠিয়ে দেয় হিমগিরি।

হিমগিরি আরো জানায়, বড়ে সরকার নিজে ধর্মাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, এটা তাদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য। খুবই খুশনসীব তারা। তাড়া লাগিয়ে বলে, যা যা, চলা যা—

ধর্মার অস্থিরতা বাড়ছিলই। বড়ে সরকারের বাড়ি যাওয়া মানে আরো খানিকটা সময় বরবাদ। আবার না গেলেও নয় তার ঘাড়ের ওপর এমন শক্ত মাথা নেই যাতে বলতে পারে—যাবে না। অগত্যা ঘাড় গুঁজে অন্য সবার সঙ্গে সে বড়ে সরকারের কোঠির দিকে এগিয়ে যায়।

তিন

খামার বাড়ি থেকে দেড়-দুই ফার্লং দূরে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং-এর প্রকাণ্ড কোঠি। পুরনো আমলের মোটা মোটা থামওলা বিশাল দোতলা বাড়িটা বানিয়েছিলেন রঘুনাথ সিং-এর ঠাকুর্দা মেহরাজ সিং। একতলা এবং দোতলা মিলিয়ে মোট শ দেড়েকের মতো বিরাট বিরাট ঘর। একেকটা দরজা আট ফুট উঁচু আর ছ ফুটের মতো চওড়া। জানলাগুলোতে খাঁজকাটা রঙিন কাচের শার্সি। ঘরের দেয়াল এবং ছাদে পঙ্খের কাজ আর প্রতিটি ঘরে ঝাড়লণ্ঠন। আগে ঝাড়লণ্ঠনের বাতিদানে মোম জ্বলত। রঘুনাথ সিং দশ মাইল দূরের সাব ডিভিসনাল টাউন থেকে নিজের পয়সায় শালকাঠের খুঁটি বসিয়ে বিজলী আনিয়েছেন। বাতিদানে এখন তাই নানা রঙের বাল্ব জ্বলে। প্রত্যেকটা দরজায় বড় বড় পেতলের গজাল বসানো। এগুলো বাহার খোলার জন্য।

দোতলার খানকতক ঘর জুড়ে রয়েছে ছোটোখাটো একটা মিউজিয়ম। রঘুনাথ সিংয়ের বাবা বনরাজ সিংজী ছিলেন দুর্দান্ত সৌখিন মানুষ। দেশ-বিদেশের নানা দুষ্প্রাপ্য কিউরিও যোগাড় করে

তিনি ঘরগুলো সাজিয়েছেন। তা ছাড়া শিকারেরও প্রচণ্ড শখ ছিল তাঁর। তিনটে ঘর ভর্তি রয়েছে বাঘ আর হরিণের ছাল, চিতার মুণ্ডু, পাইথনের চামড়া, হাতীর দাঁত ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠাকুরদা মেঘরাজজীব ছিল গানবাজনার ঝোঁক। ইণ্ডিয়ার নানা জায়গা থেকে ধ্রুপদ খেয়াল আর গজল গাইয়েদের এবং সেতার সরোদ আর এস্রাজ বাজিয়েদের আনিয়ে গান-বাজনা শুনতেন, নিজেও চর্চা করতেন। তাঁর বাজনার হাত এবং গানের গলা ছিল বেশ রেওয়াজী। দুটো ঘর বোঝাই হয়ে রাজ্যের সরোদ সেতার হারমোনিয়াম তবলা ডুগি তাঁর গানবাজনার স্মৃতি ধরে রেখেছে। তবে এখন এই কোঠিতে এ সবের সমঝদার কেউ নেই। মাঝে মধ্যে নৌকরদের দিয়ে ঐ ঘর দুটো খুলিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলি ঝাড়ামোছা করানো হয়। হাজার হোক পিতৃপুরুষের স্মৃতি তো।

বিরাট বাড়ির সামনের দিকে সুবিশাল কমপাউণ্ড। তার একধারে রয়েছে ঘোড়ার আস্তাবল। দামী দামী ডজনখানেক ওয়েলার ঘোড়া আছে রঘুনাথ সিংয়ের; আছে ঝকঝকে ফীটন। আর মোটা মোটা থামে বাঁধা রয়েছে গোটা তিনেক হাতী। কখনও সখনও ইচ্ছা হলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাতীতে চড়ে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে চিতা হরিণ কি পাখি শিকার করতে যান।

তবে মোটরের ব্যাপারে বিশেষ শখ নেই রঘুনাথ সিংয়ের। আজকাল কত রকমের ঝকঝকে নতুন ডিজাইনের মোটর বেরিয়েছে। কখনও সখনও যখন তিনি পাটনা বা কলকাতায় যান, সে সব চোখে পড়ে। ইচ্ছা করলে ঐ রকম দু-চারটে গাড়ি তিনি যখন তখন কিনে ফেলতে পারেন কিন্তু ইচ্ছা হয় না। পুরনো মডেলের বড় বড় চাকাওলা আর কাপড়ের হুড-লাগানো মোটর নিয়েই তিনি খুশী। মোট কথা সাবেক আমলের খানদানী চালের দিকেই তাঁর ঝোঁক।

হিন্দু কোড বিল পাশ হবার আগেই দুটো বিয়ে চুকিয়ে ফেলেছিলেন রঘুনাথ সিং। অবশ্য যে ভারতবর্ষে হিন্দু কোড বিল চালু আছে তার সীমানার বাইরে রঘুনাথ সিংয়ের এই গারুদিয়া তালুক। এখানে তাঁর নিজস্ব আরেক ভারতবর্ষ। ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্ট যত আইনকানুনই পাশ করুক, দিল্লী থেকে দু-আড়াই হাজার কিলোমিটার পার হয়ে তার খুব সামান্যই এখানে এসে পৌছুতে পারে। নিজের ইচ্ছামত কিছু আইনকানুন তৈরি করে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমটাকে প্রায় পুরোপুরিই বজায় রেখেছেন রঘুনাথ। ইচ্ছা করলে

একটা কেন, কয়েক ডজন বিয়ে করলেই বা তাঁকে ঠেকাচ্ছে কে !

তাঁর এক স্ত্রী স্বজাত রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ঘর থেকেই এসেছিল, আরেক জন এসেছে কায়াথদের ঘর থেকে। মহিলাটি ছিল মহকুমা হাসপাতালের নার্স। রাস্তায় তাকে দেখে মজে গিয়েছিলেন রঘুনাথ সিং। রাত্তিরে লোক পাঠিয়ে তার মুখে কাপড় গুঁজে নার্সের কোয়ার্টার্স থেকে তুলে এনেছিলেন। তবে রঘুনাথ সিংয়ের নাম তাঁদের কৌলিক ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে এই জন্য যে, নার্স মেয়েমানুষটির শাঁসটুকু খেয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেন নি। সেই রাত্তেই মৈথিলী পুরুত ডেকে রীতিমত বৈদিক মতে হোম-যজ্ঞটজ্ঞ করে বিয়ে করেছিলেন। এই নিয়ে প্রথম স্ত্রী খুব গণ্ডগোল করেছিল। হাজার হোক রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ঘরের মেয়ে, কয়েক শো বছর আগের একটা তেজী ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউণ্ড তো রয়েছে।

কিন্তু রঘুনাথ সিং মরদকা বাচ্চা। বলা যায় শেরের বাচ্চাও। গণ্ডগোল দু-দিনেই থামিয়ে দিয়েছিলেন। তবে রাজপুতের মেয়ে আর কায়াথের মেয়েতে বনিবনা হয়নি। পারতপক্ষে কেউ কারো মুখ দেখতে চায় না। একই কোঠির পিঞ্জরাতে দুই জেনানাকে দুই মহল্লায় রেখেছেন রঘুনাথ সিং। তিরিশ-বত্রিশ সাল পাশাপাশি থেকেও দুই সতীনের কথাবার্তা নেই। তাদের মধ্যে আমৃত্যু শত্রুতা এবং যুদ্ধ।

সতীনরা এ রকম হয়েই থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে মাথা ঘামান না রঘুনাথ সিং। কে কী করছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই তাঁর।

দুই স্ত্রীর সাতটি করে মোট চোদ্দটি ছেলেমেয়ে। এ ব্যাপারে রঘুনাথ সিংয়ের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই। দু'জনকেই নিরপেক্ষভাবে সমান সমান সন্তান উপহার দিয়েছেন। অন্য দিক থেকেও তিনি খুব বিবেচক। মাসের শুক্লপক্ষ এক স্ত্রীর কাছে কাটান, কৃষ্ণপক্ষ আরেক স্ত্রীর কাছে।

কায়াথনী আর রাজপুতানীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ, কথাবার্তা বন্ধ, দুই সতীনের দুই মহলের মাঝখানে অদৃশ্য কাচের বাউণ্ডারি ওয়াল। তা হলে কী হবে, চোদ্দটি সওতেলা ভাইবোনের মধ্যে মায়েদের মতো ঝগড়াঝাটি নেই। তারা মাঝখানের বাউণ্ডারি ভেঙে দু-ধারেই যাওয়া-আসা করে।

যাই হোক, পুরানো ফিউডাল জমানাই এ বাড়ির আবহাওয়ায়

অনড় হয়ে আছে।

ধর্মারা বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের কোঠিতে এসে দেখল, এই জষ্ঠি মাসে দশেরা কি রামনবমীর মতো পরব শুরু হয়ে গেছে। সামনের কমপাউণ্ডে অনেকগুলো ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোর তেজ এত বেশি যে মাটিতে সুঁই পড়লে তুলে নেওয়া যাবে।

কমপাউণ্ডের মাঝখানে সিংহাসনের মতো প্রকাণ্ড একটা হাতল-ওলা সোফায় বসে আছেন রঘুনাথ সিং। লোকটার গায়ে প্রচুর চর্বি। গোল চাকার মতো মুখ, প্রকাণ্ড কাঁধ, টেরি-কাটা বাবরি চুল, লম্বা টান টান নাক, ঘন ভুরুর তলায় ছোট ছোট চোখ গাল নিখুঁত কামানো, তবে একজোড়া মোমেমাজা ছুঁচলো গোঁফ রয়েছে।

রঘুনাথের পরনে চুস্ত আর ফিনফিনে কালিদার পাঞ্জাবি। গলায় সোনার সরু চেন হার। পাতলা পাঞ্জাবির তলায় সোনার চওড়া বিছে লাগানো বড় তাবিজ দেখা যাচ্ছে। পায়ে নকশা-করা নাগরা।

এই মুহূর্তে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের গলার সোনার হারের ওপর গোছা গোছা ফুলের মালা ঝুলছে। কপাল, মাথা এবং গালগলা আর চুস্ত পাঞ্জাবি গুলালে মাখামাখি।

তাঁকে ঘিরে এখন গারুদিয়া তালুকের প্রচুর মানুষজন মহকুমা শহরের বড় ভকিল গিরধরলালজী, বঙ্গালী ডাগদর শ্যামতুলাল সেন, হেড মাস্টারজি বদ্রীবিশাল চৌবে—এমনি আরো অনেকে এঁরা সবাই রঘুনাথ সিংয়ের বন্ধুবান্ধব, দিলের দোস্ত। নামেই দোস্ত। তবে এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ, গাঁওবালা ক্ষেতমজুর থেকে মহকুমা শহরের সরকারী সেরেস্তার ছোট কেরাণীবাবুটি পর্যন্ত সবাই জানে ঐ মাস্টেরজী ভকিলজী কি ডাগদরসাবরা রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা। নানাভাবে বড়ে সরকার নানা রকম কুকুর পুষে আসছেন। কেউ এক নম্বর কুত্তা, কেউ দু নম্বর কুত্তা, কেউ তিন নম্বর কুত্তা। চারদিকের হারামজাদা মানুষজন রঘুনাথ সিংয়ের বন্ধুবান্ধবের গায়ে এইভাবে নম্বর মেরে দিয়েছে। বড় সরকারের পা যে বেশি চাটতে পারে তার নম্বর আগের দিকে। যে তুলনায় কম চাটতে পারে তার নম্বর পেছন দিকে।

রঘুনাথ সিংয়ের চারপাশে তাঁর বন্ধুরা বলাবলি করছিলেন, 'ক্যা খুশ খবর, সিংজী এম-এল-এ বনেগা।'

'বাহোত আনন্দকা দিন।'

'পুরা দোনো তালুক বিজুরি ঔর গারুদিয়াকো ছে সাত লাখো অ্যাদমীকা ক্যা সৌভাগ—'

'ভগোয়ান রামজীকো কিরপা, সিংজী ইহাকা এম-এল-এ বননে রাজী হুয়া—'

চারদিকে এত কথা হচ্ছে, কিন্তু রঘুনাথ সিং একেবারে চুপচাপ। সারা মুখে তৃপ্তি এবং নকল বিনয়ের একটি হাসি ফুটিয়ে অনুগত কুকুরদের তোষামোদের কথাগুলো উপভোগ করছিলেন।

এদিকে এক নম্বর কুত্তা মুনশী আজীবচাঁদ গোটা মাথায় আর পোশাকটোশাকে গুলাল মেখে কাঁধে একটা পেল্লায় লাড্ডুর ঝোড়া চাপিয়ে ছোটাছুটি করছে আর সবাইকে লাড্ডু বিলোতে বিলোতে গলার শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিৎকার করে চলেছে, 'মেরে সরকার এম্লে বনে। হো রামজী, তেরে মায়া। লীজিয়ে ডাগদরসাব, লীজিয়ে ভকিল সাব, লীজিয়ে মাস্টার সাব—মুহ্ মিঠা কীজিয়ে। মেরে সরকার এম্লে বনে! ভেইয়া রামনৌশেরা, ভেইয়া ছেদিলালজী, ভেইয়া মধুকরজী মিঠাইয়া পাকড়ো—'

আজীবচাঁদ যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। রঘুনাথ সিং রাজধানী পাটনা থেকে আজ এম-এল-এ হবার টিকিট পেয়েছেন। সেই উপলক্ষে গুলাল মাখামাখি এবং লাড্ডু বিলি হচ্ছে। বড়ে সরকারের এই কোঠিতে কম করে তিরিশ-চল্লিশটা নোকর রয়েছে। তাদের কারো ঘাড়ে লাড্ডুর ঝোড়া চাপিয়ে বিলি করানো যেত। কিন্তু আজীবচাঁদ কাউকে সে দায়িত্ব দিতে নারাজ।

এ সব পরবের মতো ব্যাপার যেখানে চলছে সেখান থেকে কম করে একশো গজ দূরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মারা। সাহস করে কেউ আর এগুতে পারছিল না।

ধর্মার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কুঁদরী। সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ক্যা, জেঠ মাহিনামে ফাগোয়া আ গৈল? কায় আবীর, কায় গুলাল—'

ধর্মা জানালো, হোলি না। বড়ে সরকারের ভোটে নামার ব্যবস্থা পাকা হয়েছে। তাই খুশিতে গুলাল মাখা, মিঠাই খাওয়া চলছে।

বুধেরি ওধার থেকে বলে উঠল, 'ইসকা বীচমে হামনিকো (আমাদের) কায় বুলায়া?'

'ক্যা জানে।'

রাত হয়ে যাচ্ছে, কুশীটা সাবুই ঘাসের জঙ্গলে নিশ্চয়ই ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তা ছাড়া, অন্য একটা কারণে ধর্মার ভয় এবং দুশ্চিন্তা দুই-ই হতে থাকে। সন্ধ্যের পর অন্ধকার নামলে দক্ষিণ কোয়েলের ওদিকটায় কৈয়ারা হানা দেয়। কৈয়া বড়ই খতারনাক জানোয়ার। বাদামী রঙের এই জন্তুগুলো যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি হিংস্র। বেকায়দায় পেলে মানুষ তো ছার, বাঘকেই কাবু করে ফেলে। ধর্মা খুবই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এ অবস্থায় চলেও যাওয়া যায় না। বড়ে সরকারের কোঠি থেকে কখন যে ছাড়া পাওয়া যাবে তা-ই বা কে জানে।

আরো খানিকক্ষণ পর হঠাৎ রঘুনাথ সিংয়ের নজর এসে পড়ল ধর্মাদের ওপর। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর গলায় অজস্র স্নেহ ঢেলে তিনি হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে লাগলেন, 'কি রে তোরা অতদূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

বড়ে সরকার যে এভাবে কোনদিন কথা বলতে পারেন, ধর্মাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন ভাবতে পারে নি। বিহ্বলের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে তারা শুধু বলতে পারল, 'জী সরকার—'

'কাছে আয়।'

যে মালিক আবহমান কাল নাগরা দিয়ে তাদের পিঠে স্থায়ী নকশা এঁকে দিয়েছেন, পোষা পহলবান লাগিয়ে তাদের ঠেঙিয়েছেন, ঘরের চালে আগুন লাগিয়েছেন, তাঁর এত কোমল কণ্ঠস্বর বড়ই তাজ্জব কা বাত। নিজেদের ইচ্ছায় নয়, একটা ঘোরের মধ্যে তারা সামনে এগিয়ে এল।

বড়ে সরকার এবার সবাইকে দেখতে দেখতে বলতে লাগলেন, 'কেমন আছিস রে বুধেরি? তুই ঢোড়াইলাল? তুই কুঁদরি? তুই রামনেহাল?' জনে জনে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তিনি। প্রতিটি মানুষের নাম জানেন রঘুনাথ সিং। শুধু নামই না, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, কার ক'টা ছেলেমেয়ে এবং তাদের নামধাম—সব তাঁর মুখস্থ।

'জী, আচ্ছা—' উত্তর দিতে গিয়ে বুধেরিদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

'বালবাচ্চা কেমন আছে?'

'জী আপহিকো কিরপা। আচ্ছাই হ্যায়।'

'এ্যাই গণেরি, গেল সাল তোর বউর পেটে না জল জমেছিল?'

'জী সরকার। অসপাতাল (হাসপাতাল) ভেজা গেল।'

'এখন কেমন আছে সে?'

'ভালাই হো গৈল। আভিতক আচ্ছাই হ্যায় মালিক।'

'গিধনী তোর খবর কী?'

গিধনী নামের যুবতী বিধবা মেয়েটি চোখ নামিয়ে বলল, 'মালিক দেওতা, আপহিকো ক্ষেতির কাম করে যাচ্ছি।'

রঘুনাথ সিং বললেন, 'ক্ষেতির কাম তো পুরা জীওন আছেই। বাপ-মা নেই, মরদ নেই, জোয়ানী লড়কী। আপনা জাতের মধ্যে একটা ছোকরা দেখে সাদি করে ফেল। হামি তোর সাদির খরচা দিয়ে দেব।'

ওপাশ থেকে মুনশী আজীবচাঁদ লাড্ডু বিলি কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে ডুকরে ওঠার মতো শব্দ করল, 'হায় হায়, ক্যা দিল পায়ে বাড় সরকারকো। বেওয়া রাঁড়কো সাদির পুরা খরচা দিতে চাইছেন। সরকার এয়সে বনে তো জরুর রামরাজ আ যায়েগা—' বলেই আবার লাড্ডু বিতরণ শুরু করল।

এদিকে গিধনী থেকে আরম্ভ করে তাবত দলটা একেবারে হকচকিয়ে গেছে। বলছেন কী রঘুনাথ সিং! তারা কি সঠিক শুনছে! দুনিয়া কি হঠাৎ একেবারে উলট-পালট হয়ে গেল!

এই লোকগুলোর মনোভাব যেন খানিকটা আন্দাজ করতে পারলেন রঘুনাথ সিং। গলাটা আরো কোমল করে বললেন, 'আরে বাবা, হামি তোহারক আপনা আদমী—তোদের আপনজন। আমার কাছে তোরা থাকিস, আমার ক্ষেতিতে কামকাজ করিস। তোদের ভালাইতে তোদের বুরাইতে আমি পাশে থাকব না তো কে থাকবে?'

আজ কি ধর্মাদের শুধুই অবাক হবার পালা! একের পর এক কী বলে যাচ্ছেন রঘুনাথ সিং! তিনি তাদের খুদ আপনা আদমী—এমন কথা কি তারা কোনদিন স্বপ্নেও চিন্তা করেছে? মুনশী আজীবচাঁদ যে খানিক আগে রামরাজের কথা বলছিল—সত্যি সত্যিই কি তা এসে গেল! হো রামজী, তেরে কিরপা।

রঘুনাথ সিং ফের বললেন, 'এ গিধনীয় একটা ভালো লেড়কা পসন্দ করে ফেল। আগলে মাহিনায় ভোট। ভোটের পর তোর সাদি দিয়ে দেব।'

গিধনী আরক্ত লাজুক মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল। বাপ নেই, মা নেই—কেউ নেই তার। এই ভরা যৌবনে একটা সঙ্গীর বড় দরকার। নতুন করে সাদির স্বপ্ন এখনও দেখে সে। এই মুহূর্তে রঘুনাথ সিংয়ের কথা শুনতে শুনতে তার বুকের ভেতরটা বর্ষার কোয়েল হয়ে উঠল। নিজের মধ্যে উথালপাথাল তুফানের শব্দ শুনতে লাগল সে।

এবার রঘুনাথ সিং ধর্মার দিকে তাকালেন, 'তোর হালচাল কী রে ধর্মা ?'

ধর্মা জানালো, বড়ে সরকারের কিরপায় দিন কেটে যাচ্ছে।

'তোর মা-বাপ ভালো আছে ?'

'জী সরকার।'

এদিক সেদিক লক্ষ্য করতে করতে রঘুনাথ সিং বললেন, 'কুশীটাকে দেখতে পাচ্ছি না। ছোকরিটা তো তোর গায়ে সব সময় পরছাঁইয়ের মতো লেগে থাকে।'

ধর্মা বলল, 'ক্ষেতির কাম পুরা করে ও চলে গেছে।'

রঘুনাথ সিং ধর্মা আর কুশীর সম্পর্কটা খুব ভালো করেই জানেন। বললেন, 'কতদিন আর দু'জনে চরকির মতো ঘুরবি। এবার সাদিটা করে ফেল।'

গিধনীর মতোই লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে রইল ধর্মা।

রঘুনাথ আর কিছু না বলে ঘাড় ফিরিয়ে আজীবচাঁদকে ডাকালেন, 'মুনশী, এদের মিঠাইয়া দাও—'

'জী সরকার। তুরন্ত লাতে হ্যায়।' আজীবচাঁদ ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেখা গেল মুনশী আজীবচাঁদ প্রকাণ্ড লাড্ডুর একটা ঝোড়া নৌকরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে আসছে। অন্য সবাইকে নিজের হাতে মিঠাই বিলি করলেও অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের সে নৌকর দিয়েই দেওয়াবে। উঁচু বর্ণের মানুষ আজীবচাঁদ এই সক্কো-বেলায় জল-অচল বেগার-খাটিয়েদের ছুঁয়ে চোদ্দ-পুরুষকে নরকে পাঠাতে পারে না।

আজীবচাঁদ যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে সেই সময় একটা তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। রঘুনাথ সিং বললেন, 'মিঠাইয়ার ঝোড়া আমার কাছে আনো। নিজের হাতে আমি ওদের দেব।'

ধর্মারা আবার কী শুনছে! সরকার মালিক নিজের হাতে তাদের

মতো জল-অচল, অচ্ছুৎদের মিঠাইয়া বেঁটে দেবেন! হে ভগোয়ান, হো পবনসুত, ছুনিয়ায় কি সত্যি সত্যি স্বরগ নেমে এল! সবাই যে বলাবলি করছে, রঘুনাথ সিং এলে বনলে রামরাজ নেমে আসবে, সেটা এখন আর মিথ্যে মনে হচ্ছে না। অবশ্য রামরাজ ব্যাপারটা যে কী সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই ধর্মাদের। ভাসাভাসা-ভাবে তারা জানে রামরাজ কায়েম হলে তাদের এত দুঃখ এত কষ্ট থাকবে না, মোটামুটি সুখেই তারা থাকতে পারবে।

এদিকে রঘুনাথ সিং নিজের হাতে লাড্ডু বিলি করতে শুরু করেছেন। মাথা পিছু দুটো করে খাঁটি ভয়সা ঘিয়ে ভাজা দামী সুস্বাদু মিঠাই সবার হাতে দিতে লাগলেন। যাদের বাড়িতে বুড়োবুড়ি বা কাচ্চাবাচ্চা রয়েছে, হিসেব করে তাদের ভাগেরটাও গুনে গুনে দিলেন।

মুনশী আজীবচাঁদ যে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। দুই হাত কচলাতে কচলাতে শরীরটা নানাভাবে বাঁকিয়ে চুরিয়ে গদগদ ভঙ্গিতে সমানে বলে যাচ্ছিল, 'বড় সরকার মালিক আপনা হাতে অচ্ছুৎদের মিঠাইয়া দিচ্ছেন। রামরাজ আ গৈল রে, জরুর আ গৈল।'

সবাইকে মিঠাই দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ধর্মার পালা এল। রঘুনাথ সিং বললেন, 'এই নে—তোর মা-বাপের চারগো আর তোর দোগো—ছ'গো।'

ছ'টা লাড্ডু বেঁধে নিয়ে ধর্মা যখন কুশীর কথা ভাবছে সেইসময় রঘুনাথ সিং বললেন, 'তুই কিরকম জোয়ান রে?'

ধর্মা হকচকিয়ে গেল, 'জী—'

'আরে বুদ্ধু, স্রিফ নিজেই মিঠাইয়া খাবি। তোর দুলহানিয়ার জন্যে নিয়ে যাবি না?'

রঘুনাথ সিংয়ের বিবেচনার বহর দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল ধর্মা। কুশীর কথাটা তিনি ভোলেন নি। মনে মনে ধর্মা ঠিক করেই রেখেছিল নিজের ভাগ থেকে একটা লাড্ডু কুশীকে দেবে। বাপ-মায়ের ভাগ থেকে দেওয়া যাবে না। কেননা যখন তারা মহল্লার অন্য সবার মুখে শুনবে বড়ে সরকার মাথাপিছু দুটো করে লাড্ডু দিয়েছেন আর যখন দেখবে তাদের ভাগে দুটোর কম পড়েছে তখন চিল্লিয়ে সাতপাড়া মাথায় তুলে ফেলবে। বড়ে সরকার দেওতা, ভগোয়ান—তিনি যে কুশীকে ভোলেন নি সে জন্য মনে মনে ধর্মা আরো চোদ্দ জন্ম

তাঁর বাঁধা নৌকর হয়ে রইল।

রঘুনাথ সিং আবার বললেন, 'এই নে কুশীর দোগো, আর তার মা-বাপের চারগো—পুরা আধা ডজন।' বলে একটু মজা করলেন. 'দেখিস, তুলহানিয়ারটা আবার নিজেই খেয়ে ফেলিস না।'

কৃতজ্ঞ ধর্মা বলল, 'নায় সরকার—'

মিঠাই বিতরণ হয়ে গেলে রঘুনাথ সিং বললেন, 'যা, এবার ঘরে যা। পুরা রোজ ক্ষেতিতে কামকাজ করেছিস। আর তোদের আটকে রাখব না। ঘরে গিয়ে আরাম কর।'

ধর্মারা মাথা ঝুঁকিয়ে বড়ে সরকারকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে ফিরে চলল।

রঘুনাথ সিংয়ের কোঠি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতেই ধর্মারা দেখতে পেল, অনেক লোকজন এদিকে আসছে। সবই চেনা মুখ। গারুদিয়া তালুকের নানা গাঁও-এর মানুষ। বাজার-গঞ্জ আর দশ মাইল দূরের ছোট মহকুমা শহরের কিছু লোকও রয়েছে তাদের মধ্যে।

কাছাকাছি আসতেই লোকগুলো খুব আগ্রহের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ক্যা, বড়ে সরকার এম্লে বন্ গৈল ?'

গণেরি বলল, 'নহী। ভোটকা বাদ বনেগা জরুর।'

'শুনা গাঁওবালা সব কোইকো মিঠাইয়া দেগা বড়ে সরকার—'

'কিধর শুনা ?'

'মুনশীজী আদমী ভেজল, উ আদমী কহল। সচ্ ?'

বোঝা গেল, রঘুনাথ সিংয়ের ভোটে দাঁড়ানো উপলক্ষে মুনশী আজীবচাঁদ গাঁয়ে-গঞ্জে আর মহকুমা শহরে লোক পাঠিয়ে লাড্ডু খাবার নেমন্তন্ন করেছে। গণেরি ঘাড় কাত করে বলল, 'হাঁ, সচ্—'

লোকগুলোর চোখ চকচকিয়ে উঠল, 'ক্যা মিঠাইয়া ?'

'লাড্ডু।'

'হর আদমীকো ক'গো মিলল ?'

'দোগো।'

লোকগুলো আর দাঁড়ালো না। ঊর্ধ্বশ্বাসে রঘুনাথ সিংয়ের বড় মকানের দিকে দৌড় লাগাল। লাড্ডু ফুরিয়ে যাবার আগেই তাদের সেখানে পৌঁছুনো দরকার।

চার

কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মারা হাইওয়ের সেই জায়গাটায় এসে পড়ল যেখানে দক্ষিণ কোয়েলের শুখা খাতটা মিশিরলালজীর বিজুরি তালুকের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

ধর্মা বলল, 'তোরা গাঁওয়ে ফিরে যা। আমি পরে আসছি।' বলে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। লাফ দিয়ে কোয়েলের মরা খাতটায় নেমে ছুটতে লাগল।

এখন পূর্ণিমা চলছে। এই সন্ধ্যেরাতেই চাঁদির কটোরার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। গলানো রুপোর মতো টলটলে তরল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। কোথাও একফোঁটা মেঘ নেই। জ্যৈষ্ঠের ঝকঝকে নীলাকাশ সমস্ত চরাচরের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। তার গায়ে জরির ফুলের মতো অগুনতি তারা বসানো।

লক্ষ কোটি বছরের পুরনো চাঁদের আলো গায়ে মেখে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটা ছোটনাগপুরের গায়ে নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। যতদূর চোখ যায়, সাদা ধবধবে শুকনো বালি চিকচিক করে কোয়েলের তুধারে ধুধু ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, সেগুলোর গায়ে মানুষের তৈরি নানা জ্যামিতিক নকশা, এলোমেলো ঝোপঝাড় বা দু-একটা ঢ্যাঙা গাছটাছ—সব এই মুহূর্তে কেমন যেন আশ্চর্য মায়াবী মনে হতে থাকে।

বালির ওপর দিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে একসময় ঘন সাবুই ঘাসের জঙ্গলের কাছে এসে পড়ল ধর্মা। ঘাসবনের একধারে একা একা টাঙ্গি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কুশী আর মাঝে মাঝেই পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে মেরে কোয়েলের খাত ধরে সোজা হাইওয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকে রীতিমত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কুশীর পাশে অনেকগুলো বগেড়ি পাখি বালির ওপর পড়ে আছে, সেগুলোর পায়ে দড়ি বাঁধা। পাখিগুলোর পাশে পড়ে আছে কুড়ি-বাইশটা বাঁশের চৌকো চৌকো জালিকাটা ফাঁদ। ফাঁদের ভেতর থেকে পাখি বার করে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখেছে কুশী।

ধর্মাকে দেখে কুশী বলল, 'তখন বললি খামারে হাল-বয়েল জমা দিয়ে তুরন্ত চলে আসবি।'

ধর্মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ক্যা করে, বড়ে সরকারের কোঠিতে যেতে হল যে।'

কুশী বলল, 'আমি এদিকে তুহারকে লিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। কোই নহী ইধর, সিরিফ হামনি একেলী। বহোত ডর লাগি।'

ধর্মা জিজ্ঞেস করল, 'কৈয়া নিকলা?'

'নহী।'

'হামনিকো বহোত চিন্তা হুয়া—তু একেলী হ্যায়, কৈয়া নিকালনেসে মুশকিল হো যায়েগা।' বলে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল ধর্মা। স্বস্তির নিঃশ্বাস।

কুশী এবার বলে, 'কৈয়া নিকলা নহী, মগর মেজুর নিকলা বহোত—ঝুনকে ঝুন (দলে দলে)—' বলে সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

মেজুর অর্থাৎ ময়ুর। ধর্মার চোখে পড়ল খানিকটা দূরে কোয়েলের মরা খাতের চিকচিকে বালির ওপর ঝাঁক ঝাঁক ময়ুর পেখম মেলে ছোটাছুটি করছে। চাঁদের আলো দেখে ওধারের জঙ্গল থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে। ধর্মার একবার লোভ হয় পাথর ছুঁড়ে দু-একটা ময়ুর মারে। পরক্ষণে মনে পড়ে যায়, সরকার থেকে ঢ্যাড়া পিটিয়ে ময়ুর মারা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই লোভটিকে দমিয়ে রাখতে হয়।

একটু ভেবে কুশী এবার জিজ্ঞেস করে, 'বড়ে সরকারের কোঠিতে কেন গিয়েছিলি?'

'মিঠাইয়া দিল যে। এই লো—' কুশী এবং তার মা-বাপের ভাগের লাড্ডু দিতে দিতে ধর্মা বলল, 'একেলী খাস না, মা-বাপকেও দিস।'

হাত পেতে লাড্ডু নিতে নিতে কুশী জানতে চাইল, হঠাৎ মিঠাইয়া দিলেন কেন বড়ে সরকার। তাঁর লেড়কা-লেড়কীর বিয়ের কথাবার্তা কি পাক্কী হয়ে গেল?

লাড্ডু বিতরণের কারণটা জানাতে জানাতে হঠাৎ ধর্মার নজর এসে পড়ে দড়ি-বাঁধা পাখিগুলোর ওপর। খুশিতে সে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'আরে বহোত চিড়িয়া—' বলেই বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে গুনতে শুরু করে, 'এক দো তিন চার—আরে বাপ্পা, পুরা দো ডজন।' তিন ডজন অর্থাৎ ছত্রিশ পর্যন্ত নিভুর্ল গুনতে পারে ধর্মা, তারপরেই

গোলমাল করে ফেলে।

কুশী আবার অতটাও শুনতে পারে না। ধর্মার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বহোত দাম মিলি—নায় ?'

ধর্মা ঘাড় কাত করে বলল, 'হাঁ।' বলেই ফাঁদগুলো নতুন করে পেতে রাখে। রোজই ক্ষেতির কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে এসে ফাঁদ থেকে পাখি বার করে সেগুলো আবার পেতে রাখে সে। ফাঁদ পাতা হয়ে গেলে ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে একটা জায়গা থেকে বালি খুঁড়ে পাউডারের পুরনো ভারী একটা কৌটো বার করল। কৌটোটা রেজগি আর নোটে প্রায় বোঝাই।

পয়সার কৌটোটা কুশীর কাছে দিয়ে এক হাতে বগেড়িগুলো এবং আরেক হাতে লাড্ডুর প্যাকেট ঝুলিয়ে ধর্মা বলল, 'চল—'

রোজই ফাঁদে-পড়া পাখি আর পয়সার কৌটো নিয়ে ওরা এখান থেকে যায়। আজও গলানো চাঁদির মতো টলটলে মায়াবী জ্যোৎস্না গায়ে মেখে ধর্মা আর কুশী দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালি মাড়িয়ে হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চলল।

হাইওয়েটা ডান দিকে মিশিরলালজীদের বিজুরি তালুকের ভেতর দিয়ে মাইল দুয়েক দূরের ছোট রেল স্টেশনটাকে ছুঁয়ে পাটনার দিকে দৌড় লাগিয়েছে। আর বাঁ দিকে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়ি আর কোঠির পাশ দিয়ে চলে গেছে গারুদিয়া তালুকের গাঁও আর বাজার-গঞ্জের দিকে।

হাইওয়েতে উঠে ধর্মা আর কুশী বাঁ দিকে চলতে শুরু করল। আপাততঃ তারা যাচ্ছে গারুদিয়া বাজারে। ওখানে পাটনা থেকে ঠিকাদাররা এসে আস্তানা গেড়েছে। ক' সাল ধরে প্রায় বারো মাসই ওরা এখানে পড়ে থাকে। এ অঞ্চলে নতুন নতুন সড়ক তৈরি হচ্ছে, পুরনো রাস্তাঘাট মেরামত করা হচ্ছে, ব্রিজ বানানো হচ্ছে। 'গরমিনে'র এইসব কাজের ঠিকাদারি নিয়ে ওরা এখানে এসেছে।

হাইওয়ে একেবারে নির্জন। কচিৎ দু-একটা বয়েলগাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে রেল স্টেশনের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে গাড়িটার তলায় দোলায়মান লণ্ঠন জোনাকির মতো মনে হতে থাকে। আচমকা দু-একটা ট্রাক বা লঝঝড় প্রাইভেট বাস দু ধারের মাঠপ্রান্তর কাঁপিয়ে ছুটে যায়। তারপর আবার সব কিছু শান্ত, নিঝুম।

খানিকক্ষণ হাঁটবার পর মাঠের মাঝখানে দেহাতের পর দেহাত

চোখে পড়ে। ওখানে অগুনতি কেরোসিনের ডিবে কি হেরিকেনের মিটমিটে আলো দেখা যায়। ঐ সব গাঁও থেকে মানুষের গলার স্বর আবছাভাবে বাতাসে ভেসে আসতে থাকে।

অনেক মাঠ, অনেক গাঁও পেরিয়ে একসময় ধর্মা আর কুশী গারুদিয়ার বাজারে এসে পড়ল।

গারুদিয়া বাজারটা বেশ জমজমাট। এখানে বিজলি বাতি আছে, সার সার দোকানপাট আছে। বেশির ভাগই একতলা দোতলা পাকা মকান এখানে। আর আছে পুলিশ চৌকি, হোটেল, স্কুল, দাওয়াখানা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাজার থেকে খানিকটা দূরে মাঝারি গোছের 'গরমিন' রেস্ট হাউস। ওখানেই ঠিকাদারদের আস্তানা।

চেনা জায়গা। দু-আড়াই সাল ধরে প্রায় রোজই একবার করে এখানে আসছে ধর্মারা।

রেস্ট হাউসের সামনের দিকে অনেকটা ঘাসের জমি। সেখানে এই রাত্রিবেলা বেতের চেয়ার পেতে ঠিকাদারবাবুরা তাস খেলছে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে বিজলির তার টেনে একটা বাতি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথার ওপর।

ধর্মাদের দেখে ঠিকাদারবাবুদের তাস খেলা বন্ধ হলো। তারপরেই তাদের নজর এসে পড়ল বগেড়িগুলোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড় চোখ চকচকিয়ে উঠল। গলা মিলিয়ে তারা চেঁচাল, 'ইতনা বগেড়ি!' সত্যিই এর আগে একসঙ্গে এতগুলো পাখি ধর্মারা আর আনতে পারে নি।

ধর্মা বলল, 'হঁ সাব্, মিলা গৈল—'

মোটাসোটা চেহারার যে মধ্যবয়সী ঠিকাদারবাবুটি ধর্মার ডাইনে বসে আছে তার নাম অযোধ্যাপ্রসাদ। সে-ই যে এই ঠিকাদার কোম্পানির আসল মালিক, এতদিন যাতায়াতের ফলে সেটা জেনে ফেলেছে ধর্মারা। লোকটা প্রচণ্ড দারু আর মাংস খেতে পারে। বিশেষ করে বগেড়ি পাখির মাংস। দু-তিন বছরে পাঁচ সাত হাজার বগেড়ি তার পেটে ঢুকেছে। এভাবে চললে আর কিছুদিনের ভেতর ছোটনাগপুরের বগেড়ি বংশ যে সাফ হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে ধর্মার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না সে। পাখির বংশ রইল কি না রইল তাতে তার কী। তার পয়সা পাওয়া নিয়ে কথা।

এই পয়সাটা তার মুক্তি কেনার জন্য দরকার। বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের হাত থেকে তাদের আর কুশীদের ছাড়ান পেতে হলে পুরাপাক্কা দু হাজার রুপাইয়া চাই-ই চাই। দু-তিন সাল ধরে সেই পয়সাই জমিয়ে চলেছে তারা। কিন্তু এসব কথা পরে।

ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'বহোত আচ্ছা।' বলেই ছোঁ মেরে ধর্মার হাত থেকে দড়ি-বাঁধা বগেড়িগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলোর পেট টিপে টিপে পরখ করতে লাগল। পাখিগুলোর গা মাংসে ঠাসা। টেপাটেপি করতে করতে আরেক বার সে বলল, 'বহোত আচ্ছা—' শেষের বহোত আচ্ছাটা বগেড়িগুলো সম্পর্কে।

অনেক আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধর্মা। অযোধ্যাপ্রসাদের খুশী খুশী মুখ দেখে তার মনে হতে লাগল, আজ পয়সাটা বেশিই মিলবে।

অযোধ্যাপ্রসাদ পকেট থেকে একটা ব্যাগ বার করল। ব্যাগটা নোট আর রেজগিতে ফেটে পড়ছে।

কত রুপাইয়া আছে ঠিকাদারবাবুর ঐ ব্যাগটায়? দো হাজার হবে কি? ধর্মা ভাবতে চেষ্টা করল। অতগুলো টাকা নিশ্চয়ই কুশীদের তিনজন আর তাদের তিনজন মোট ছ'জনের মুক্তির দাম। ঐ টাকা-গুলো পেলে এখনই দৌড়ে গিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের মুনশীজীর মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারত। তারপর আঃ, কী স্বাধীন মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন!

অযোধ্যাপ্রসাদ নোটের তাড়া থেকে বগেড়ির দাম বার করতে করতে বলল, 'আজ তোদের এত দেরী হলো কেন রে? কখন থেকে দারু নিয়ে বসে আছি। বগেড়ি ভাজা ছাড়া দারু জমে!'

অন্যদিনে সন্ধ্যের আগে আগেই চলে আসে ধর্মারা। আজ সত্যিই দেরি হয়ে গেছে। ধর্মা বলল, 'বড়ে সরকার মিঠাইয়া খিলাইল। উসি লিয়ে—'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'মিঠাইয়া খিলাল কেন রে? লেড়কা-লেড়কীর মাঙ্গি?'

'নহী ঠিকাদার সাব।' লাড্ডু খাওয়ানোর কারণটা জানিয়ে দিল ধর্মা, 'বড়ে সরকার এম্লে বনেগা। উসি লিয়ে—'

এবার বেতের চেয়ারের ভেতর নড়েচড়ে বসল অযোধ্যাপ্রসাদ। হঠাৎ তাকে দারুণ উত্তেজিত মনে হলো এই মুহূর্তে। অন্য সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'সিংজী এম-এল-এ হতে যাচ্ছেন।

অন্য ঠিকাদাররা যাবার আগে কাল সকালে গিয়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে পরে কাজে লাগবে, না কি বল?'

অন্য সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ জরুর। আমাদের যা কাজ তাতে এরকম পাওয়ারফুল লোকেদের হাতে রাখা দরকার। তা হলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই এসব জায়গায় কন্ট্রাক্ট পেয়ে যাব।'

ধর্মা ওদের কথা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারছিল না। একদৃষ্টে সে শুধু টাকার ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে পাতা পড়ে না।

এবার ধর্মার দিকে ফিরল অযোধ্যাপ্রসাদ। বলল, 'বহোত বঢ়িয়া খবর দিয়েছিস। রঘুনাথ সিংজী এম-এল-এ হবেন। বহোত বঢ়িয়া বাত—' বলেই ব্যাগ থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বার করে ধর্মার দিকে ছুঁড়ে দিল। কুশীকে দেখিয়ে বলল, 'ভালাই খবরের জন্যে আজ বেশি পয়সা দিলাম। তুলহানিয়াকে একটা শাড়ি কিনে দিস।'

মাটি থেকে নোট তিনটে কুড়িয়ে নেবার পরও ধর্মার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। দু ডজন বগেড়ির জন্য নগদ ত্রিশ রুপাইয়া। এর আগে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার বেশি দাম কখনও পাওয়া যায় নি। কৃতজ্ঞতায় মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে ধর্মা আর কুশী বলল, 'নমস্তে ঠিকাদার সাব, নমস্তে '

এই ত্রিশটা টাকার কতখানি বগেড়ির জন্য এবং কতখানি রঘুনাথ সিংয়ের এম-এল-এ হবার খবর দেবার জন্য, ধর্মা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে কোয়েলের মরা খাতে ঝুনকে ঝুন মেজুরের ছবি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ঠিকাদার বহুবার তাদের ময়ূর মেরে আনতে বলেছে। ময়ূরের মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু। ঠিকাদার নাকের সামনে তাদের টোপ ঝুলিয়েই রেখেছে। ময়ূর ধরে আনতে পারলে অনেক বেশি দাম দেবে। দু ডজন বগেড়ির জন্য মিলেছে ত্রিশ রুপাইয়া। মেজুর এনে দিলে না জানি কত দাম পাওয়া যেত? কিন্তু সরকারী ঢ্যাঁড়া পড়েছে, ময়ূর মারা বারণ। কী আর করা যাবে! ধর্মা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'আজ যা, কাল বগেড়ি নিয়ে জলদি জলদি আসবি।'

'জী।' ধর্মারা চলে যায়।

পাঁচ

রোজই ঠিকাদারবাবুদের আস্তানায় বগেড়ি দিয়ে ধর্মা আর কুশী সোজা চলে যায় মাস্টারজীর কাছে। আজও তারা সেদিকে চলল।

গারুদিয়া বাজারের এক ধারে 'গরমিন' রেস্টহাউসে দু'খানা কামরা নিয়ে ঠিকাদাররা থাকে, বাজারের আরেক দিকে 'গরমিন' একটা স্কুল খুলেছে। মাস্টারজী সেখানে পড়ান।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের যে কারিক্রম (কার্যক্রম) রয়েছে, এই স্কুলটা তার মধ্যে পড়ে। উদ্দেশ্য হলো, সমাজের একেবারে নীচু স্তরে দারিদ্র্য-সীমার অনেক তলায় নানা দুরবস্থার মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার। কিছুটা লেখাপড়া শিখে গ্রামীণ নিরক্ষর গরীব মানুষদের যাতে চোখ ফোটে, তারা যাতে নিজের বুঝ নিজে বুঝে নিতে পারে, সেজন্য এটা একটা সরকারী উদ্যোগ।

কিন্তু এত সব লম্বা-চওড়া কথা ধর্মা বোঝে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বাজারের আরেক মাথায় নয়া স্কুলের টালির চাল দেওয়া বাড়িটার সামনে এসে পড়ল।

স্কুলের একপাশে একখানা ছোট টালির ঘরে থাকেন মাস্টারজী বদ্রীবিশাল পাণ্ডে। একাই থাকেন। নিজের হাতে রান্না করে খান। তাঁর রুগ্ন অসুস্থ স্ত্রী এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে থাকেন দেশের বাড়ি মোতিহারিতে। এখান থেকে ট্রেন বা বাসে যেভাবেই মোতিহারিতে যাওয়া যাক, দু-তিন বার গাড়ি বদলাতে হয়। সময়ও লাগে অনেকটা।

মাস্টারজী তাঁর ঘরের দাওয়ায় একটা সস্তা কাপড়ের ইজি চেয়ারে বসে দুলে দুলে কী একটা বই পড়ছেন। এই দোল খাওয়াটা তাঁর অভ্যাস। ঘরের চালের বাতা থেকে একটা লাইট ঝুলছে। দাওয়ার তলায় উঠোন। উঠোনের একধারে ছোটখাটো ফুলের আর সব্জীর বাগান। মাস্টারজী নিজের হাতে এই বাগানটা করেছেন।

উঠোন থেকে ধর্মা ডাকল, 'মাস্টারজী—'

মাস্টারজী ঘাড় ফেরালেন। সস্নেহে বললেন, 'ওপরে উঠে আয়।'

ধর্মা আর কুশী দাওয়ায় উঠে এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে।

মাস্টারজীর বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। পাতলা তুবলা শরীর। মাথার চুল আধাআধি কালো, আধাআধি সাদা। লম্বাটে মুখ, চশমার পুরু কাচের ওপাশে তুটি স্নেহময় চোখ। গালে প্রায় সব সময়ই তু-তিন দিনের না-কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরনে ঢলঢলে আধময়লা পাজামা আর মোটা খেলো ছিটের কুর্তা। ধর্মারা জানে এবং মাঝে মাঝেই টের পায় এই হাল্কা পলকা মাস্টারজীর মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিমান জবরদস্ত মানুষ রয়েছে।

মাস্টারজীর সঙ্গে তাদের আলাপ তিন চার সাল আগে। তখন সবে এই নয়া 'গরমিন' স্কুলটা খোলা হয়েছে। মাস্টারজী আরো তু-একজন মাস্টার সঙ্গে করে এটার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। অন্য মাস্টারজীরা এখনও আছেন। গারুদিয়া বাজারের ওধারে ঘর ভাড়া করে ছেলেপুলে আর জেনানা নিয়ে থাকেন।

এখানে এসে ছাত্রের খোঁজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছেন মাস্টারজী, ক্ষেতিতে ক্ষেতিতে হানা দিয়েছেন। সবার হাত ধরে বলেছেন, 'থোড়াসে লিখাপড়ী কর, পেটে তু-চারটে কালির অক্ষর ঢোকা। উপকার হবে, আঁখ ফুটবে। তুনিয়ার মানুষ তোদের ঠকাচ্ছে। 'লিখিপড়ী' আদমী হলে কেউ তোদের ঠকাতে পারবে না।'

মাস্টারজীর কথা শুনে তাদের মহল্লার বুড়োবুড়ি থেকে ছোকরা-ছুকরিরা পর্যন্ত সবাই দাঁত বার করে হেসেছে, 'মাস্টারজী ক্যা কহল্ হো? হামনিকো 'পড়িলিখী' আদমী বনাই? জজ ম্যাজিস্টার দারোগা ভকিল বনাই? হো রামজী, তেরে ক্যা তামাসা! হো রামজী—'

মাস্টারজী নাছোড়বান্দা। তিনি কোন কারণেই দমেন না। অপরিসীম তাঁর ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। হাল না ছেড়ে দিনের পর দিন পুরনো সাইকেলে চেপে ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ তুলে ছাত্র ধরতে বেরিয়েছেন।

এত পরিশ্রম আর সদিচ্ছা বিফলে যায় নি। ছোটনাগপুরের নানা দেহাত থেকে তিনি ভূমিদাস, কিষাণ, গেঁয়ো মজুর মজুরনী—এমনি কিছু কিছু ছাত্র জুটিয়ে ফেলেছেন। এদের বেশির ভাগই জীবনের আধাআধি কি তিনকাল পার করে দিয়েছে। সারাদিন মাঠে হাল-বয়েল ঠেলার পর তাদের কাছে প্রথম পাঠের বর্ণমালা জটিল ধাঁধার মতো মনে হতে থাকে। অথচ এগুলো না শিখলে নাকি 'লিখিপড়ী'র তুনিয়ায় ঢোকা যাবে না। 'অ আ' কী 'ক খ' ইত্যাদি শব্দ আওড়াতে

আওড়াতে তাদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসে।

যাদের ঢের উমর তারা একদিন আসে তো সাতদিন না-পাত্তা হয়ে যায়। যাদের বয়স কম তারাও রোজ আসে না। তবে একটা কাজ করেছেন মাস্টারজী। এইসব গরীব গাঁওবালা কিষাণ বা ভূমিদাসদের ঘরের ছোট ছেলেমেয়েদের দুপুরের দিকে তিনি স্কুলে টানতে পেরেছেন। তবে তাও খুব একটা নিয়মিত ব্যাপার না। বাপ-মাদের সঙ্গে যেদিন ওদের ক্ষেতিবাড়িতে যেতে হয় সেদিন ওরা আর স্কুলে ঘেঁষে না।

অনেককে জোটাতে পারলেও ধর্মা আর কুশীকে লেখাপড়ার জন্য টানতে পারেন নি মাস্টারজী। ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সারা-দিন বড়ে সরকারের ক্ষেতিবাড়ি কি খামারে হাড্ডি চুর চুর করে কাজের পর পয়সার ধান্দায় তাদের ঘুরতে হয়। কেননা বড়ে সরকারের কাছে কাজের জন্য তারা পায় শুধু পেটের খোরাকি আর হর সাল দু খানা করে মোটা বনাতের হেটো কাপড় এবং দুটো করে জামা আর কিছু মিট্টি তেল। এদিকে মুক্তির জন্য তাদের পয়সা চাই-ই চাই। যেভাবে হোক তাদের পয়সা কামাই করতেই হবে।

এই মুক্তির বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ধর্মা এবং কুশীরা কয়েক পুরুষ ধরে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংদের ভূমিদাস। ধর্মার আর কুশীর বাপ, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ রঘুনাথ সিংয়ের বাপ, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ এবং ঠাকুরদার বাপের বাপের জমিতে শুধু খোরাকির বদলে লাঙল ঠেলে আসছে। কত সাল আগে ধর্মাদের কোন পূর্বপুরুষ রঘুনাথ সিংয়ের কোনো পূর্বপুরুষের কাছ থেকে নাকি অঙ্গুঠার টিপছাপ দিয়ে টাকা 'করজ' নিয়েছিল। ধারের সেই টাকাটা ফুলে-ফেঁপে পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে। সেই টাকা শোধ করার জন্যই পুরুষানুক্রমে তারা বেগার দিয়ে যাচ্ছে।

তারপর কবে নাকি এর মধ্যে জমিদারি প্রথা-ট্রথা উঠে গেছে। কেউ নাকি অনেক বেশি জমিজমার মালিক থাকতে পারবে না। বাজারে-গঞ্জে নানা লোকের মুখে এইরকম কথাবার্তা কিছু কিছু যে ধর্মারা শোনে নি তা নয়। তবে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে নি।

কয়েক মাস আগে মুনশী আজীবচাঁদজী তাদের ডেকে নিয়ে 'গরমিনে'র ছাপানো কাগজে (স্ট্যাম্পড পেপারে) দু-দু'বার অঙ্গুঠার ছাপ নিয়ে বলেছিল, 'এবার থেকে তোরা জমিজমা ক্ষেতখামারের

মালিক বনলি। বড়ে সরকার কিরপা করে তোদের নামে জমিন লিখে দিলেন। আর বেশি দিন তোদের বড়ে সরকারের জমিনে খাটতে হবে না। তব্ এক বাত—'

ধর্মাদের মহল্লার বয়স্ক মুরুব্বিরা খুশিতে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ক্যা বাত মুনশীজী ?'

'এ্যায়সা এ্যায়সা তো ছুনিয়ায় কিছু হয় না। থোড়ে থোড়ে দাম দিতে হয়। বড়ে সরকারের ক্ষেতিতে আগের মতো কামকাজ করে যা। এক রোজ জমিন-উমিন মিলে যাবে।'

তারপর এক সাল যায়, আরেক সাল আসে। আরেক সাল যায়, তার পরের সাল আসে। কিন্তু জমির মালিক হওয়া দূরের কথা, ভূমিদাসের জীবন থেকেই তারা মুক্ত হতে পারে না। ক্রমে ধর্মারা জানতে পারে বড়ে সরকার তাঁর বেশির ভাগ জমিজমা তাদের নামে বেনামা করে নিজে অনেক টাকার ঋণে বাধা রেখেছেন। যে ছুটো কাগজে তাদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে তার একটা 'জমি' বেনামা করার জন্য। অন্যটা মিথ্যে ঋণের দায়ে জমি বাঁধা রাখার জন্য। প্রচুর টাকা দিতে পারলে তবেই জমিগুলো পেতে পারবে ধর্মারা। কিন্তু অত টাকা তারা কোথায় পাবে ? ফলে জমির মালিক হওয়ার স্বপ্নটা তাদের অনেক কাল আগেই উবে গেছে। তা ছাড়া রাগের মাথায় রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতখামার ছেড়ে যাবেই বা কোথায় ? প্রথমত, রঘুনাথ সিংয়ের পোষা মাইনে-করা পহেলবান (পালোয়ান) রয়েছে। কেউ এখান থেকে ভাগতে চাইলে মেরে তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেবে। দ্বিতীয়ত তাদের বাপ-ঠাকুরদারা অনেক টাকা নাকি আগে থেকেই রঘুনাথ সিংয়ের বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে কর্জ নিয়েছে। সেই টাকা সুদে-আসলে কোন অঙ্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কে জানে। টাকা শোধ না করে এখান থেকে তারা এক পা-ও নড়তে পারবে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু খোরাকির বদলে খেটে খেটে পূর্বপুরুষের ঋণ তাদের শোধ করে যেতেই হবে।

কিন্তু এই পরাধীন পশুর জীবন ধর্মা আর কুশীর কাছে একেবারেই কাম্য নয়। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে পরের জমিতে বেগার দিতে দিতে তারা পাশাপাশি ছুটি সতেজ গাছের মতো বড় হয়ে উঠেছে। তারপর কবে একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই তারা বুঝেছে একজনকে ছাড়া

আরেক জনের চলবে না। আর তা বুঝতে বুঝতেই নিজেদের মতো করে এক বাঞ্ছিত জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। ভেবেছে সুযোগ পেলেই এই ঘৃণ্য লাঞ্ছিত ক্রীতদাসের জীবন থেকে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবে।

একদিন ভয়ে ভয়ে ধর্মা মুনশী আজীবচাঁদজীর কাছে গিয়ে বলেছিল, 'মুনশীজী একগো বাত—'

আজীবচাঁদ কানে পালক গুঁজে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলেছিল, 'বাতা না—'

'মুনশীজী, হামনিকো বাপ-নানা আউর কুশীকো বাপ-নানাকো বড়ে সরকারকে পাশ কিতনা উধার (ধার) হ্যায় ?'

আজীবচাঁদ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেছিল। দু আঙুল গর্তে ঢোকানো তার চোখ দুটো একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছিল। ভুরু কুঁচকে শিয়ালের মতো ছুঁচলো মুখ আরো ছুঁচলো করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বহোত রুপাইয়া। শোধ করে দিবি নাকি ?'

ধর্মা আজীবচাঁদের চোখের দিকে তাকাতে পারে নি। ঘাড় নীচু করে পায়ের বড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে লম্বা লম্বা আঁচড় কাটতে কাটতে আবছা গলায় বলেছিল, 'নায়। রুপাইয়া কঁহা মিলি ! অ্যায়সাই জানতে ইচ্ছা হলো।'

'তাই বল। বহোত রুপাইয়া উধার—এক হাজার।'

এক হাজার যে কত টাকা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই ধর্মার। প্রতিধ্বনির মতো করে শুধু বলেছিল, 'এক হাজার !'

টেনে টেনে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আজীবচাঁদ বলেছিল, 'জী মহারাজ।'

'কুশীকো বাপ-নানাকো কিতনা উধার ?'

'ওদেরও হাজার রুপাইয়া।'

তার মানে তাদের এবং কুশীদের মুক্তির দাম দু হাজার টাকা ! ধর্মা কিন্তু এতটুকু দমেনি। সেদিন থেকেই মুক্তির দাম যোগাড় করার জন্য কুশীকে নিয়ে সে দক্ষিণ কোয়েলের খাতের দু ধারের জঙ্গলে আর প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে ফাঁদ পেতে বগেড়ি ধরছে। কখনও ঘন শাল বা কেঁদের জঙ্গলে কুকুর নিয়ে ঢুকে শুয়োর মেরে আনছে। কখনও সাপ বা হরিণ মেরে সে-গুলোর চামড়া খুলে নিচ্ছে। পাখি, শুয়োরের মাংস, সাপ বা হরিণের ছালের প্রচুর খদ্দের রয়েছে চারদিকে। প্রকৃতির চার ধারে প্রাণী এবং

উদ্ভিদজগতে যা কিছু আছে সবই মূল্যবান এবং মানুষের কাছে প্রয়োজনীয়। সে সব ধরে বা হত্যা করে মানুষের হাতে তুলে দিলে তার জন্য পয়সা পাওয়া যায়। পয়সা তো নয়, ধাতুর কিছু রেজগি আর কাগজে ছাপানো কিছু নোট এ সবই তাদের স্বাধীন জীবনের দাম। যেমন করে হোক ছোটনাগপুরের সমস্ত পশু আর পাখির জীবনের বিনিময়েও নিজেদের মুক্তি কিনে আনবে ধর্মারা।

মাস্টারজীর স্কুলে ঢুকে 'পড়িলিখী' আদমী না বনলেও রোজই ধর্মারা তাঁর কাছে আসে। তাঁর মতো সৎ নির্লোভ মানুষ আগে আর কখনও তারা ছাখে নি।

মাস্টারজী বললেন, 'তোদের জন্য কখন থেকে বসে আছি। এত দেরি করলি কেন ?'

দেরির কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল ধর্মা।

মাস্টারজী বললেন, 'বাহ্ বাহ্ রঘুনাথ সিংয়ের মতো আদমী এম-এল-এ হবেন। বাহ্—'

ধর্মা বলল, 'উসি লিয়েই মিঠাইয়া দিল।'

'বাহ্—'

'এবার হামনিকো পাইসা গিনতি করে দে—' বলে ধর্মা কুশীর কাছ থেকে টাকার কৌটোটা নিয়ে মাস্টারজীর হাতে দিল।

মাস্টারজী বললেন, 'এত জলদি কিসের। এই কুশী ঘরে যা। বড় কটোরার তলায় কী আছে, নিয়ে আয়।'

কুশী মাস্টারজীর শোবার ঘরে ঢুকে অ্যালুমিনিয়ামের কটোরার তলা থেকে দুটো আতা ফল আর দুটো শসা নিয়ে এল।

মাস্টারজী বললেন, 'তোদের জন্য রেখেছি। খা—'

কুশী বলল, 'তুহারকে লিয়ে—' অর্থাৎ মাস্টারজীর জন্য আতা-টাতা আছে কিনা তা জানতে চাইছে সে।

'আমি খেয়েছি।'

মাস্টারজীর ছাত্রছাত্রীরা কেউ না কেউ প্রায় রোজই 'পেয়ারসে' তাদের গাছের ফল-ফলারি তাঁকে দিয়ে যায়। গরীব মানুষদের কাছ থেকে এ সব নিতে ভাল লাগে না মাস্টারজীর। অনেক বারণ করেছেন তিনি, রাগারাগি করেছেন, কিন্তু গারুদিয়া বা বিজুরি তালুকের দিনমজুর, বেগারখাটা কিষাণ আর ভূমিহীন মানুষেরা যে

সময়ের যে ফল, মাস্টারজীকে তা দিয়ে যাবেই। না নিলে ওরা মনে মনে খুব কষ্ট পায়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত পেতে নিতে হয়।

ছাত্রছাত্রীরা যা দিয়ে যায় তার থেকে মাঝে মাঝে দু-একটা ফলপাকুড় ধর্মাদের জন্য রেখে দেন মাস্টারজী।

আতা এবং শসা ভাগাভাগি করে ধর্মারা খেতে লাগল। আজ তাদের পাওয়ার বরাত। বড়ে সরকারের মকানে মিঠাইয়া পাওয়া গেল, ঠিকাদারবাবুর কাছ থেকে বগেড়ির জন্য বেশি পয়সা পাওয়া গেল, তারপর মাস্টারজীর কাছে এখানে এসে মিলল গাছপাকা সুস্বাদু আতা আর শসা। আজকের দিনটা ভালই গেল। রোজ যদি এমন যেত!

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা খবর নিচ্ছিলেন মাস্টারজী। রঘুনাথ সিংয়ের হাজার হাজার একর জমির কতটা চষা হয়েছে, ধর্মাদের মহল্লায় কে কেমন আছে—এমনি টুকরো টুকরো নানা খবর। কথায় কথায় রঘুনাথ সিংয়ের 'এগ্নে' হওয়ার কথা উঠল। আজ লাড্ডু বিলির সময় তাঁর মকানে কারা কারা ছিল, সেখানে কী কী করা হয়েছে—সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন মাস্টারজী। প্রচুর গুলাল মাখামাখি হয়েছে এবং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং স্বয়ং নিজের হাতে ধর্মাদের মিঠাইয়া বেঁটে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে বহোত মিঠি গলায় 'আপনা আদমী'র মতো কথা বলেছেন—এসব শুনতে শুনতে চোখ কুঁচকে যেতে লাগল মাস্টারজীর। পরক্ষণেই তিনি হেসে ফেললেন। ইজিচেয়ারে বসে দুলে দুলে বলতে লাগলেন, 'ভোটের তৌহার (পরব) তা হলে এসে গেল!'

মাস্টারজীর কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ধর্মারা তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

মাস্টারজী ফের বললেন, 'বড়ে সরকার আপনা হাতে তোদের মিঠাইয়া দিল, মিঠাইয়ার থেকে বেশি মিঠি কথা বলল। তোদের কী বরাত রে!'

'হাঁ—' ধর্মা কুশী, দু'জনেই মাথা নাড়ল। বড়ে সরকারের আজকের এই আপনজনের মতো ব্যবহারে তারা অভিভূত।

'দ্যাখ, এই সৌভাগ তোদের কপালে কদ্দিন টেকে!' মাস্টারজীর স্বরে খানিকটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ যেন মেশানো। ধর্মা আর কুশী অবশ্য তা বুঝতে পারে না।

একটু চুপচাপ। তারপর মাস্টারজীই ফের বললেন, 'একটু চা

খাবি নাকি?'

মাস্টারজীর কাছে এলে রোজ রোজ ফল-ফলারি না মিললেও চা'টা মেলে। মাস্টারজীর এই চায়ের ওপর ধর্মাদের বড় লোভ। যেমন তার গন্ধ তেমনি স্বাদ। প্রচুর দুধ চিনি দিয়ে মাস্টারজী নিজের হাতে চা'টা এমনভাবে তৈরি করেন যা গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের আর কেউ পারে না। এখানে এলে এক 'গিলাস' করে না খেয়ে ধর্মারা যায় না। তবে চায়ের কথা মুখ ফুটে বলতে রোজ রোজ শরম লাগে কিন্তু মাস্টারজী তাদের মনের কথাটা কীভাবে যেন রোজই টের পেয়ে যান।

ধর্মা কুশী দু'জনেই লাজুক মুখে হেসে ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ চা নিশ্চয়ই খাবে।

মাস্টারজী বললেন, 'যা, ঘর থেকে সব এখানে নিয়ে আয়।'

সব বলতে 'মিট্টি তেলকা চুল্হা' (কেরোসিনের স্টোভ), পাত্তি চা আর চিনির কৌটো, দুধের কড়া, কেটলি, এনামেলের গেলাস ইত্যাদি ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম। দৌড়ে গিয়ে কুশী সেগুলো ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে আসে।

মাস্টারজী স্টোভ ধরিয়ে চা চাপিয়ে দিলেন। তারপর কুশীকে বললেন, 'তোকে একটু খাটাব।'

খাটুনিটা কিসের, কুশী জানে। মাস্টারজী একা মানুষ। নিজের হাতে রাঁধা-বাড়া করে খান। কিন্তু এ ব্যাপারটায় তাঁর ভীষণ আলসেমি। ইচ্ছে হল তো দু'খানা রোটি বা লিট্টি সেঁকে নিলেন, নইলে চালে আলু ডাল কি অন্য সবজি ফেলে ফুটিয়ে নিলেন। ঘরে ভয়সা ঘি আর হরা মিরচি মজুদই থাকে। আর যেদিন ইচ্ছে হয় না সেদিন চাট্টী চিড়ে-মুড়ি চিবিয়ে বা ছাতু গুলে খেয়ে নেন। তবে কিছুদিন ধরে কুশীরা আসছে। ওরা এলেই তিনি কুশীকে চালটাল ধুয়ে স্টোভে চড়িয়ে দিতে বলেন। ওরা বেশীক্ষণ থাকলে কুশীকে দিয়ে ভাত নামিয়ে ফেন গালিয়ে নেন। অচ্ছুৎ দোসাদদের মেয়েটা প্রথম প্রথম কিছুতেই বামহনের জন্য ভাত বসাতে চাইত না। কিন্তু মাস্টারজী নাছোড়বান্দা। এমনিতে তিনি উদার মানুষ, ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, জাতওয়ারি সওয়াল নিয়ে মাথা ঘামান না। ছোটখাট কিছু সংস্কার থাকলেও তিনি মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে জানেন। আগে আগে ভাত বসাবার জন্য কুশীকে ধমকধামক দিতে হত, জোরজারও

করতে হত। এখন আর ওসব কিছুই করতে হয় না। মাস্টারজীর মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে কুশী চাল এবং আলু-টালু ধুয়ে নিয়ে আসে। মানুষ যেভাবে দেওতার ভোগ সাজায় মাস্টারজীর জন্য ভাত বসাবার ব্যাপারে কুশীর ঠিক তেমনই যত্ন আর ভক্তি মেশানো থাকে।

মাস্টারজী আবার বললেন, 'চা খাওয়া হয়ে গেলে আমার ভাত চাপিয়ে দিস—'

কুশী কিন্তু চা খাওয়া পর্যন্ত বসে থাকে না; চাল এবং আনাজের খোঁজে তক্ষুনি উঠে যায়। খানিকক্ষণ পর সিলভারের ছোট্ট হাঁড়ি রূপোর মতো ঝকঝকে করে মেজে তাতে চাল ডাল আলু ধুয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে নিয়ে আসে। এর মধ্যে চা হয়ে যায়।

চা ছেঁকে গেলাসে গেলাসে ঢেলে দুধ চিনি মেশাতে থাকেন মাস্টারজী। এই ফাঁকে স্টোভে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে দেয় কুশী।

মাস্টারজীর চা হয়ে গিয়েছিল। গেলাসে গেলাসে ঢেলে ধর্মাদের দেবার পর নিজেও একটা গেলাস নিলেন।

পাছে চট করে ফুরিয়ে যায়, সেজন্য চায়ে লম্বা-চুমুক দেয় না ধর্মারা। চুক চুক করে একটু একটু খায়। যতক্ষণ চায়ের স্বাদটা জিভে ধরে রাখা যায়।

চা খেতে খেতে ধর্মা বলে, 'মাস্টারজী আব পাইসা গিনতি কর দে। আজ ঠিকাদারকো পাস তিশ রুপাইয়া মিলল। সব কোই জোড়কে দেখ কিতনা হৈল—' বলে পয়সার সেই ঢাউস কৌটোটা এগিয়ে দেয়।

মাস্টারজী হাত বাড়িয়ে কৌটোটা নিতে নিতে বললেন, 'তোদের কতবার বলেছি থোড়েসে 'পড়িলিখি' বন। তা হলে অন্যের কাছে পয়সা গোনাতে যেতে হবে না।'

ধর্মা বলল, 'নায় নায় মাস্টারজী, আভি নায়। আগে বড়ে সরকারের পাইসা শোধ করি, উসকে বাদ পড়িলিখি বনব।'

রোজ একই কথা বলেন মাস্টারজী আর ধর্মারা একই উত্তর দেয়।

মাস্টারজী কৌটোর ঢাকনা খুলে নোট এবং রেজগিগুলো বারান্দায় ঢেলে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুনতেও শুরু করেন। মোট দুশো দশ টাকা সত্তর পয়সা।

মাস্টারজী জানেন এই টাকাটা ধর্মাদের মোট দু-আড়াই বছরের সঞ্চয় এবং আরো জানেন, এটা ছোটনাগপুরের কয়েক হাজার বগেড়ি পাখি, কয়েক ডজন সাপ শুয়োর এবং হরিণের জীবনের দাম। অগুনতি

পশু আর পাখির মৃত্যুর বিনিময়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বাধীন জীবন কেনার জন্য তাদের এই সঞ্চয়।

ধর্মা জিজ্ঞেস করল, 'দো শো দশ রুপাইয়া সত্তর পাইসা কিতনা পাইসা? বহোত—নায়?'

মাস্টারজী হাসলেন। কিছু না বলে আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

ধর্মা আবার বলল, 'দো হাজার পুরা হোনেসে আউর কিতনা লাগি?'

অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের কাছে পূর্বপুরুষের সেই দু হাজার টাকা ঋণের কতটা কাছাকাছি তারা আসতে পেরেছে? মাস্টারজী কি করে বোঝাবেন, যে পরিশ্রমে যে কষ্টে এবং যেভাবে তারা পয়সা জমাচ্ছে তাতে রঘুনাথ সিংয়ের কর্জ শোধ করতে তাদের আয়ু কেটে যাবে। কিন্তু উজ্জ্বল স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখছে যারা তেমন দুটি আশাবাদী নিষ্পাপ সরল আনপড় যুবক-যুবতীকে হতাশ করতে ইচ্ছা হয় না। মাস্টারজী বলেন, 'জমিয়ে যা। একদিন 'করজ' ঠিক শোধ হয়ে যাবে।'

ধর্মা বলে, 'বহোত রাত হো গৈল। হামনিকো যানা পড়ি—'

'হাঁ, যা'

'কাল ফির আয়েগা।' যাবার সময় এই কথাটা ধর্মারা রোজই বলে।

মাস্টারজী বলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়।'

ধর্মারা উঠে পড়ে।

গারুদিয়া বাজারে মাস্টারজীর ঘর থেকে বেরিয়ে কোন দিনই ওরা হাইওয়ে দিয়ে নিজেদের মহল্লায় ফেরে না। বাজারের উত্তর দিকে খানিকটা গেলেই মাঠের মাঝখানে এলোমেলো ছড়ানো দেহাত। সেই সব দেহাতের ভেতর দিয়ে ওরা ঘুরতে ঘুরতে যায়।

গাঁ-টা ঘোরার পর দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার পাশে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে ওরা পয়সার কৌটোটা বালির তলায় পুঁতে রাখে, তারপর পাখি ধরার ফাঁদগুলো পেতে তবে ঘরে ফেরে।

গারুদিয়া বাজারের উত্তর দিকটায় দক্ষিণ আর পুব দিকের মতো জমজমাট ভাব নেই। এখানে দোকানপাট খুব কম। যা আছে সবই এলোমেলো ছড়ানো। তবে এ অঞ্চলেই রয়েছে কলালী (দিশী

মদের দোকান)।

অন্য দোকানগুলো এত রাতে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কলালী এখন সবগরম। কোশ, দু কোশের মধ্যে যত গাঁ আছে সব জায়গা থেকে নেশাখোরেরা সাঁঝের আঁধার নামলেই এখানে জমা হতে থাকে। রাত যত বাড়ে, এখানকার আসর ততই জমে ওঠে। কলালীর গাহেকদের বেশির ভাগই দেহাতী তাতমা, দোসাদ, ধোবী, গঙ্গু, গোয়ার, আদিবাসী সাঁওতাল, কুর্মী, মুণ্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে নেশার কোন জাতপাত নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে উচ্চবর্ণের দু-একজন বামহন-কায়াথও এখানে হানা দেয়।

মাস্টারজীর ঘর থেকে বেরিয়ে কলালীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে রোজ রাতেই শরাবীদের ভিড় চোখে পড়ে ধর্মাদের। গলা পর্যন্ত দারু গেলার পর তাদের জড়ানো গলার হৈ-হল্লা কানে আসে। কলালীর এই পথটুকু ওরা দু'জনে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝড়ের বেগে পার হয়ে যায়।

আজও যেতে যেতে দারুখানার আড্ডায় আচমকা নেশাখোরদের মধ্যে রামলছমনকে দেখতে পেল ধর্মারা। আজীবচাঁদ যেমন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা, রামলছমন তেমনি খামারবাড়ির কর্তা হিমগিরিনন্দনের পা-চাটা কুত্তা। বয়েস পঞ্চাশ বাহান্ন। বকের মতো চেহারা, বাঁকানো পিঠ, বাঁকানো নাক, লম্বা লম্বা লিকলিকে হাত-পা, গোল গোল চোখ, উঁচু কপালে পাতলা চুল, কপালে আর কানের লতিতে চন্দনের ফোঁটা। পরনে হাঁটুঝুল ধুতি আর কুর্তা, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা।

লোকটার আওরতের দোষ রয়েছে। বিল্লী যেমন মাছের গন্ধ পেলে ছোঁক ছোঁক করে, তেমনি কম বয়েসের ছিরিছাঁদওলা মেয়ে বা ছমকি আওরত দেখলেই রামছমন ঘাড় গুঁজে হামড়ে পড়ে।

কুশী ভয়ের গলায় বলল, 'কলালীমে বগুলা ভগত!' গারুদিয়ার মানুষজন, বিশেষ করে দোসাদ মহল্লার লোকেরা বিদ্রূপ করে রামলছমনকে বলে বগুলা ভকত অর্থাৎ বকধার্মিক। তার কারণও আছে। সে কথা পরে।

দু-আড়াই বছর ধরে শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস কলালীর পথ ধরে ধর্মারা বাড়ি ফেরে। কিন্তু আগে কোনদিনই দারুখানায় রামলছমনকে তারা দেখতে পায় নি। ধর্মা বলল, 'চুহাটা দারুও খায়! তুরন্ত ভাগ ইহাসে।' বলেই আরো জোরে পা চালিয়ে দেয় সে। বলা

যায় না, কুশীকে দেখলেই বগুলা ভকত কলালী থেকে দৌড়ে চলে আসতে পারে।

চোখের পলকে কলালীর রাস্তাটা পেরিয়ে যায় দু'জনে।

ছয়

কলালীর পর দু-চারটে টিনের চালা, পাঁচ-সাতটা ভাঙাচোরা মেটে বাড়ি। তারপর শুরু হয়েছে ছোটনাগপুরের আদিগন্ত ফসলের ক্ষেত। এই জষ্ঠি মাসে কোথাও ধান বা গেঁহুর একটা চারাও চোখে পড়ে না। ফাঁকা মাঠ একেবারে হা হা করতে থাকে।

রুপোর কটোরার মতো সেই চাঁদটা এখন আকাশের মাঝ-মধ্যিখানে উঠে এসেছে। গলানো চাঁদির মতো বহুকালের প্রাচীন জ্যোৎস্নায় বহুকালের পুরনো এই পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। আজন্মের চেনা ছোটনাগপুরের এই উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো প্রান্তর। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন যেন অপরিচিত আর আশ্চর্য মায়াবী মনে হতে থাকে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পুব থেকে পশ্চিমে হু-হু করে উল্টো-পাল্টা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। এই হাওয়া বড় সুখের। কে বলবে এখানকার মাঠঘাট এবং ফাঁকা শস্যক্ষেত্র দিনের বেলা জ্যৈষ্ঠের গনগনে রোদে একেবারে আগুন হয়ে থাকে! জ্যোৎস্নাধোয়া এই পৃথিবীতে কী মধুর স্নিগ্ধতা!

গারুদিয়া বাজার ছাড়িয়ে ধর্মারা মাঠে চলে এসেছিল। তাদের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পরদেশী শুগা (বিদেশী টিয়াপাখি) বাতাসে ডানা ছড়িয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মা আর কুশী মাঠের মাঝখানে একটা গাঁয়ে এসে পড়ে। গোয়ারদের (গোয়ালাদের) গাঁ। গোয়ালারা অবশ্য নিজেদের বলে যদুবংশীছত্রি।

যদুবংশী বা গোয়ারদের গাঁখানা কিন্তু চমৎকার। চারদিকে তক-তকে ঝকঝকে টিন কি মাটির বাড়িঘর, সামনের দিকে ঢালা 'আঙ্গন'। 'আঙ্গনে' ছোটখাটো ফুলের বাগান। এ গাঁয়ে হেন বাড়ি নেই যেখানে দশ বিশটা ভইস বা গাই নেই। বারোমাস দিনরাত গোয়ারদের এই গাঁয়ের বাতাসে একটা ভারি সুন্দর গন্ধ ভাসতে থাকে। ভয়সা

ঘিয়ের সুগন্ধ। প্রতিদিনই কোন না কোন বাড়িতে এখানে ঘি জ্বাল দেওয়া হয়। সেই ঘি বড় বড় টিনে বোঝাই হয়ে চলে যায় ভারী ভারী টৌনে—রাঁচীতে, ডালটনগঞ্জে, ধানবাদে, পাটনায়, কলকাত্তায়।

এখন, এই রাত্রিবেলা ঘরে ঘরে লাল মিট্টি তেলের ডিবিয়া কি কাচ-বসানো লণ্ঠন জ্বলছে।

এখানে, এই মুহূর্তে চারদিকে টুকরো টুকরো ঘর-সংসারের ছবি চোখে পড়ে। ঘরের দাওয়ায় বসে কোন সুহাগিন আওরত এনামেলের থারিতে (থালায়) তার মরদ আর ছেলেপুলেকে খেতে দিচ্ছে। কেউ চুলহার ধারে বসে রোটি বা লিট্টি সেঁকছে আর তার ঘরবালা কাছে বসে চাকী-বেলনায় আটার গোল গোল ডেলা বেলে বেলে দিচ্ছে। কোথাও কোন 'পুরুখ' সারাদিন গতর-চূরণ খাটুনির পর তার প্যারা ছুলহানিয়ার গা ঘেঁষে বসে খুনসুটি করে যাচ্ছে।

কোথাও বসেছে গান-বাজনার আসর। একটা গোটা পরিবারের মেয়ে-পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা ঢোলক এবং ঢাউস ঢাউস করতাল বাজিয়ে হোলির গান গেয়ে চলেছে।

'খেলনে নিকালি অযোধাবালী—
হোলি খেলনে, কিনকার হাতে
আবীর কি ঝোলি, রামজীকি হাতে
কনক পিচকারী। লছমনকি হাতে
আবীরকা ঝোলি……
হোলি খেলনে নিকালী অযোধাবালী
হোয় হোয় হোয়, আয়া রে হোলি
নিকালি অযোধাবালী—

এবার সেই কোন চৈত্র মাসে হোলি হয়ে গেছে। এখন জেঠ মাহিনা চলছে। তু-আড়াই মাস পার হতে চলল কিন্তু ছোটনাগপুরের এই গাঁ থেকে হোলির তৌহারের দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না। শুধু গোয়ার বা যতুবংশীদের এই গাঁয়েই নাকি, ধর্মাদের নিজেদের মহল্লাতেও এখনও হোলির জের চলছে।

তুর্ভাবনাশূন্য এই সুখী স্বাধীন মুক্ত মানুষদের দেখতে দেখতে ধর্মা আর কুশীর চোখ লোভে চকচক করতে থাকে। যৌবনের শুরু থেকে এই রকম একটা কাম্য জীবনের স্বপ্নই তো তারা দেখে আসছে। কিন্তু ঐ স্বপ্ন পর্যন্তই।

রোজই গোয়ারপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বেশ খানিকটা সময় নেই ধর্মারা। চোখ ভরে এই সব মানুষের ঘরকন্না এবং আদর সোহাগের ছবি যতক্ষণ দেখা যায়।

গাঁ'টার নাম চৌকাদ। চৌকাদের সব মানুষই ওদের চেনে। রোজ এখান দিয়ে যাতায়াতের ফলে ভূমিদাস অচ্ছুৎ দোসাদদের এই ছেলেমেয়ে হুটোকে মোটামুটি সবাই স্নেহও করে। অবশ্য জলচর গোয়ারদের পক্ষে দূরত্ব রেখে এবং ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে যতখানি স্নেহ দেখানো সম্ভব ততটুকুই দেখায়; তার একচুল বেশি না।

ওরা যখন চৌকাদের ভেতর দিয়ে যায় তখন রোজই গোয়ার আর গোয়ারিনরা ডেকে ডেকে কথা বলে। আজও তারা ডাকাডাকি করতে থাকে।

'এ কোশিয়া, এ ধম্মা--আ যা। বৈঠ ইঁহা—'

সবাই তাদের বসতে বলে; তবে ঘরে উঠতে দেয় না। উঠোনে বা 'আঙ্গনে'র একধারে তাদের বসতে হয়।

ধর্মা বলে, 'নায় জী, রাত বহোত হো গৈল—'

'আরে বৈঠ না—'

'নায় জী, আজ মাফি মাঙে। কাল বৈঠেগা।'

কেউ বলে, 'চায় পীকে যা—'

ধর্মারা একই জবাব দেয়। রাত অনেক হয়ে গেছে। আর দেরি করা যাবে না। এমন কি চায়ের লোভেও না।

কেউ ঠাট্টার গলায় বলে, 'কালাপন তুলহানিয়াকে নিয়ে তিন চার সাল সিরেফ চরকির মতো ঘুমছিস ফিরছিস। এবার সাদি করে ফেল--'

রোজ রাত্রিবেলা মাস্টারজীকে দিয়ে টাকা গুনিয়ে চৌকাদ গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে এই বিয়ের কথাটা কম করে দশ বিশজনের কাছে শুনতে হয় ধর্মা এবং কুশীকে। অন্য দিনের মতো আজও তার মাথা লজ্জায় নীচু হয়ে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে সে টের পায়, কুশীর মুখও আরক্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মা আবছা কাঁপা গলায় বলে, 'রামজীর কিরপা হলে সাদি জরুর হয়ে যাবে।'

আজ চৌকাদ গাঁয়ের মাঝামাঝি আসার পর ভিখুন গোয়ারের ঘরবালী বলে ওঠে, 'তুই পুরুখ (পুরুষ) না কি রে? জোয়ানী মুরগীকে সাথ সাথ নিয়ে তিন চার সাল ঘুমছিস। সাদিউদির ফিকির নেই। তুরন্ত ছোকরির কপালে সিন্নুর (সিঁদুর) চড়িয়ে

বিস্তারায় (বিছানায়) নিয়ে ফেল্‌—' বলে কোমরে লছক তুলে গা তুলিয়ে তুলিয়ে আর আঙুল মটকে মটকে অশ্লীল একটা ছড়া কাটে।

এই মাঝবয়সী মেয়েমানুষটার চুল আধাআধি সফেদ হয়ে গেছে। গায়ে চাপ চাপ চর্বি-মাখন। দাঁত তুরপুনে কুরে রুপো দিয়ে বাঁধানো। সেই বাঁধানো দাঁত মেলে হেন নোংরা অশ্লীল কথা নেই যা সে মুখ দিয়ে বার করতে পারে না। তা ছাড়া এ গাঁয়ের সব চাইতে দুর্ধর্ষ কুঁদুলে আর শ্রেষ্ঠ ঝগড়াটি সে। তার বাঁশ-ফাটা গলার আওয়াজে ভয় পায় না তেমন পুরুষ বা আওরত চৌকাদ গাঁয়ে এখনও জন্মায় নি। কাজে কাজেই ভিখুন গোয়ারের এই ঘরবালীকে দেখলে বুক শুকিয়ে যায় ধর্মার। জড়ানো গলায় কিছু একটা বলে কুশীকে নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে সে এগিয়ে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় দু'জনে চৌকাদ গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো অত্যন্ত চেনা গলা শোনা যায়, 'এ ধম্মা, এ কোশিয়া—'

ঘাড় ফিরিয়ে ধর্মা এবং কুশী দেখে সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোয়ার ওদের উঠোনের এক কোণে বড় বড় চুল্‌হার পাশে বসে প্রকাণ্ড লোহার কড়াইতে ঘি জ্বাল দিচ্ছে। ভয়সা ঘিয়ের সুঘ্রাণে বাতাস এখানে ভারী হয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোয়ার হাত নাড়তে লাগল, 'আ যা, আ যা—'

ওদের অবশ্য ঐ নাম নয়। কালা গোয়ারের আসল নাম মহাদেও; গায়ের রঙ কয়লার মতো ঝিম কালো বলে সে কালা গোয়ার অর্থাৎ কালো গয়লা নামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। তার ঘরবালী অর্থাৎ বউয়ের নাম বিজ্‌রী। বিজ্‌রীর গাত্রবর্ণ স্বামীর একেবারে উল্টো। মেমেদের মতো সে ধবধবে ফর্সা। রঙের গৌরবে সে মেম গোয়ারিন বা সফেদ গোয়ারিন। দুটো নামের মধ্যে শেষ নামটাই তার বেশি চালু।

অন্য গোয়ারদের বাড়ি না ঢুকলেও বিজ্‌রী আর মহাদেওর কাছে না গিয়ে পারে না ধর্মারা। তাই বলে কি ওরা মাস্টারজীর মতো জাতপাত মানে না বা তাদের ঘরে তুলে বিছানায় নিয়ে বসায়? কোনটাই না। অচ্ছুৎ ধর্মা আর কুশীকে তারা দূরে দূরেই রাখে। তবে অন্য গোয়ারদের মতো ওদের উঠোনে বসিয়ে নিজেরা উঁচু দাওয়ায়

বসে কথা বলে না। নিজেরাও কাছে বসে গল্প করে, হাসে, রসালো ঠাট্টা করে। মহাদেও আর বিজ্‌রীর কথায় ব্যবহারে এমন একটা প্রাণখোলা ভালবাসা আর টান আছে যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

বিজ্‌রীদের বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পুবে এবং পশ্চিমে তুই সীমানায় কাঁটাওলা পুটুস গাছের বেড়া; উত্তরের ভিটেতে পর পর তিনটে কাঠের দেয়াল আর টালির ছাউনির দক্ষিণ-মুখো ঘর। ঘরের পর বিরাট উঠোন। দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা।

গাঁয়ের রাস্তা থেকে ধর্মা আর কুশী বাড়ির ভেতর ঢুকল এবং বিজ্‌রীদের কাছাকাছি এসে খানিকটা তফাতে বসল। অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের সতর্ক করে দিতে হয় না। আজন্মের সংস্কারবশেই তারা উঁচু জাতের মানুষদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

বিজ্‌রী বলল, 'মাস্টারজীর কাছ থেকে পাইসা গিনতি করে এলি?'

ধর্মা মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

এই পয়সা জমানোর ব্যাপারটা যে সামান্য ক'টি লোককে ধর্মারা জানিয়েছে তাদের মধ্যে বিজ্‌রী এবং মহাদেও-ও রয়েছে। ধর্মারা ওদের বিশ্বাস করে আর 'আপনা আদমি' বলেই ভাবে।

ধর্মারাই শুধু না, বিজ্‌রীরাও তাদের আপনজন মনে করে। তু তরফে এই রকম ভাবার যথেষ্ট কারণও আছে।

বিজ্‌রীর বয়েস তিরিশ বত্রিশ হবে; মহাদেওর বয়েস চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। সাদি হয়েছিল তাদের পনের ষোল সাল আগে কিন্তু ছেলেপুলে আর হয় না। বিয়ের পর তু সাল যায়, পাঁচ সাল যায়, দশ সাল বারো সালও পার হয় তবু বিজ্‌রী আর মহাদেও ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে পারে না। চৌকাদ গাঁয়ের লোকেরা তাদের, বিশেষ করে বিজ্‌রীর মুখ দেখত না। বাঁজা আওরত পড়তি জমির (বন্ধ্যা জমি) মতোই অকেজো। তার মুখ দেখা পাপ, তার ছায়া মাড়ানো পাপ। চৌকাদ গাঁয়ে প্রায় একঘরে হয়েই ছিল বিজ্‌রীরা। পারতপক্ষে কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলত না; কালা গোয়ারের হুক্কা-পানি একরকম বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। ঠিক এই সময় ধর্মাদের সঙ্গে তাদের আলাপ। ধর্মারা তখন গারুদিয়া বাজারে বগেড়ি বেচে মাস্টারজীকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে চৌকাদ গাঁয়ের ওপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করেছে।

একঘরে মনমরা বিজ্‌রীরা যখন চুপচাপ এক ধারে পড়ে থাকত সেই সময় ধর্মা আর কুশী অনেকক্ষণ তাদের কাছে বসে বসে গল্প করত।

ওদের দুঃখের কারণ জানতে পেরে কুশী তার এক বুড়ী মাসিকে দিয়ে কী সব শেকড় বাকড় আনিয়ে বিজ্‌রীকে খাইয়েছিল। মাসি নানারকম ওষুধ বিষুধ এবং তুকতাক জানে। সেই ওষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক বিজ্‌রীর বাচ্চা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ে। মহাদেওর আবার হুক্কাপানি চালু হয়। এই জন্য কুশীদের কাছে ওদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মহাদেও বলে, 'আর কত রুপাইয়া হলে তোরা রাজপুত সিংয়ের হাত থেকে ছাড়া পাবি ?'

ধর্মা বলে, 'মাস্টারজী বলেছে, আরো বহোত বহোত রুপাইয়া—'

বিজ্‌রী বলে, 'জলদি জলদি রুপাইয়া জমিয়ে ফেল—' তারপর কুশীর দিকে ফিরে বলতে থাকে, 'তোর সাদিতে কী দেব জানিস ?'

বিয়ের কথায় মুখ নীচু করে বসে থাকে কুশী ; কিছু বলে না।

বিজ্‌রী ফের বলে, 'সপরনার (সাজগোজের) সব জিনিস পাবি। চাঁদির কাকাই (চিরুনি), বিছিয়া, করণফুল (তুল), বঢ়িয়া কাপড়া, জুতুয়া—'

ওদিকে চুল্‌হার আগুনে পাক খেতে খেতে ভয়সা ঘি ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে। আগে কুশীরা লক্ষ্য করে নি, ঘি যে চুল্‌হাতে জ্বাল হচ্ছে তার পাশের আরেকটা চুল্‌হায় শুখা লকড়ির উনুনে ভাত ফুটছে। দূরে, ছোট বাগানে অগুনতি সফেদিয়া আর রাতকি রানী ফুল ফুটে আছে। ঘিয়ের ঘ্রাণ, ফুলের আর ফুটন্ত ভাতের ম-ম খুশবুর সঙ্গে সফেদ গোয়ারিনের মুখে বিয়ে আর দামী দামী উপহারের নামগুলি মিশে গাঢ় স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে কুশীর।

এদিকে বিজ্‌রীর কথার মধ্যেই ওপাশের ঘর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। বোঝা যায়, ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরে শুইয়ে রেখে ওরা ঘি জ্বাল দিতে বসেছিল। ছেলের কান্না কানে আসতেই বিজ্‌রী দৌড়ে ঘরের দিকে চলে যায়। একটু পর বাচ্চাকে বুকে চেপে ভোলাতে ভোলাতে ফিরে আসে, 'মেরে বেটা রো মাত, রো মাত, মাত রোনা (কাঁদিস না)—'

কাঁচা ঘুমে ওঠার জন্য কান্না থামে না বাচ্চাটার। অগত্যা আড় হয়ে বসে বুকের কাপড় সরিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে থাকে বিজ্‌রী। আর সমানে বলে যায়, 'মেরে সোনা, মেরে চাঁদি, মেরে হীরা, মেরে মোতি। কলকাত্তাসে মেমসাব বহু এনে দেব। রো মাত, রো মাত—'

মহাদেও হেসে হেসে বলে, 'শুনা ধম্মা, শুনা হো কোশিয়া, সফেদ গোয়ারিনের খাইশ (বাসনা) শুনা? কলকাত্তাসে মেমসাব পুতহু (ছেলের বউ) আনবে। হোয় হোয় হোয়—'

বিজ্‌রী ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'আনবই তো, জরুর লায়েঙ্গী।'

বুকের দুধ খেয়ে বাচ্চাটা ঠাণ্ডা হলে ফের এধারে ঘুরে বসে বিজ্‌রী। মাখনের দলার মতো দেড় দু'বছরের ছেলেটাকে আদর করতে করতে, নাক দিয়ে পেটে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আর চুমু খেতে খেতে বলে, 'এ বিল্লীবাচ্চা, মেরে বিল্লীবাচ্চা—'

মহাদেও মুখচোখে নকল দুঃখের ভঙ্গি ফুটিয়ে ধর্মাদের বলে, 'দেখ দেখ, আপনা আঁখসে দেখ, ছেলেকে কেমন সুহাগ করছে। যাকে দিয়ে বিল্লীবাচ্চের মা বনেছে তাকে আর পাত্তাই দ্যায় না।' বলে নিজের আওরতের দিকে তাকায়, 'এ মেমসাব গোয়ারিন, হামনিকো থোড়া থোড়া সুহাগ কর—'

বিজ্‌রী ওপাশ থেকে একটা শুখা লকড়ীর টুকরা তুলে আপন মরদের পিঠে আস্তে করে ঘা বসিয়ে দেয়। বলে, 'চুপ হো বেশরম কালা গোয়ার—' পেয়ার উথলে উঠলে আপনা মরদকে সে মাঝেমধ্যে কালা গোয়ার বলে।

এ সবই যে গাঢ় ভালবাসার প্রকাশ, বুঝতে অসুবিধা হয় না কুশীর। আওরত, মরদ আর তাদের বাচ্চা—এই নিয়ে কী সুন্দর সুখের সংসার বিজ্‌রীদের। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল রুপোর পাতে রোদ ঝলকাবার মতো তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। চোখের কোণ দিয়ে আড়ে আড়ে সে ধর্মার দিকে তাকায়। লক্ষ্য করে, ধর্মাও তাকে দেখছে। দু' জনের মুখে একটু মলিন হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যেতে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে ধর্মা বলে, 'অনেক রাত হয়ে গেল। বহোত দূর যেতে হবে। আভি চলে---'

বিজ্‌রী বলে, 'নায় নায়, এখানে খেয়ে যাবি তোরা।' চৌকাদ গাঁয়ে এলে মাস্টারজীর মতো তারাও ধর্মাদের না খাইয়ে ছাড়তে চায় না।

ধর্মারা আপত্তি করে। কিন্তু রাত বাড়ার দোহাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় বিজ্‌রীরা। শেষ পর্যন্ত খেতে বসতেই হয়।

বিজ্‌রী জবরদস্ত খাটিয়ে আওরত। একা দশ হাতে কাজ করতে

পারে। বাচ্চাটাকে মহাদেওর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে চুল্‌হা থেকে ভয়সা ঘিয়ের কড়াই নামিয়ে ঘরে রেখে আসে। তারপর অন্য একটা চুল্‌হা থেকে ভাতের তসলা (হাঁড়ির মতো পাত্র) নামিয়ে ওধারের বাগান থেকে কলাপাতা কেটে এনে কুশীদের খেতে দেয় এবং খানিকটা তফাতে নিজেরাও খেতে বসে যায়।

খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্যই। আগুন আগুন মাড়ভাত্তা (ফেনভাত), মেটে আলু সেদ্ধ, খানিকটা করে টাটকা ভয়সা ঘি, রহেড় ডাল আর পুদিনার চাটনি।

খেতে খেতে আর নানারকম এলোমেলো কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় মহাদেওর। সে বলে, 'আরে ধম্মা, শুনলাম বড়ে সরকার রঘুনাথজীর মকানে আজ লাড্ডু বিলি হয়েছে।'

ধর্মা বলে, 'হাঁ। কে বললে ?'

'রামলছমনজী সন্ধ্যেবেলা মুহ আন্ধেরার সময় এসেছিল। বড়ে সরকারের মকানে যেতে বলল—মুগের আর চানার লাড্ডু নাকি দেওয়া হবে। লেকেন বিশ সের ঘিউর অডার (অর্ডার) আছে। তাই যাওয়া হয় নি। লাড্ডু দিলে কেন ? এখন তো কোন তৌহার নেই।'

'বড়ে সরকার এম্লে বনেগা। পাটনা থেকে এম্লে বনার টিকস নিয়ে এসেছে। উ'সি লিয়ে—'

'হাঁ ?'

'হাঁ।'

খাওয়া দাওয়ার পর নিজেদের এঁটো পাতা বাইরে ফেলে দিয়ে খাবার জায়গাটা জলে ধুয়ে ধর্মারা বিদায় নেয়।

আসার সময় বিজ্‌রী আরেক বার মনে করিয়ে দেয়, জলদি জলদি ধর্মা যেন কুশীর কপালে সিন্দুর চড়াবার (বিয়ের) ব্যবস্থা করে।

একসময় যদুবংশীছত্রিদের চৌকাদ গাঁ পেরিয়ে আবার ওরা আরেকটা গাঁয়ে এসে পড়ে। সেখান থেকে আরেক গাঁয়ে। এইভাবে ছোটনাগপুরের মাঠের মাঝখানে একের পর এক গাঁ পার হয়ে যায় ধর্মারা। সব জায়গায় একই ছবি। সুপ্রাচীন আকাশের তলায় সুখী স্বাধীন মানুষেরা একই ছাঁচে স্নেহ-আনন্দ-সোহাগ-খুনসুটি দিয়ে বুনে বুনে কী সুন্দর এক সাংসারিক নকৃশাই না গড়ে তুলেছে !

গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে যেতে যেতে অচ্ছুৎ ভূমিদাস এক যুবক আর এক যুবতী বুকের ভেতর গাঢ় তৃষ্ণা অনুভব করে। ভাবে, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কবে তারা এরকম ঘর-সংসার পাততে পারবে।

এক সময় ধর্মারা ফের হাইওয়েতে এসে ওঠে। রাস্তাটা এখন একেবারে ফাঁকা। রাঁচী বা পাটনা, কোনদিকেই একটা ট্রাক বা বাসের চিহ্নমাত্র নেই। এমনকি মানুষজনও চোখে পড়ছে না।

আকাশ জুড়ে অগুনতি জরির ফুলের মতো নক্ষত্রমালা। এধারে ওধারে ঝোপেঝাড়ে এবং হাওয়ায় জোনাকি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

চাঁদের নরম মায়াবী আলো গায়ে মেখে কুশী আর ধর্মা পাশাপাশি হাঁটছিল। একসময় ধর্মা কুশীর কাঁধের ওপর হাতের বেড় দিয়ে তাকে কাছে টেনে আনল। গায়ের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'গোয়ারলোগ, বামহনলোগ, কায়াথলোগ ক্যায়সা বঢ়িয়া ঘর বনাই –'

কুশী ঘরের ভেতর থেকে যেন বলে ওঠে, 'হাঁ—' চৌকাদ গাঁ পার হয়ে এসেছে তারা অনেকক্ষণ। কিন্তু এখনও বিজ্‌রীর কথাগুলো তার কানে যেন সুরে বেজে যাচ্ছে। বার বার ধর্মাকে সে 'সিন্দুর চড়াবার' জন্য তাগাদা দিয়েছে। তা ছাড়া বিয়ের সময় দামী দামী উপহার দেবার আশাও দিয়েছে। বিছিয়া, চাঁদির করণফুল, কাকাই, সপরনার (সাজগোজ) নানা জিনিস—

ধর্মা আস্তে করে এবার বলে, 'অয়সা ঘর হামনিকো চাহে —'

কুশী গম্ভীর গলায় বলে, 'হাঁ—'

রোজ রাতেই মাঠের মাঝখানের গাঁগুলো পেরিয়ে হাইওয়েতে আসার পর এই কথাগুলো একবার করে ওরা বলে যায়। ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে সব পাওয়ার জন্য সঙ্কল্পও করে।

একটু পর আবছা গলায় কুশী ফের বলে, 'থোড়ে জলদি বড়ে সরকারের করজটা শোধ করে দে—'

ধর্মা বলে, 'হাঁ, দিতেই হবে।'

'একেলী থাকতে আমার আর ভাল লাগে না।'

'উরে কালাপন তুলহানিয়া—' বলতে বলতে আচমকা কী হয়ে যায় ধর্মার। কুশীকে নিজের ঢালের মতো বুকটার ওপর টেনে এনে দু হাতে ঘন করে জড়িয়ে ধরে। কুশীর দুটো সতেজ লম্বা হাতও ধীরে

ধীরে উঠে এসে ধর্মার গলা বেষ্টন করে তার মুখ নিজের মুখের ওপর নামিয়ে আনে। তারপর অসীম স্বাধীন আকাশের তলায় জ্যোৎস্না-লোকিত প্রান্তরে মানুষের তৈরি নির্দয় পৃথিবীর এক ক্রীতদাস এবং এক ক্রীতদাসী মিথুনমূর্তির মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

একসময় দু'জনের হাত আলগা হয়ে খসে পড়ে। ধর্মা আস্তে করে বলে, 'চল—'

আরো খানিকক্ষণ পর দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ধারে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে পয়সার কৌটোটা বালির তলায় পুঁতে ওরা দোসাদ-টোলায় ফিরতে থাকে।

সাত

দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার পাশে সাবুই ঘাসের জঙ্গল। জঙ্গলটা বাঁয়ে ফেলে খানিকটা এগুলে যতদূর চোখ যায়, শক্ত পাথুরে অনাবাদী মাটির ডাঙা। এখানে বলে 'পড়তি জমি'। এ জমি এমনই কর্কশ আর কাঁকর এবং পাথরে মেশানো যে মরা মরা হলদেটে ঘাস, দু-চারটে খেজুর, সিমর, গামায়ের, কোমরবাঁকা সীসম আর আগাছা ছাড়া কিছুই জন্মায় না।

এই ডাঙা জায়গাটা বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের খাস তালুকের মধ্যেই পড়ে। এরই একধারে গা জড়াজড়ি করে বেঁটে বেঁটে দমচাপা অনেকগুলো মেটে ঘর কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগ ঘরেরই দেয়াল থেকে মাটি খসে পড়েছে। দেয়ালের গায়ে যে ছোট ছোট বেঢপ ফোকর রয়েছে সেগুলোর নাম হয়ত জানালাই কিন্তু তাতে না আছে গরাদ, না পাল্লা। দরজা বলতে পেটানো টিন বা খেলো কাঠের একটা করে পাল্লা। দরজার জায়গাটা এত ছোট যে ঘাড় গুঁজে ভেতরে ঢুকতে হয়।

এই হল ধর্মাদের দোসাদটোলা। পৃথিবীতে এত ফাঁকা জমি, এত অফুরন্ত মৃত্তিকা কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের জন্য মাথা পিছু হাত পাঁচেক জায়গার বেশি পড়েনি। পৃথিবীর যে যে জায়গায় ঘন বসতির চাপ সব চাইতে বেশি তার মধ্যে ধর্মাদের এই দোসাদটোলাও হয়ত পড়বে।

এখানকার ঘরগুলো এমনই যে আলো-হাওয়া পর্যন্ত ভাল করে ঢোকে না। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে অর্ধপশুগঠন মানুষদের উপনিবেশ যেমন ছিল, এ অনেকটা সেইরকম। বহু কাল, পঞ্চাশ ষাট কি এক দেড়শো বছর আগে রঘুনাথ সিংয়ের বাপ, ঠাকুর্দা বা ঠাকুর্দার বাপ ধর্মার বাপ, ঠাকুর্দা বা ঠাকুর্দার বাপেদের জন্য এই মহল্লা বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাজার-গঞ্জ আর ভারী ভারী টৌন থেকে অনেকদূরে অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরা পৃথিবীর সবটুকু ঘৃণা গায়ে মেখে বংশ পরম্পরায় এখানে পড়ে আছে।

ধর্মা এবং কুশী দূর থেকে দেখতে পেল, তাদের দোসাদটোলাটা এখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। ঘরে ঘরে মিট্টি তেলের ডিবিয়া জ্বলছে। ওখান থেকে চিৎকার চেঁচামেচি এবং হল্লার আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে হয়, কোন কারণে তুমুল ঝগড়াঝাটি বেধেছে। এই দোসাদপাড়ায় সামান্য, অসামান্য বা নিতান্ত অকারণেই প্রচণ্ড ধুন্ধুমার লেগে যায়। তখন অশ্লীল খিস্তির আদান-প্রদানে রাজ্যের কাক চিল দশ মাইল তফাতে পালিয়ে যায়।

মহল্লার কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে, ঘর-দুয়ার ফেলে কুশীর মা-বাপ আর ধর্মার মা-বাপ অর্থাৎ চার বুড়োবুড়ী মেঠো রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। কুশীদের দেখে চার মা-বাপ একসঙ্গে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গলা মিলিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দিল। ধর্মা আর কুশী চমকে উঠে একসঙ্গে শুধোয়, 'কা হৈল, কা হৈল ? চিল্লাচ্ছিস কেন ?'

চার বুড়োবুড়ীর বয়েস যথেষ্ট। গায়ের চামড়া কুঁচকে জালি জালি হয়ে গেছে ; মাড়িতে বেশির ভাগ দাঁতই নেই। পাটের ফেঁসোর মতো চুল। বুড়ো দুটোর পরনে কোমর ঢাকা চিটচিটে সামান্য টেনি। বুড়ীদুটোর আচ্ছাদন আরেকটু বেশি। নিচের দিকে হাঁটু পর্যন্ত আর ওপরে বুকটা কোনরকমে ঢাকা পড়ে।

একসঙ্গে কান্না-মেশানো গলায় হড়বড় করে বলার জন্য তাদের কথা দুর্বোধ্য ঠেকে কুশীদের কাছে। ধর্মা এবং কুশী দু'জনেই এবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'চিল্লাবি না বুড়হা বুড়হী। ধীরেসে বল্ কী হয়েছে—'

ধমকানিতে কাজ হয়। কান্নার শব্দটা মিইয়ে আসে। তবে একেবারে থামে না। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গলা সাফ করে চার বুড়োবুড়ী বলতে থাকে, 'কঁহা হামনিকো মিঠাইয়া ? বড়ে সরকারকো কোঠিসে দিয়া—'

এতক্ষণে বোঝা যায়, লাড্ডু বিলির খবরটা দোসাদটোলায় পৌঁছে গেছে। যাবারই কথা। ধর্মাদের সঙ্গে আর যারা বড়ে সরকারের হাভেলিতে গিয়েছিল তাদের তো বগেড়ি বেচে পয়সা জমাবার ফিকির নেই। তারাই লাড্ডু নিয়ে মহল্লায় ফিরে খবরটা দিয়েছে।

আজ দু সাল কুশীর এবং ধর্মার চার মা-বাপ রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে আবাদের কাজে যাচ্ছে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের সেই শক্তি আর নেই। তাকত না থাকলে সেই অকেজো লোককে খোরাকি এবং কাপড় দিয়ে পোষার মানে হয় না। জান-বুঝ হবার পর থেকে প্রায় গোটা জীবন পেটভাতায় পিতৃপুরুষের ঋণশোধের জন্য রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে খেটে গেছে ধর্মা এবং কুশীর মা-বাপেরা। এর ভেতর কখন যৌবন এসেছে আর গেছে, প্রৌঢ়ত্ব এসেছে আর গেছে, টেরও পায় নি। ছোটনাগপুরের কঠিন নির্দয় মাটি নিজেদের রক্তে আর ঘামে উর্বর করে রঘুনাথ সিংদের জন্য বছরের পর বছর ফসল ফলিয়ে গেছে তারা। তারপর শেষ বয়সে শরীরে সারবস্তু বলতে যখন আর কিছুই নেই তখন একেবারেই খারিজ হয়ে গেছে।

কিন্তু বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং বড়ই মহানুভব। ক্ষেতির কাজ থেকে বাতিল করে দিলেও তিনি ওদের ভোলেন নি। মনে করে প্রত্যেকের জন্য গুনে গুনে লাড্ডু পাঠিয়ে দিয়েছেন; ভয়সা ঘিয়ে বানানো বড় বড় উৎকৃষ্ট লাড্ডু। চার বুড়োবুড়ী নিজেরা গিয়ে বড়ে সরকারের হাত থেকে লাড্ডু নিতে পারে নি, তাতে কী! তাই বলে ভাগের মিঠাই তো আর ছাড়া যায় না!

দোসাদটোলার মানুষজনের বেশির ভাগই সারাদিন ক্ষেতখামারে জীবনীশক্তির অনেকটা ক্ষয় করে আসার পর সন্ধ্যে হতে না হতেই ঘরে ফিরে নাকেমুখে গুঁজে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন ভোরের আগে সে ঘুম ভাঙে না।

কিন্তু আজ যে গোটা পাড়াটা ডিবিয়া জ্বালিয়ে জেগে আছে আর ধর্মা এবং কুশীর মা-বাপেরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার একমাত্র কারণ বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ঐ লাড্ডু বিতরণ। তাদের জীবনে রঘুনাথ সিংয়ের হাত থেকে মিঠাইয়া পাওয়া একটা বড় রকমের তৌহারের ব্যাপার; দুর্দান্ত উত্তেজক এক ঘটনা। সেই উত্তেজনাই এত রাত পর্যন্ত কাউকে ঘুমোতে দেয় নি।

ধর্মা বলে, 'বড়ে সরকার মিঠাইয়া দিয়েছে, তোদের কে জানালো?'

মা-বাপেরা চেঁচাতে চেঁচাতে বলে, 'সব কোই। এক এক আদমিকো দো দো লাড্ডুয়া। তুহারকে লিয়ে বৈঠে বৈঠে বড়ে সরকারকে মকান গৈল। মুনশীজী বাতাওল, হামনিকো মিঠাইয়া তুহারকে হাতমে দে দিয়া। খুদ বড়ে সরকার আপনা হাতসে বাঁট দিয়া—'

ধর্মা এবং কুশী অনেকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে। লাড্ডু বিলির খবর পেয়ে চার বুড়োবুড়ী যে বড়ে সরকারের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে, এতটা তারা ভাবতে পারে নি।

মা-বাপেরা আবার চিৎকার করে ওঠে, 'কঁহা হ্যায় হামনিকো মিঠাইয়া? কঁহা রে?'

ধর্মারা জানায় দুর্ভাবনার কারণ নেই, মিঠাই তাদের সঙ্গেই আছে।

মা বাপেরা খুব একটা যে আশ্বস্ত হয়, এমন মনে হয় না। তারা চেঁচাতেই থাকে, 'আভি নিকাল হামনিকো লাড্ডুয়া, আভি নিকাল—'

'আরে বুড়হা বুড়হিয়া মিঠাইয়া মিলবে; আগে ঘরে তো চল। লাড্ডুয়াকে লিয়ে মরতা হ্যায়—'

'কায় নায় মরোগে—অ্যাঁ? কেন মরব না? আমাদের ভাগের লাড্ডুয়া!'

ঘরের দিকে যেতে যেতে মথুরা লচ্ছু ফিতুলাল, এমনি অনেকের ঘর থেকে তুমুল চিৎকার শোনা যেতে লাগল। নিশ্চয়ই লাড্ডুর ভাগ নিয়ে ঝগড়া চলছে।

দোসাদটোলার একেবারে মুখের দিকে রাস্তার কাছে পাশাপাশি দুটো ঘরে ধর্মা আর কুশী তাদের মা-বাপদের নিয়ে থাকে। এত পাশাপাশি যে এ ঘরে নীচু গলায় কথা বললে ও ঘরে পরিষ্কার শোনা যায়।

ঘরে এসে ম্যাচিস ধরিয়ে ওরা ডিবিয়া জ্বালায়। তারপর ধর্মা এবং কুশী তাদের মা-বাপের প্রাপ্য মিঠাই বুঝিয়ে দেয়। এতক্ষণে চার বুড়োবুড়ীর মুখে হাসি ফোটে। দামী দুর্লভ লাড্ডুগুলো ডিবিয়ার আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লুব্ধ চকচকে চোখে খানিকক্ষণ তারা ছাখে; তারপর খেতে শুরু করে। খাওয়া হয়ে গেলে কুশীর মা-বাপ কুশীকে

এবং ধর্মার মা-বাপ ধর্মাকে বলে, 'আভি খা লে—' অর্থাৎ রাতের খাওয়ার কথা বলছে তারা।

ধর্মা এবং কুশী জানায়, চৌকাদ গাঁয়ে সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোয়ারের বাড়ি থেকে তারা খেয়ে এসেছে। এখন আর খাবে না।

এ খবরটা ছ'জনের মা-বাপের কাছে নতুন কিছু না। সপ্তাহে ছু-এক দিন চৌকাদ গাঁ থেকে তারা রাতের খাওয়া চুকিয়ে আসে। তবু চার বুড়োবুড়ী জানায়, আজ একটু বঢ়িয়া রান্নাবান্না হয়েছে। ছেলেমেয়ে না খেলে কি মা-বাপের ভালো লাগে।

পাশাপাশি ছুই ঘরে কুশী আর ধর্মা জানতে চায়, 'কী রেঁধেছিস?'

মা-বাপেরা জানায়—ভাত, সুথনির তরকারী আর শিকার।

শিকার অর্থাৎ মাংস। মাংসের নামে এ ঘরে কুশীর, ও ঘরে ধর্মার চোখ লোভে ঝকমকিয়ে ওঠে। তারা শুধোয়, 'কিসের শিকার?'

'বন পেরোয়ার (পায়রা)।'

'মিলি কিধরি? (কোথায় পাওয়া গেল)?'

'জঙ্গলে সুথনি তুলতে গিয়ে। কোন জানবর কি বদমাস চিড়িয়া (বাজপাখি) জখম করেছিল। পেরোয়াটা উড়তে পারছিল না। ধরে নিয়ে এলাম।'

রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে খারিজ হয়ে গেলেও ধর্মার মা-বাপ আর কুশীর মা-বাপের খিদে-তেষ্টা তো আর শেষ হয়ে যায় নি। পেট আছে কিন্তু বড়ে সরকারের কাছ থেকে একদানা খোরাকি মেলে না। অথচ না খেলে বাঁচে কী করে? ধর্মা আর কুশী বড়ে সরকারের খামার বাড়ি থেকে যে খোরাকি পায় তাতে নিজেরা খাওয়ার পর এমন কিছু বাড়তি থাকে না যা দিয়ে বাপ-মাকে বাঁচানো যায়। কাজেই চার বুড়োবুড়ীকে নিজেদের খাদ্য নিজেদেরই যোগাড় করে নিতে হয়।

ধর্মার মা-বাপ আর কুশীর মা-বাপ এই চারজনের মধ্যে প্রচুর মিল, প্রচুর খাতির। কখনও কোন কারণেই তাদের ঝগড়াঝাটি নেই। এই বনিবনার জন্য দোসাদটোলার অনেকেই তাদের হিংসে করে।

যাই হোক, খাদ্যের খোঁজে এখান থেকে তিন মাইল তফাতে দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ের জঙ্গলে রোজই চলে যায় ওরা। কন্দ, কচু, মেটে আলু, লতাপাতা, এমনি সব জিনিস যোগাড় করতে করতে কচিৎ

কখনও তারা এক-আধটা খরগোস কি পাখি টাখি পেয়ে যায়। যেমন আজ একটা বন পেরোয়া বা বনপায়রা পেয়েছে। যেদিন শিকার মেলে সেদিন বাড়িতে যেন তৌহার লেগে যায়।

ধর্মা আর কুশী বিজ্রীদের বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেছে। তবু কি আর মাংস দিয়ে দু-চার গরাস ভাত খেতে পারে না? খুবই পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খায় না। দু'জনে তাদের দুই মাকে ভাগের মাংস আর ভাত তরকারি রেখে দিতে বলে। বলে, 'ভাতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখ। কাল সবেরে খেয়ে জমিনে যাব।'

দুই পরিবারে দু'জনের একবেলার করে খোরাকি বেঁচে যায়। দোসাদদের জীবনে এ ঘটনা সামান্য নয়।

দোসাদটোলার সব ঘরেরই চেহারা প্রায় এক রকম। খানকয়েক করে খেলো সিলভারের তোবড়ানো থালা, মাটির হাঁড়িকুড়ি, দু-চারটে ময়লা ঠেঁটি জামাকাপড়, ছেঁড়া বালিশ, চট, কাঁথাকানি, ধুলো-বোঝাই ইঁদুরে-কাটা ধুসো কম্বল। ক্বচিৎ কারো ঘরে বাঁশের ফ্রেমে নারকেল দড়ি দিয়ে বোনা চৌপায়া চোখে পড়ে। ধর্মা আর কুশীদের ঘর-দুয়ারেরও এই একই হাল। তবে কুশীদের চৌপায়া নেই, ধর্মাদের একটা আছে। রাতে সেটায় তুলো-ওড়া ফাটা বালিশ পেতে শোয় ধর্মা। এটুকুই তার জীবনে মহার্ঘ সৌখিনতা।

খানিকটা পর দুই ঘরে চার বুড়োবুড়ী রাতের খাওয়া সেরে ডিবিয়া নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। তাদের আগেই ধর্মা আর কুশী শুয়ে পড়েছিল।

রাত এখন অনেক। দোসাদপাড়া খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেও একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি। দূর থেকে নথুয়ার বউর গুনগুনানি ভেসে আসে:

> 'বাবু হমার নিন্দ (ঘুম) করে,
> সারি শহর বাবু ঘুরত রহে,
> আ যা রে নিন্দ, তু আ যা,
> বাবু হমার শুলা যা রা—
> বাবু হমার নিন্দ করে।
> সারি শহর বাবু ঘুরত রহে
> আ যা সৈয়া তু আ যা
> বাবুকে দুধ পিলাহা যা রা—'

বোঝা যায়, নাথুয়ার বউ গান গেয়ে গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

ওধারে মঙ্গেরি, ভিরগুলাল, গুলাবীদের ঘর থেকেও কথাবার্তার আবছা শব্দ ভেসে আসে। তবে সব চাইতে স্পষ্ট করে যা শোনা যায় তা হল গঙ্গুরামের মায়ের একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার আওয়াজ।

ধর্মা দড়ির চৌপায়ায় চিত হয়ে শুয়ে ছিল। এবার খানিকটা কাত হয়ে অন্ধকারে ঝাপসাভাবে দেখল, দেয়ালের গা ঘেঁষে তার মা-বাপ শুয়ে আছে, তবে ঘুমিয়ে পড়েনি। ধর্মা জিজ্ঞেস করে, 'গঙ্গুর মা কাঁদে কেন?'

ধর্মার মা বলে, 'গঙ্গু ওর মায়ের ভাগের লাড্ডু খেয়ে ফেলেছে।'

গঙ্গুটা এরকমই, মা-বাপকে ছ্যাখে না। ঘোর স্বার্থপর। ধর্মা বলে, 'হারামী জানবর' সে জানে আজ বাকী রাতটা গঙ্গুর মায়ের একটানা বিলাপ চলতে থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস ওঠার মতো অদ্ভুত এক শব্দ করতে করতে ধর্মার মা-বাপ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সারাদিন 'হাড্ডি তোড়' খাটুনির পরও ঘুম আসে না ধর্মার। সে জানে দশ হাত তফাতে আরেকটা ঘরে কুশীর মা-বাপ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের মেয়ে ঠিকই জেগে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে অন্য সব দিনের মতো আজও ঠিকাদার আর গোয়ারদের, বিশেষ করে বিজুরী এবং মহাদেওর কথা মনে পড়ে যায় ধর্মার। ওরা কালাপন ভুলহানিয়া অর্থাৎ কুশীর কপালে 'সিন্দুর চড়ানো'র জন্য রোজ তাগাদা দেয়। সাদির সময় কী কী উপহার দেবে তাও রোজ একবার করে শোনায়।

ধর্মা ভাবতে থাকে, কবে রঘুনাথ সিংয়ের কাছে তাদের 'খরিদী' জীবন শেষ হবে, কবে তারা পূর্বপুরুষের করজ শোধ করে স্বাধীন হতে পারবে, কে জানে। মুক্তি না পেলে সাদির কথাই ওঠে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে ধর্মার। হয়ত তার মতোই দশ হাত তফাতে আরেকটা ঘরে এক ক্রীতদাসী দোসাদ যুবতী চোখের পাতা মেলে একই কথা ভেবে যায়।

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে ধর্মা। তাদের জীবনের একটা দিন এভাবেই কেটে যায়।

আট

দোসাদটোলায় অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের জীবনে ঘটনা খুবই অল্প। চমক দেবার মতো বড় মাপের নাটকীয় ঘটনা দু-পাঁচ বছর পর কচিৎ কখনও ঘটে; যেমন ঘটেছিল কাল সন্ধ্যেবেলায়। বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং নিজের হাতে তাদের মতো অচ্ছুৎ জনমদাসদের খাঁটি ঘিয়ের তৈরি লাড্ডু বেঁটে দিলেন, এমন চোখ-ধাঁধানো আশ্চর্য ঘটনা দোসাদদের জীবনে আর কখনও ঘটেছে বলে কেউ শোনেনি। মহল্লার যারা পুরনো প্রাচীন মানুষ, যাদের বয়স ষাট সত্তর কি শ'য়ের কাছা-কাছি তারাও এমন ঘটনা চোখে ছাখে নি বা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শোনেনি। রঘুনাথ সিংয়ের মিঠাইয়া বিলির ব্যাপারটা বেশ কয়েক মাস দোসাদদের উত্তেজিত করে রাখবে। তাদের যাবতীয় কথাবার্তায় এই ঘটনাটা বার বার এসে পড়বে।

যাই হোক, এ জাতীয় দু-চারটে ঘটনার কথা বাদ দিলে অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের জীবন একেবারেই ম্যাড়মেড়ে এবং গতিশূন্য। উপমা দিয়ে বলা যায়, বালির চড়ার মধ্যে শুখা মরসুমের নদীর মতো। এ দেশ তো কবেই স্বাধীন হয়ে গেছে, পর পর কত পাঁচসালা পরিকল্পনা পার হয়ে যায়, কতবার চুনাও আসে এবং যায়, ভোটের লোকেরা আকাশ ফাটিয়ে আর গলায় রক্ত তুলে 'ভোট দো ভোট দো' করে চেঁচাতে থাকে, গত দশ বিশ বছরে পাটনা-রাঁচীর হাইওয়েতে বাস-ট্রাক-হাওয়া গাড়ির সংখ্যা বিশগুণ বেড়ে যায়, ভারী টৌনে (শহরে) কত অদল বদল ঘটতে থাকে, সেখানে কত আলো কত জেল্লা কত নতুন চমকদার মকান, ঝকঝকে দিশী এবং বিলাইতী গাড়ির স্রোত, কত দামী দামী পোশাক, কত দামী দামী খাদ্য কিন্তু গারুদিয়া তালুকের জল-অচল জনমদাসেরা আজাদীরা আগে যেখানে ছিল অবিকল সেখানেই পড়ে আছে। স্বাধীন ভারতের যেদিকে পর্যাপ্ত আলো, অজস্র আরাম, অঢেল প্রাচুর্য তার উল্টোদিকে এদের বাস। স্বাধীন উজ্জ্বল দীপ্তিমান ভারতের এতটুকু জলুস তাদের মহল্লায় এসে পড়ে নি। বিশ পঞ্চাশ কি একশো বছর আগে এদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে জীবন কাটিয়ে গেছে এরাও হুবহু সেই ভাবেই কাটিয়ে যাচ্ছে।

জীবনযাত্রার প্যাটার্নে কোথাও এতটুকু পরিবর্তন নেই। এদের আজকের দিনটা কালকের মতো, কালকের দিনটা পরশুর মতো, পরশুটা তরশুর মতো। একটা দিনের সঙ্গে আরেকটা দিনের তফাত খুঁজে বার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেকটা দিন যেন একই ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

অন্য সব দিনের মতো আজও অন্ধকার থাকতে থাকতে দোসাদ-টোলার ঘুম ভাঙল। এদের জীবনে রাত যত তাড়াতাড়ি আসে, দিনও ঠিক তেমনি। সূর্যাস্তের পর সারা পৃথিবী যখন অনেকক্ষণ জেগে থাকে তখন তারা ঘুমিয়ে। সূর্যোদয়ের আগে অন্ধকারে বাকী পৃথিবী যখন বিছানায় তখন এই জনমদাসদের চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়। কেননা রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বড়ে সরকারের খামারবাড়িতে হিমগিরিনন্দনের কাছে হাজিরা দিতে হয়। এটুকু সময়ের ভেতর কিছু খেয়ে আর কালোয়া (দুপুরের খাদ্য) বানিয়ে নিতে হয়।

ঘরে ঘরে চুল্হা ধরে গেছে। শুকনো লকড়ি জ্বালিয়ে দোসাদরা মাড়ভাত্তা চড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ ভোরেই ভাত খেয়ে দুপুরের জন্য মকাই বা মাড়োয়া সেদ্ধ কিংবা চানার ছাতু, কাঁচা মরিচ, নুন আর খানিকটা তেঁতুলগোলা সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে যায় দুপুরে খাবে বলে। কারো আদত একেবারেই উল্টো। ভোরে ছাতু বা মকাই, দুপুরে মাড়ভাত্তা, সঙ্গে সামান্য সবজি-টবজি।

ধর্মাদের ঘরের সামনের দাওয়ার এককোণে রান্নার জায়গা। সেখানে ওর মা চুল্হা ধরিয়ে ভাত বসিয়ে দিয়েছে। একটু দূরে বসে, থেকে থেকে কেশে যাচ্ছে তার বাপ। পুরনো শ্লেষ্মার কাশি। আর একধারে ঘুণে-ধরা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে ধর্মা। এর মধ্যেই তার 'নাহানা' (স্নান) টাহানা হয়ে গেছে। নাহানা আর কী? রঘুনাথ সিংয়ের বাপ বা ঠাকুর্দা ভূমিদাসদের সুবিধার জন্য কোন জন্মে যেন একটা কুয়ো কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বালি পড়ে পড়ে সেটার অবস্থা কাহিল, প্রায় বুজেই গিয়েছিল বার কয়েক। রঘুনাথ সিং বালি কাটিয়েদের দিয়ে সাফ করে দিয়েছেন তিন চার বার। শেষ বার যে করেছিলেন, তাও বছর দশেক আগে। নতুন করে বালি পড়ে ওটা আবার বুজতে বসেছে। কোনরকমে তলার দিকে একটু কালচে জল যে পড়ে থাকে এই গরমের সময়টায় কিন্তু দোসাদটোলার এতগুলো

লোকের পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তাই কারো ঘুম ভাঙার আগেই ধর্মা উঠে গিয়ে খানিকটা জল তুলে মাথায় ঢেলে আসে। অবশ্য এখান থেকে মাইল দুই হেঁটে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতে বালি সরিয়ে জলবার করে গা-মাথা ভিজিয়ে আসা যায় কিন্তু 'নাহানা'র জন্য অতদূর গেলে সূর্য ওঠার সময় খামারবাড়িতে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব।

এখন এই জষ্ঠি মাসে শুখার সময়টা জলের বড় তখলিফ এখানে। কুয়োর বালি না কাটালেই আর নয়। মালিক বড়ে সরকারের কাছে যাবার সাহস তাদের নেই কয়েক সাল ধরে হিমগিরিনন্দনের কাছে বালি কাটাবার জন্য প্রচুর আর্জি, প্রচুর কাকুতি মিনতি করে আসছে তারা কিন্তু সব কিছুই হিমগিরির এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দাওয়ায় বসে দূরে তাকিয়ে ছিল ধর্মা। কুয়োটার কাছে এতক্ষণে ভিড় জমে গেছে এবং জলের বখরা নিয়ে চিল্লাচিল্লি আর গালাগাল শুরু হয়েছে। ফী শুখা মরসুমে দোসাদ পাড়ায় এ ঘটনা একেবারে দৈনন্দিন। ঝগড়া, গালাগাল এবং চিৎকার দিয়ে তাদের দিন আরম্ভ হয়।

কুয়োর দিক থেকে সরিয়ে চোখদুটো কুশীদের ঘরে এনে ফেলল ধর্মা। ওখানেও কুশীর মা ফেনাভাত চড়িয়ে দিয়েছে। আর কুশী নিজে সস্তা দু আনা দামের প্ল্যাস্টিকের কাকাই (চিরুনি) দিয়ে জট পাকানো চুল আঁচড়াচ্ছে। কুশীটার ভোরে 'নাহানা'র অভ্যাস নেই ; রাত্রে ধর্মার সঙ্গে ফিরে সে চান-টান করে।

পুব দিকটা ফর্সা হয়ে আসছে। এধার থেকে ধর্মা তাড়া লাগায়. 'জলদি জলদি চুল আঁচড়ানো খতম করে খেয়ে নে। রওদ (রোদ) চড়তে বেশি দেরি নেই।' কুশী একবার কাকাই হাতে পেলে সময়ের হুঁশ থাকে না। চুল আঁচড়ানোটা ওর প্রিয় বিলাসিতা। কিন্তু মেয়েটা বোঝে না, যাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বড়ে সরকারের কাছে বিকিয়ে দেওয়া আছে তাদের চুলে বাহার তুলে সময় নষ্ট করা সাজে না।

রোজ সকালে কুশী ধর্মার সঙ্গে মাঠে যায়। এদিকে ফিরে খুব ব্যস্তভাবে সে বলে, 'অভি হো যায়েগা—' বলেই ঘন চুলের ভেতর জোরে জোরে কাকাই চালাতে থাকে।

ধর্মা আর কিছু বলে না।

ঘরে ঘরে এখন ফেনাভাত টগবগিয়ে ফুটতে শুরু করেছে। বড়ে সরকারের খামার বাড়ি থেকে খোরাকি বাবদ যে মোটা অরোয়া চালটা (আতপ) ধর্মাদের দেওয়া হয় তা বহুকালের পুরনো। ফুটন্ত আতপের গুমো গন্ধে দোসাদটোলার বাতাস ভারী হয়ে উঠতে থাকে।

ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে রোজকার মতো আজও ধর্মা দেখতে পায়, আধবুড়ো মাঙ্গীলাল তার দুটো বাঁদর আর একটা বকরী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মাঙ্গীলাল এবং তার তিনটে পশুর গায়ে একই রকম পোশাক ; রঙ-বেরঙের টুকরো টাকরা কাপড় দিয়ে বানানো জামা। বাড়তির মধ্যে মাঙ্গীলালের একটা ঠেঁটি তালিমারা প্যান্ট আর মাথায় পাগড়ি রয়েছে।

মাঙ্গীলালের কেউ নেই না ছেলেপুলে, না জেনানা। দুনিয়ায় সে একা মানুষ ধর্মাদের স্বজাত দোসাদ হয়েও সে রঘুনাথ সিংয়ের 'খরিদী কিষাণ' বা ভূমিদাস নয়। তার বাপ ছিল এক পুরুষের কেনা চাষী। রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে ঋণ নেবার সময় 'করজ পাট্টা' বা ঋণপত্রে লেখানো হয়েছিল যতদিন শারীরিক শক্তি সামর্থ্য থাকবে ততদিন মাঙ্গীলালের বাপ পেটভাতায় বেগার দিয়ে যাবে। তবে তার ছেলেমেয়ে বা বউকে বেগার দিতে হবে না। এদিক থেকে মাঙ্গীলাল স্বাধীন মানুষ এবং সৌভাগ্যবানও। তার পেশা হল গারুদিয়া বিজুরি কি আরো দূরের বাজারে-গঞ্জে ঘুরে বকরী-বাঁদর নিয়ে মাদারী খেল দেখিয়ে বেড়ানো। এতে যা রোজগার হয়, তিনটে পশু আর একটা মানুষের পেট মোটামুটি চলে যায়। স্বাধীন মাঙ্গীলালকে মনে মনে ঈর্ষা করে ধর্মা।

গুনগুনিয়ে চাপা গলায় গাইছিল মাঙ্গীলাল :

> 'নাচ বান্দরী
> পাকোল পুন্দরী
> তুড়ুক তুন্দরী
> হা রে গুগুনগুচা, হা রে গুগুনগুচা।'

বাঁদর নাচাবার গান। কিন্তু বিশ পঁচিশ সাল ধরে এক গান গাইতে গাইতে এমন আদত হয়ে গেছে যে নিজের অজান্তেই যখন তখন গলায় সুর উঠতে থাকে তার।

ধর্মা ডাকে, 'এ মাঙ্গীচাচা—'

সুর ভাঁজা থামিয়ে মাঙ্গীলাল ঘাড় ফেরায়, 'কা রে ?'

'আজ কোথায় যাচ্ছ ?'

'নজদিগ (কাছেই) ; চৌকাদে যাব।'

অর্থাৎ কাছাকাছি গোয়ারদের গাঁয়ে খেলা দেখাবে মাঙ্গীলাল। ধর্মা এবার শুধোয়, 'ফিরবে কখন ?'

এসব খুব দরকারী প্রশ্ন নয়। তা ছাড়া দু'জনের জীবনযাত্রা একেবারেই মেলে না। ধর্মা পরাধীন ভূমিদাস, মাঙ্গীলাল স্বাধীন মানুষ। পৃথিবীর সব স্বাধীন মানুষকেই ধর্মা ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধা করে। সেদিক থেকে মাঙ্গীলাল তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ—একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় এবং ঈর্ষণীয়। তার সঙ্গে কথা বলতে সে গৌরববোধ করে।

মাঙ্গীলাল বলে, 'সামকো। মুহ্ আন্ধেরা (মুখ আঁধারি) হলেই ফিরে আসব।'

'কাল কোথায় যাবে ?'

'কাল নায় নিকলেগা। পরশু, তরশু, নরশুভি নায়। তবিয়ত আচ্ছা নেহি—'

পর পর চারদিন দোসাদটোলা ছেড়ে বেরুবে না মাঙ্গীলাল। এর জন্য কাউকে তার কৈফিয়ত দিতে হবে না বা হিমগিরি লোক পাঠিয়ে তার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাবে না কিংবা বরাদ্দ খোরাকিও কাটা যাবে না। গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধর্মা বলে, 'তুমি ভালো আছ মঙ্গীচাচা ; বহোত সৌভাগ তুমহারা। আমাদের মতো বাঁধী নৌকর হয়ে যাওনি।'

এ জাতীয় কথা ধর্মার মুখে অনেক বার শুনেছে মাঙ্গীলাল। সে আর দাঁড়ায় না ; নিজের পশুবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়।

মাঙ্গীলাল চলে যাবার একটু বাদেই আসে ফাগুরাম। ফাগুরামও একজন স্বাধীন মানুষ। মাঙ্গীলালের মতো তার বাপ-ঠাকুর্দাও ছিল এক পুরুষের ভূমিদাস। পরে তাদের বংশে যারা জন্মেছে 'করজপাট্টা'র দায়ে তাদের বেগার দিতে হয়নি। তবে আগেই বলা হয়েছে মালিক রঘুনাথ সিং বড়ই মহানুভব। ঋণের দায় থেকে মুক্তি পেলে কিংবা শারীরিক দিক থেকে অপারগ হয়ে খারিজ হয়ে গেলেও তিনি কাউকে দোসাদটোলা থেকে তাড়ান না, যার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারে।

ফাগুরাম এক কালে নৌটঙ্কীর দলে গাইত। বয়স হবার পর

এমনিতেই দুব্‌লা কমজোরি হয়ে পড়েছিল। রাতের পর রাত আরা মজঃফরপুর পূর্ণিয়া আর ভাগলপুর জেলায় গান গেয়ে গেয়ে বুকে দোষ হয়ে গেল। তারপর পড়ল ভারী বোখারে। এখন তার রাত জাগার শক্তি নেই; আর নেই একসঙ্গে চার পাঁচ ঘণ্টা আসর জমিয়ে রাখার মতো দম। ফলে নৌটঙ্কীর দল থেকে বাতিল হয়ে গেছে।

শরীর ভাঙলেও, দম কমে এলেও ফাগুলালের গানের গলা এখনও অটুট; তার জোয়ান বয়েসের মতোই সুরেলা এবং মাদকতায় ভরা। যে তার গান শুনেছে সে-ই বলেছে 'যাদু-ভরি' গলা। কেউ বলে 'গারুদিয়াকা কোয়েল'।

নৌটঙ্কীর দল থেকে বেরিয়ে আসার পর ফাগুরাম ইদানিং দু-তিন সাল নিজেই একা একা গেয়ে রোজগার করছে। রোজ ভোর হতে না হতেই দোসাদটোলা থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে সোজা রেল স্টেশনে চলে যায়। প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা ছায়াওলা প্রকাণ্ড পীপর গাছের তলায় বসে পুরনো বেলো-ফাঁসা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। আজকাল ট্রেনে লোক চলাচল অনেক বেড়ে গেছে। সারা দিনে কামাই ভালোই হয় ফাগুরামের।

ধর্মা বলল, 'চললে ?'

ফাগুরাম ঘাড় কাত করে, 'হুঁ—'

মাঙ্গীলাল আর ফাগুরামের মতো স্বাধীন মানুষ দোসাদটোলায় আরো জনকয়েক আছে। বেঁচে থাকার জন্য তাদের নানা ধরনের পেশা। যেমন, বিরখু ঠিকাদারদের মাটি কাটে, মুঙ্গেরি বাসযাত্রীদের মাল বয় কিংবা লখিয়া গারুদিয়া বাজারে এক কাঠগোলায় কাঠ চেরাই করে। সবাই যে যার কাজে একের পর এক বেরিয়ে যেতে থাকে। ধর্মাদের ঘরটা একেবারে বড় রাস্তায় বেরুবার মুখ ঘেঁষে বলে এখান দিয়েই দোসাদটোলার লোকজনকে যাতায়াত করতে হয়। কাজেই ঘরের দাওয়ায় বসেই সবাইকে দেখতে পায় ধর্মা।

একের পর এক অনেকে বেরিয়ে যাবার পর বাঁকা একটা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়ি সৌখী এল। ততক্ষণে ধর্মার মা চুল্‌হা থেকে মাড়ভাত্তা নামিয়ে ফেলেছে।

ধর্মা বরাবর লক্ষ্য করেছে, তার মা ভাত নামাবার সঙ্গে সঙ্গে সৌখী এসে হাজির হয়। একটু আগেও না, একটু পরেও না। বুড়ীর সময়জ্ঞান বেজায় টনটনে।

সৌখীর বয়েস সত্তর আশী না শ'য়ের কাছাকাছি, বোঝা মুশকিল। বুড়ীর কোমর পড়ে গেছে কবেই ; খাড়া হয়ে সে দাঁড়াতে পারে না। দাঁড়াবার জন্য লাঠির ঠেকনো দরকার। গায়ের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। চোখে তেজ নেই ; পাতলা সরের মতো ছানি পড়েছে : দৃষ্টি ঘোলাটে। মাথার চুল শণের নুড়ি যেন ; মাড়িতে একটা দাঁতও আর নেই।

রঘুনাথ সিংয়ের সিন্দুকে ভূমিদাসদের নামাবলীর যে বিরাট লিস্ট রয়েছে সৌখী সেখান থেকে কবেই খারিজ হয়ে গেছে। অথচ যখন শরীরে তাকত ছিল, বড়ে সরকারের জমিতে গতর 'চূরণ' করে দিয়েছে। তিনকুলে কেউ নেই সৌখীর। একটা ছেলে ছিল—গণেশ বা গণা। গণা ছিল রঘুনাথ সিংয়ের ভূমিদাস। বছরখানেক আগে একদিন রাতের অন্ধকারে গারুদিয়া ছেড়ে সে পালিয়ে যায়। এই নিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা হিমগিরিনন্দন কম হুজ্জুত আর ঝামেলা করে নি। 'বাঁধি কিষাণ'দের এভাবে ভেগে যাওয়া যে কোন মালিকের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক। হিমগিরির মতে এতে অন্য ভূমিদাসদের ওপর 'কানটোল' রাখা যায় না। গোটা দোসাদটোলা বার বার তোলপাড় করেও গণার পাত্তা মেলে নি।

গণা ভেগে যাওয়ার পর থেকেই হাল খারাপ হয়ে পড়ে সৌখীর। পেটই তার চলতে চায় না। এখন সে ভিখমাংনি : ভোরবেলা উঠে গারুদিয়া তালুকের যে ক'টা গাঁয়ে পারে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে। কিন্তু কেউ চাল ছায় না। যা ছায় তা হল মকাই বা মাড়োয়া। ক্বচিৎ দু-চারটে পয়সা।

দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে মকাইদানা চিবোতে বড় কষ্ট হয় সৌখীর। তাই দুটো ভাতের আশায় রোজ ভোরে ধর্মাদের ঘরে হানা ছায় বুড়ী। তার সম্বন্ধে ধর্মার যে খানিকটা সহানুভূতি আছে, সেটা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে সে।

কিন্তু ভোরবেলা সৌখীকে দেখলে একেবারে ক্ষেপে যায় ধর্মার মা। এমনিতেই তাদের ঘোর অভাবের সংসার। একজনের বাঁধা খোরাকির সঙ্গে এটা-সেটা করে জোড়াতালি দিয়ে তিনজনের পেট চালাতে হয়। তার মধ্যে রোজ ভাতের বখরা দিতে হলে তাদের চলে কী করে ?

অন্য দিনের মতো আজও গলায় রক্ত তুলে চেঁচাতে থাকে ধর্মার

মা, 'বুড়ী ভিখমাংনী শরমের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিস! গিধ কাঁহিকা। হর রোজ পরের ঘরে গিয়ে ভাত গিলতে শরম লাগে না! যা ভাগ—ভাগ—'

সৌখী এসব গালাগাল গায়ে মাখে না। নির্দাঁত মাড়ি বার করে নিঃশব্দে হাসে। তারপর ডুলতে ডুলতে বারান্দায় এসে লাঠি এবং ভিক্ষের কৌটোটা রেখে বসে পড়ে।

ধর্মার মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'বৈঠনে কৌন বোলা তুহারকে। যা, আভি নিকাল যা—' লোকে যেভাবে কুকুর বেড়াল বা কাক তাড়ায় সেইভাবে সৌখীকে ভাগাতে চেষ্টা করে সে।

সৌখী উত্তর দ্যায় না। করুণ মুখে ধর্মার দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু।

ধর্মা তার মাকে বলে, 'রহ্‌নে দো। বুড়হী, কোই নেহী—'

ধর্মার মা গলার স্বর আরেক পর্দা চড়ায়, 'কোই নেহী তো হামনি কা করে? আমরা কী করব? হর রোজ এখানে মরতে আসে! কা, টোলামে আউর কোই নেহী? সেখানে যাক না বুড়হী—'

ধর্মা বলে, 'কতদিন আর বুড়হী বাঁচবে! দে—ওকে ক'টা ভাত দে—'

ধর্মার মা গজ গজ করতে থাকে। এ বুড়ী এত সহজে মরছে না; গিধের মতো আরো বিশ পঞ্চাশ সাল নিশ্চয়ই বেঁচে থেকে আমাদের হাড় চুষে খাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্ষেপে যায় বটে, তবে একমাত্র রোজগেরে ছেলের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না। একটা শালপাতায় খানিকটা ফেনাভাত আর নুন দিয়ে সৌখীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। পরম যত্নে গুমো গন্ধওলা আতপ চালের সেই থকথকে গলা মণ্ড কোলের কাছাকাছি টেনে আনে সৌখী। খেতে খেতে তার ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে আলো ফুটে ওঠে।

ধর্মা বলে, 'সিরিফ (শুধু) মাড়ভাত্তা দিলি বুড়হীকে; কাল রাত্তিরে শিকার (মাংস) রেঁধেছিলি না—'

ধর্মার কথা শেষ হবার আগেই গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে ধর্মার মা, 'আউর কুছ নায় তুঙ্গী (দেব)। ফির দেবার কথা বললে বুড়হীর মুহমে আগ (আগুন) চড়িয়ে দেব।'

এমনিতেই সৌখীকে ফেনাভাতের ভাগ দিয়ে যথেষ্ট মহানুভবতার

পরিচয় দিয়েছে তার মা। মাংস দেবার জন্য জোরাজুরি করতে আর সাহস হয় না ধর্মার।

ধর্মার মা এবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'কী খেয়ে ক্ষেতিতে যাবি —মাড়ভাত্তা না রাতের পানিভাত ?'

কাল রাতে সফেদ গোয়ারিনদের বাড়ি খেয়ে আসার জন্য ধর্মার ভাগের যে ভাতটা বেঁচেছিল তা ভিজিয়ে রেখেছে তার মা। ধর্মা একটু ভেবে জানায় এখন পানিভাত খাবে। মাড়ভাত্তা আর শিকার নিয়ে ক্ষেতিতে যাবে দুপুরে খাওয়ার জন্য।

ধর্মার মা কানাভাঙা তোবড়ানো সস্তা সিলভারের থালায় পান্তাভাত এবং বাসি সব্জিটব্জি বেড়ে ছেলেকে খেতে দিয়ে নিজের এবং ধর্মার বাপের জন্য মাড়ভাত্তা বেড়ে নেয়। এই ভোরবেলায় পেটে কিছু দিয়ে তাদেরও খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে।

নিঃশব্দে খাওয়া-দাওয়া চলছিল। জীবনের সবটুকু পরিতৃপ্তি মুখে ফুটিয়ে দুর্গন্ধওলা আধপচা আতপের ফেনাভাত খেতে খেতে সৌখী বলে, 'আর বেশিদিন তুহারকে তকলিফ দেব না ধম্মার মাঈ —'

ধর্মার মা এ কথার উত্তর দেয় না ; শুধু তীব্র বিরক্তিতে আর রাগে চোখ কুঁচকে সৌখীর দিকে তাকায়।

সৌখী ফের বলে, 'হামনি গারুদিয়াসে চলী যায়েগী।'

ধর্মার চমক লাগে। সে শুধোয়, 'সচ ?'

ধর্মার মা ওধার থেকে চিৎকার করে, 'বুড়হী যাবে এখান থেকে ! তা হলে আমাদের হাড্ডি চুষবে কে ? বিলকুল ঝুটফুস (বাজে এবং মিথ্যে)।'

সৌখীর মুখ ফেনাভাতে ঠাসা। কোনরকমে গিলে হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে বলে, 'নায় নায় ধম্মাকি মাঈ—বিলকুল সচ্। হামনি ইয়াসে চলী যায়েগী।'

'কব্ রে গিধ্বি (শকুনি) ?'

'দো-চার রোজের ভেতর। কাল ভিখ মাংতে গিয়েছিলাম টিশনে (স্টেশনে)। ওখানে গণার সাথ দেখা হয়ে গেল।'

ধর্মা এবং ধর্মার মা চমকে ওঠে। শুধোয়, 'গণা !'

সৌখী আস্তে আস্তে তার সরু লিকলিকে গলার ওপর মাথাটা নাড়তে থাকে, 'হুঁ, গণা—'

ধর্মার বাপ শিউলাল অল্প কথার লোক। বলে কম, শোনে বেশি।

এমন যে চুপচাপ আদমী সে পর্যন্ত নড়েচড়ে বসে। বলে, 'তোর তো আঁখে তেজ নেই। ঠিক চিনতে পেরেছিস তো?'

'হাঁ-হাঁ জরুর! আমার সাথ বাতচিত করল। আঁখ আন্ধা হয়ে গেলেও মা তার লেড়কাকে ঠিকই চিনবে রে ধম্মাকে বাপ—'

ধর্মা কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় তার চোখে পড়ে কখন যেন তাদের অজান্তে বারান্দার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে নওরঙ্গী। কতক্ষণ নওরঙ্গী ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেউ টের পায় নি। তাকে দেখামাত্র বুকের ভেতরটা কেঁপে যায় ধর্মার।

নরওঙ্গী মাঝবয়সী আওরত। এত বয়সেও তার শরীরটি ডাঁটোই রয়েছে, কোমরে রয়েছে লচক, চোখে বিজ্‌রী। মেয়েমানুষটা ধর্মাদেরই স্বজাতি অর্থাৎ দোসাদিন। সাজগোজের বাহারও তার চোখ ধাঁধাবার মতো। পরনে জমকালো চড়া রঙের নক্সাওলা গাজীপুরী শাড়ি। চোখে সরু করে বাসি কাজলের টান। বাসি খোঁপা অনেকটাই ভেঙে গেছে, তবু তাতে গয়ার কাজ-করা জালিকাটা চাঁদির কাকাই আটকানো। গলায় রুপোর চওড়া তেতর পাতা (তেঁতুল) হার; বুকের কাছে মাছের আকারের লকিট (লকেট) ঝুলছে। কানে করণফুল, পায়ের আঙুলে বিছিয়া, নাকে নাকবেশর।

ত্রিভুবনে কেউ নেই নওরঙ্গীর। তিনবার স্বজাতের ঘরে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনের ভিত একেবারেই মজবুত না; তিন বারই দু চার মাসের মধ্যে তার বিয়ে টুটে যায়। তেঘরিয়ার (তিন জনের ঘর করেছে যে মেয়েমানুষ) পর চৌঘরিয়া হওয়া তার কপালে জোটে নি। সে জন্য খুব একটা আপসোস নেই নওরঙ্গীর।

প্রথম বার যখন তার বিয়ে হয় তখন বয়েস তার কত? পন্দর কি ষোল সাল। তখনও নওরঙ্গীর মা-বাবা বেঁচে আছে। বিয়ে হলে কী হয়, আচমকা বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের নজর এসে পড়ে তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সফেদিয়া ফুলের মতো দেখতে এই মেয়েটার জন্য রোজ সন্ধ্যেবেলায় আট বেহারার রুপোর গুল-বসানো দামী পাল্কী পাঠিয়ে দিতে লাগলেন তিনি। দিনের বেলা দোসাদটোলাতেই থাকত সে কিন্তু সন্ধ্যে হলেই চলে যেত রঘুনাথ সিংয়ের হাওয়া মহলে। হাওয়া মহল রঘুনাথ সিংয়ের ফুর্তি লোটার জায়গা। মালিক বড়ে সরকার যখন অচ্ছুৎ দোসাদিনকে কৃপা করেছেন তখন গলা দিয়ে কারো টু শব্দটি বার করার উপায় নেই। দিনের বেলা নওরঙ্গী তার স্বামীর

ঘরে কাটাতে পারে কিন্তু তার রাতগুলো রঘুনাথ সিংয়ের। গারুদিয়ার জমিজমা গাছগাছালি পশুপাখি নদীনহরের মতো অচ্ছুৎ ভুমিদাসেরা তাঁর খাস তালুকের সম্পত্তি। তাদের যাকে নিয়ে যখন খুশি যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন।

প্রথম বিয়েটা ছুটবার বছরখানেক বাদে আবার দু নম্বর বিয়ে হল নওরঙ্গীর, তার তিন বছর পর তিন নম্বর সাদি। তিনবার কেন, চোদ্দবার সাদি হলেও মালিকের আপত্তি নেই। দিনের বেলা যত খুশি সে তার স্বামীর অধীন থাক কিন্তু অন্ধেরা নামলেই চাঁদির কাজ-করা পাল্কীতে তাকে উঠতেই হবে।

বছর দশেক এভাবে চলার পর নেশা ছুটে যায় রঘুনাথ সিংয়ের। বগুলা চুনি চুনি খায় অর্থাৎ বক বেছে বেছে ভাল মাছটি খায়, এই বাক্যটি সার্থক করার জন্য তিনি তখন নতুন আওরত জুটিয়ে ফেলেছেন। পুরনো, বহুবার চটকানো, বহুবার ব্যবহৃত দোসাদিন সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। ততদিন মা-বাপ দুজনেই মরে ফৌত হয়ে গেছে নওরঙ্গীর এবং তার তিসরী স্বামীর সঙ্গেও কাটান ছাড়ান হয়ে গেছে। তাতে বড় রকমের লোকসান হয় নি নওরঙ্গীর। রঘুনাথ সিং তাকে ছেড়ে দেবার পর এখন সে হিমগিরিনন্দনের রাখনি। হিমগিরি মোটামুটি অনেকখানিই ক্ষতিপূরণ করে দিতে পেরেছে তার।

পরের রক্ষিতাকে, বিশেষ করে রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ভোগ-করা মেয়েমানুষকে রাখা হিমগিরির পক্ষে খুব একটা সম্মানজনক ব্যাপার নয়। তবে মালিকের, সে যত নীচু জাতই হোক, উচ্ছিষ্টে খুব সম্ভব জাতের দোষ অর্শায় না। হিমগিরি মোটামুটি খুশীই। খুশী নওরঙ্গীও। মালিক বড়ে সরকারের কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁরই সব চাইতে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিটি তাকে রেখেছে। রঘুনাথ সিংয়ের পরেই এই গারুদিয়া মৌজায় হিমগিরি সর্বাধিক ক্ষমতাবান মানুষ। মর্যাদার দিক থেকে খানিকটা নেমে গেলেও মুখে একেবারে চুনকালি লাগবার মতো কিছু ঘটে নি। বরং দোসাদটোলায় আগের মতো দাপটের সঙ্গেই সে আছে। হিমগিরির যে রাখনি তার গায়ে টোকা মারার সাধ্য কার!

রেজে সন্ধ্যেয় সাজগোজ করে মনরঙ্গোলি মেজুরটি হয়ে বসে থাকে নওরঙ্গী। রঘুনাথ সিংয়ের আমলে চাঁদির কাজ-করা পাল্কী আসত তার জন্য। হিমগিরিনন্দনের জিম্মায় যাবার পর আসে ভৈসা বা গৈয়া গাড়ি।

মালিক বড়ে সরকার বা উচ্চবর্ণের বরাস্তন দেওতার রাখনি হওয়াটা দোসাদ সমাজে দোষের ব্যাপার নয়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চালু রয়েছে। দাসখত দেওয়া ভূমিদাসদের সুন্দরী যুবতীরা চিরকালই মালিকদের ভোগের বস্তু। এ নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। বরং ক্ষমতাবান মানুষদের সঙ্গে জুড়ে থাকার মধ্যে এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা জড়িয়ে থাকে। স্বজাতের মানুষজন এ জাতীয় আওরতদের খানিকটা সমীহই করে থাকে। কিন্তু নওরঙ্গীর ব্যাপারটা উল্টো। তাকে দোসাদ মহল্লার প্রতিটি মানুষ একই সঙ্গে ঘেন্না এবং ভয় করে। মনে মনে দশবার করে তার নামে থুতু ফেলে। অবশ্য নিজেদের মনোভাব তারা গোপনই রাখে সে সব প্রকাশ করে কে আর নিজের বিপদ ঘনাতে চায়!

নওরঙ্গী সম্পর্কে ভয় আর ঘেন্নার কারণ এই রকম। সে রোজ রাত্তিরে দোসাদটোলার যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর—যেমন কে কী ভাবছে, কে কী করছে—হিমগিরিকে দিয়ে আসে। গণা যে পালিয়ে গিয়েছিল, সে খবর প্রথম হিমগিরি পায় নওরঙ্গীর কাছে। রঘুনাথ সিং রাজপুতের এত বিশাল তালুক এবং এত অগুনতি ভূমিদাস চালানো মুখের কথা নয়। দিনকাল ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছে যদিও তাদের এখানে কিছুই হয় নি, বিশ পঞ্চাশ কি শ বছর আগের মতোই এখানকার ভূমিদাসেরা ঘাড় গুঁজে জমি চষে চলেছে তবু সাবধানের মার নেই। ভোজপুর কি পূর্ণিয়া থেকে মাঝে মাঝে গোলমেলে খবর আসে। শহুরে লোকেদের উস্কানিতে ওখানকার খরিদী কিষাণেরা বেশ কয়েক বার ক্ষেপে উঠেছে। তাই হিমগিরিকে ভূমিদাসদের সম্পর্কে আগাম খবর রাখতে হয়। যার মারফত এই খবর আসে সে হল নওরঙ্গী। সেই কারণে তার সামনে পারতপক্ষে কেউ মুখ খুলতে চায় না।

সৌখী তার ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে নওরঙ্গীকে দেখতে পায় নি। আগের ঝোঁকেই সে বলে যেতে লাগল, 'অচ্ছা নৌকরি মিলেছে গণার ; তলব শ'ও রুপেয়াসে জ্যাদা। দো-চার রোজের ভেতর সে আমাকে নিয়ে যাবে।'

নওরঙ্গীর সামনে এ সব কথা মুখ থেকে বার করা যে কতটা বিপজ্জনক, সৌখীকে কে বোঝাবে। চোখের ইশারা করলেও আবছা অন্ধকারে তার কমজোরি দৃষ্টিতে পড়বে না। কিছু করতে না পেরে ধর্মার উদ্বেগ ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকে। এমন যে ধর্মার মা, সৌখী

যার দু চোখের বিষ, সে পর্যন্ত তার জন্য ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ভগোয়ান রামজী আর ভগোয়ান কিষুণজীকে মনে মনে ডাকতে থাকে। দেওতাদের কিরপায় গণার যেন কোন বিপদ না হয়।

নওরঙ্গী আর দাঁড়ায় না। দামী একটা খবর যোগাড় করে হেলেদুলে দোসাদপট্টির রাস্তা ধরে কুয়োর কাছে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

নওরঙ্গী অনেকটা দূরে যখন চলে গেছে, সেই সময় ধর্মার মা চাপা গলায় গজগজিয়ে ওঠে, 'বুড়হী গিধ, শয়তান আওরতটা দাঁড়িয়ে ছিল আর তুই গণার কথা বললি! নিজের বেটাকে তুই খতম করতে চাস!'

'কৌন শয়তান আওরত?' সৌখী মুখ তুলে তাকায়।

'টোলামে শয়তান আওরত ক'গো (ক'জন) হ্যায়? বিলকুল এক—উ নওরঙ্গী।'

'গণাকে বাত শুনা নওরঙ্গী?' ভয়ে সৌখীর মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

'হাঁ রে বুড়হী আন্ধী। আপনা বেটাকে আপনা হাতসে খতম কর দিয়া?'

সৌখী এবার মাথায় চাপড় মেরে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'হামনি কা করল, গণাকো জিওনমে আফত লায়ী। হো রামজী—' তার কান্নার শব্দ ভোরের বাতাসে ভর দিয়ে দোসাদটোলায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

নয়

খাওয়া দাওয়ার পর একটা টিনের কৌটোয় কালোয়া অর্থাৎ দুপুরের জন্য মাড়ভাত্তা, বাসি মাংস আর মিরচা-নিমক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। সেই সঙ্গে কাপড়ের তিনটে থলে আর ছোট টিনের কৌটো। আজ খোরাকি বাবদ তাদের চাল, মকাই, নিমক ইত্যাদি এবং রাতে জ্বালাবার জন্য 'মিটি' তেল পাবার দিন। ধর্মা একাই না, কুশীও ওধারের ঘর থেকে নেমে এসে তার সঙ্গ নেয়। সে-ও তার কালোয়া এবং থলেটলে গুছিয়ে নিয়েছে।

শুধু কি কুশী আর ধর্মাই, গণেরি বুধেরি কুঁদরি শনিচারী—

দোসাদটোলার সব খরিদী কিষাণই ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের সঙ্গে চলেছে যত খারিজ মানুষের দল। ধর্মার মা-বাপ, কুশীর মা-বাপদের মতো রঘুনাথ সিংয়ের তালিকা থেকে খারিজ-হওয়া অসমর্থ কমজোরি বুড়োবুড়ীরা। এইসব বাতিল মানুষদের বেশির ভাগই খাদ্যের খোঁজে যাবে তিন মাইল দূরে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ধারের জঙ্গলে। এদের সবার সঙ্গেই রয়েছে বড় বড় পোড়া মাটির তসলা বা হাঁড়ি। দোসাদটোলায় 'পীনেকা পানি' বা খাবার জল নেই। আসার সময় খাদ্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোয়েলের শুখা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করে তসলা ভরেও নিয়ে আসবে। এদের মধ্যে জনকয়েক যাবে দু মাইল ফারাকে মৈথিলী বামুনদের গাঁয়ে বা যত্নবংশীছত্রিদের টোলায় কিংবা গারুদিয়া বাজারে। বাড়ি বাড়ি বা দোকানে দোকানে ঘুরে নানা ধরনের কাজ জুটিয়ে নেয় তারা। যেমন ঘর ছাওয়ার কাজ, মাল বওয়ার কাজ, বাড়ি সাফ করার কাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া কয়েকজন যাবে রঘুনাথ সিংয়ের শ দু'-তিনেক দুধেল গাই আর বকরি চরাবার কাজে।

ধর্মা তার মা-বাপকে বলে, 'হোঁশিয়ার হয়ে জঙ্গলে ঢুকবি'

বুড়োবুড়ী দু'জনেই মাথা নাড়ে, 'হুঁ—'

'জ্যাদা দের (বেশি দেরি) নায় করনা—'

'নায়।'

'মুহ আন্ধেরা (সন্ধ্যার মুখে মুখে) হবার আগেই মহল্লায় লৌটবি। আন্ধেরা নামলেই হাঁড় চেবুয়ারা (নেকড়ে) বেরিয়ে পড়বে'

'হাঁ, জানি—'

রোজই ক্ষেতিতে কাজে যাবার সময় মা-বাপকে এই একই হুঁশিয়ারি দিয়ে যায় ধর্মা।

এদিকে বুড়ী সৌখীও সবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। সে সমানে কেঁদে যাচ্ছিল, 'কা করল হামনি ? আপনা বেটোয়াকো (ছেলের) মৌত ডেকে আনলাম। হো রামজী, হো কিষুণজী গণাকো বঁচা দে, বঁচা দে—'

তার একটানা কান্নার শব্দ ধর্মাকে বিষণ্ণ করে রাখে। নরম গলায় সৌখীকে সে বলে, 'নায় রোনা (কাঁদিস না), নায় রোনা—'

কান্না থামে না সৌখীর।

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় ধর্মা শুধোয়, 'গণা কোথায় কাজ করে

জানিস ?'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায় সৌথী, 'নায়। পুছা নহী (জিজ্ঞেস করি নি)।'

ধর্মা ভেবেছিল, গণার ঠিকানা পেলে ক্ষেতির কাজের পর রাত্রে গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আসা যেত। হতাশ ভঙ্গিতে সে বলে, 'বহোত মুসিবত। আভি রামজীকা কিরপা—'

দোসাদপট্টি আর হাইওয়ের মাঝামাঝি জায়গায় মেটে রাস্তাটা ছ-ভাগ হয়ে ছদিকে চলে গেছে। একটা হাইওয়ের দিকে, আরেকটা কোণাকুণি কাঁকুরে ডাঙার ওপর দিয়ে দক্ষিণ কোয়েলের দিকে। ধর্মারা সেখানে এসে পড়ে একসময়।

বয়স্ক বাতিল দোসাদ-দোসাদিনরা রোজকার মতো এখান থেকে কোয়েলের মরা খাতের দিকে চলে যায়। কেউ কেউ অবশ্য মাঠ পেরিয়ে দূর বাজার আর গাঁগুলোর দিকে। আর ধর্মারা যায় হাইওয়ের দিকে। পাক্কী বা পাকা সড়ক ধরে ওরা এখন ছুটবে রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে। ওদের সঙ্গে সৌথীও যেতে থাকে। খুব সম্ভব বিজুরি তালুকের বাজার কি মৈথিলীদের গাঁয়ে আজ সে ভিখ মাঙতে যাবে।

এর মধ্যেই হাইওয়েতে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। রাঁচী থেকে প্যাটনার বাস, পাটনা থেকে রাঁচীর বাস। তা ছাড়া দূর পাল্লার ট্রাক, সাইকেল রিকশা এবং ভৈসা গাড়িও বেরিয়ে পড়েছে। রোদ উঠতে না উঠতেই হাইওয়ে সরগরম হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর বাতাসে কান্নার ভনভনে আওয়াজ ছড়িয়ে হাইওয়ের ওধারের মাঠে নেমে পড়ে সৌথী। মাঠ ধরে গেলে মৈথিলীদের গাঁয়ে অনেক আগে পৌঁছুনো যায়।

পুব দিকটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। রোদ এখনও ওঠে নি; তবে উঠতে খুব বেশি দেরি নেই। আধবুড়ো গণেরি পেছন থেকে তাড়া লাগায়, 'কত্তে বেড়া ভেলে (কত বেলা হয়ে গেল); জলদি চল—'

সবাই জোরে জোরে পা চালাতে থাকে।

খামারবাড়িতে আসতেই দেখা গেল, হিমগিরিনন্দন এর মধ্যেই তার 'কানটোল রুমে' এসে বসে আছে। মৈথিলী বামহনটা রাত কাটায় নওরঙ্গীকে নিয়ে; তারপর ভোর হতে না হতেই নাহানা সেরে

কপালে চন্দন চড়িয়ে খামারবাড়িতে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বসে থাকে। এ নিয়মের নড়চড় নেই। এমন একটা দিন ধর্মাদের মনে পড়ে না যেদিন এসে তারা দেখেছে হিমগিরি তার 'কানটোল রুমে' বসে নেই।

এ সময়টা অচ্ছুৎ দোসাদদের সঙ্গে কথা বলে না হিমগিরি চোখ বুজে, ঢুলে ঢুলে আর আস্তে আস্তে হাতে তালি বাজিয়ে 'রাম-চরিতমানসে'র পদাবলী গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে।

"ছিতি জল পাবক গগন সমীরা
পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা।"

সারারাত নওরঙ্গীর সঙ্গে শরীরের চর্চা করে রোজ ভোরবেলা সেই শরীরেরই নশ্বরতা এবং অসারতা প্রমাণ করার জন্য গুনগুনাতে থাকে হিমগিরি।

'কানটোল রুমের' পেছন দিকের একটা লম্বা অ্যাসবেস্টসের চালা থেকে 'র‍্যাশন' (বরাদ্দ খোরাকিকে হিমগিরি র‍্যাশন বলে) মেলে। ধর্মারা ওখানে তাদের থলে কৌটো টৌটো রেখে রামধনিয়ার কাছে চলে আসে। খোরাকির দানা এখন মিলবে না; ক্ষেতির কাজের পর সন্ধ্যেবেলা পাওয়া যাবে। থলে নিয়ে মাঠে যাওয়ার অনেক হাঙ্গামা; তাই ধর্মারা এখানেই ওগুলো রেখে যায়।

রামধনিয়ার কাছ থেকে হাল এবং বয়েল বুঝে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়ে।

খামারবাড়ি থেকে হাইওয়েতে আসতে আসতে রোদ উঠে যায়। পুব দিকে গোয়ারদের গাঁ এবং গারুদিয়া বাজার ছাড়িয়ে অনেকদূরে আকাশ যেখানে ঘাড় ঝুঁকিয়ে নেমে গেছে ঠিক সেইখানে আগুনের গোলার মতো লাল টকটকে সূর্যের মাথা দেখা যায়।

ভোরবেলা ধর্মারা যখন মহল্লা থেকে বেরোয়, হাওয়ায় ছিল ঠাণ্ডা ভাব। এখন তাত বাড়তে শুরু করেছে। রোদ যত চড়বে, বাতাস ততই আগুনের হল্কা হয়ে উঠতে থাকবে।

ওরা যখন মাঠের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সেই সময় রাঁচীর দিক থেকে একটা বাস রাস্তার ধারের বড় পীপর গাছটার তলায় এসে থামে। ওটা বাস 'ইস্টাণ্ড' (স্ট্যাণ্ড)। রাঁচী বা পাটনা যেদিক থেকেই বাস আসুক এখানে খানিকক্ষণের জন্য থামে; একটু জিরিয়ে কিছু পাসিঞ্জার কুড়িয়ে আবার দৌড় লাগায়। পীপর গাছটার তলায়

ফুটিফাটা টিনের ছাউনি দিয়ে তিন চারটে দোকান গজিয়ে উঠেছে—একটা পানবিড়ির, একটা চা-বিস্কুটের, একটা ছাতু-নিমক-মরিচের। তু'খানা ইট পেতে একটা হাজমও সারাদিন দেহাতী মানুষজনের চুলদাড়ি কামিয়ে যায়।

রাঁচীর বাসটা থেকে জনকয়েক লোক নেমেছিল। তাদের একজন চেঁচাতে চেঁচাতে অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের কাছে এসে পড়ে, 'এ ধম্মা, ধম্মা হো—'

ধর্মা থমকে দাঁড়ায়। যে লোকটা চেঁচাচ্ছিল সে-ও সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার নাম টিরকে।

টিরকের বয়েস চল্লিশ বেয়াল্লিশ, রাঁচীর ওরাওঁ খ্রীস্টান ওরা। বেঁটেখাটো চেহারা, পেটানো স্বাস্থ্য, তামাটে রঙ, টান-করা চকচকে চামড়া, ছোট ছোট চোখ, পুরু কালচে ঠোঁট, খাড়া চুল। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট, পায়ে কেডস, গলায় কালো কারে সিলভারের ক্রুশ ঝুলছে।

রাঁচীতে একটা বড় হোটেলে ওয়েটারের কাজ করে টিরকে। ছেলেবেলায় পাদ্রীদের কাছে মানুষ হয়েছে। তা ছাড়া বড় হোটেলে বিদেশ থেকে অনবরত গণ্ডা গণ্ডা সাহেব আসছে। তাই টিরকের মুখে সবসময় আংরেজির খই ফুটতে থাকে।

টিরকে প্রায়ই রাঁচী থেকে গারুদিয়া তালুকে ধর্মার কাছে আসে। তার কারণ পরদেশী সাহেবদের তাজ্জব সব শখ। ওরা এদেশের জন্তু-জানোয়ার পশুপাখির নখ-দাঁত-শিং-পালক ইত্যাদি কেনে। সাহেবরা এ সব যোগাড়ের দায়িত্ব দেয় টিরকেকে। কিংবা টিরকেই সাহেবদের কাছে ঘুরে ঘুরে আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে জুটিয়ে দেবার 'অর্ডার' নেয়। হোটেলের টানা ডিউটির পর এত জন্তু-জানোয়ারের নখ দাঁত কোত্থেকে সে জোটাবে? তাই তাকে ধর্মার মতো লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়।

সাহেবদের মেজাজ এবং হাত তুটোই দরাজ। পশুপাখির শিং-টিংয়ের জন্য দেদার পয়সা দেয় তারা। তার থেকে অর্ধেক কেটে নিয়ে বাকী অর্ধেক ধর্মাকে দেয় টিরকে। ভালো ফায়দা না থাকলে কে আর শুধু শুধু খাটে? গরজই বা কী?

টিরকে আসা মানেই তু-চারটে বাড়তি পয়সার আমদানি। ধর্মা বেজায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'আরে ভেইয়া, তুম—এত্তে সুবে!

কঁহাসে ?'

টিরকে জানায়, ভোর চারটের দূর পাল্লার বাস ধরে রাঁচী থেকে সে আসছে।

ধর্মা জিজ্ঞেস করে, 'ক্যা বাত, বাত ক্যা ?'

টিরকে বলে, 'বহোত 'ইমপটিণ্ট' বাত।'

'পাইসা-রুপাইয়া কুছ মিল যায়গা ?'

'জরুর মিলেগা—বহোত মিলেগা। বহোত 'মানি'—'

ধর্মা নড়েচড়ে দাঁড়ায়। তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। আগেও টিরকে মারফত পরদেশী সাহেবদের জন্য জন্তু-জানোয়ারের ছালচামড়া যোগাড় করে দিয়ে ভালো পয়সা কামিয়েছে। গভীর আগ্রহে সে শুধোয়, 'তুহারকে মুহমে 'ঘিউ-শক্কর' (তোমার মুখে ঘি-মিষ্টি পড়ুক)। বোলো, জলদি বোলো ভেইয়া, ক্যা করনে পড়ে ? এখনই ক্ষেতিতে যেতে হবে ; দাঁড়িয়ে বাতচিত করার 'টেইন' (টাইম) নেই।'

টিরকে বলে, 'চল, যেতে যেতে বাতাই—'

'হাঁ—'

মাঠের দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিরকে বলে, 'এক আমরিকী সাহাব এসেছে। তাকে একজোড়া কোটরার (**barking deer**) বাচ্চা জুটিয়ে দিতে হবে।

'কত পাইসা-রুপাইয়া মিলবে ?'

'দশ—'

'নায় নায়, ইতনা কমতি নায়। জঙ্গলমে যানা পড়ি। দো-তিন রোজ ক্ষেতির কাম বরবাদ। খোরাকি কাটা যাবে ! আউর কুছু দো ভেইয়া—'

একটু ভেবে টিরকে বলে, 'ঠিক হ্যায়। বিশ টাকা পাবি—'

ধর্মা তবু বলে, 'লেকেন—'

'লেকেন ফেকেন নেহী। সিরেফ তোর জন্যেই ঐ দাম। দামের ব্যাপারে আর মুহ্ খুলবি না। আর শোন, পরশু আসব ; কোটরার বাচ্চা 'রেডি' করে রাখবি। এক হাতে পাইসা, এক হাতে মাল—'

'নায় নায় ভেইয়া, পরশু নায় হোগা। কোটরার বাচ্চার জন্যে কত দিন জঙ্গল ঢুঁড়তে হবে, রামজী জানে। সাত রোজ 'টেইন' দাও—'

'নায় নায়, আমরিকী সাহাব এত রোজ থাকবে না। হামনি

তরশু আয়েগা—'

'নায়, আউর এক রোজ। নরশু আও—'

চোখ কুঁচকে কিছু চিন্তা করে টিরকে বলে, 'ঠিক হ্যায়; নরশুই আসব। পাক্কি বাত?'

ধর্মা ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'পাক্কি বাত—'

টিরকে আর দাঁড়ায় না; ঘুরে হাইওয়ের দিকে চলে যায়।

কথা বলতে বলতে ধর্মা পিছিয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে কুশীও। কুশীটা সর্বক্ষণ তার গায়ে আঠার মতো সেঁটে থাকে। অন্য ভূমিদাসরা এবং তাদের ভাগের পশুগুলো বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ধর্মা তার বয়েল দুটোর ল্যাজে মোচড় দিয়ে জিভ আর আলটাকরা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বার করে। তারপর চেঁচায়, 'চল বেটোয়া, জলদি কর—'

বয়েলদের গতি বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে ধর্মা এবং কুশীরও।

কুশী এতক্ষণ চুপচাপ ছিল; এবার মুখ খোলে, 'বিশ রুপাইয়া মিলেগা—'

'হাঁ—' ধর্মা আস্তে মাথা নাড়ে।

কুশী বলে, 'বহোত রুপাইয়া—'

ধর্মা উত্তর দেয় না। সে শুধু ভাবে এই বিশ টাকা যোগ হলে তাদের মুক্তি কেনার জন্য আর কত বাকী থাকবে? মাস্টারজীর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

দশ

জষ্ঠি মাসের বেলা বেশ চড়ে গেছে। আর খানিকটা পরেই সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর উঠে আসবে। গরম লু-বাতাস চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে যেন। গাছপালা বা মানুষের ছায়া দ্রুত ছোট হয়ে আসছে।

ঝলসানো মাঠের মাঝখানে পূর্বপুরুষদের মতোই লাঙল ঠেলে চলেছে ধর্মা। তার পেছন পেছন উর্ধ্বশ্বাসে অন্যদিনের মতোই দৌড়ুতে দৌড়ুতে কোদো বেছে চলেছে কুশী।

ওধারে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের পাশে বিজুরি তালুকে অন্য

সব দিনের মতো ট্রাক্টর চলছে। হাইওয়ের ওপর বাস-লরি-সাইকেল রিকশার স্রোতে কামাই নেই। যে কোন দিনের মতোই গারুদিয়ার এই অঞ্চলটায় সেই একই চিত্র। হাল চষতে চষতে আজ একটা তফাত শুধু চোখে পড়েছে। হাইওয়ে দিয়ে একটা জীপে করে ক'টা ছোকরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে খানিকক্ষণ আগে বিজুরির দিকে চলে গেছে, 'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো—'

কালই পাটনা থেকে চুনাওর টিকিট নিয়ে ফিরেছেন রঘুনাথ সিং। আর আজই তাঁর লোকজনেরা ভোট মাঙার জন্যে দিগ্বিদিক চষে বেড়াতে শুরু করেছে।

বহুদর্শী আধবুড়ো গণেরি ওধারের একটা ক্ষেত্র থেকে শুধু বলেছে, 'বোটকা খেল চালু হো গৈল—'

দুপুরের ঠিক আগে একটা লঝঝড় সাইকেলে চেপে ঝক্কর ঝাঁই ঝক্কর ঝাঁই শব্দ করতে করতে এল রামলছমন। আগেই জানানো হয়েছে, আজীবচাঁদ যেমন রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা, এই রামলছমন তেমনি বড়ে সরকারের খামারবাড়ির সর্বেসর্বা হিমগিরি-নন্দনের পা-চাটা কুত্তা।

রামলছমনের কাজ হল, রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে ক্ষেতিতে ঘুরে জনমদাসদের কাজের তদারকি করা। সোজা কথায় কে কোথায় ফাঁকি মারছে, কে আড্ডা দিচ্ছে, কে গা ঢিলে দিয়ে কাজে গাফিলতি করছে, এ সব দিকে নজর রাখা এবং দরকারমতো হিমগিরিকে খবরগুলো জানিয়ে দেওয়া। লোকটার গিদ্ধড়ের চোখ—সে চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করার উপায় নেই।

কাল রামলছমন ক্ষেতিতে আসে নি। আজ নিশ্চয়ই তার শোধ তুলে ছাড়বে। ধর্মারা ভয়ে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে লাঙল ঠেলে যেতে থাকে। লোকটা যে কথায়বার্তায় বা ব্যবহারে মারাত্মক ধরনের, তা নয়। কিন্তু হিমগিরির কাছে গিয়ে কখন কী লাগিয়ে বসবে তার ঠিকঠিকানা নেই। তার ফলাফল বেশির ভাগ সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

সাইকেলটা মাঠের একধারে একটা কোমরবাঁকা সীসম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে 'রামসীয়া'র গান

গাইতে গাইতে এগিয়ে আসে রামলছমন, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া—' প্রায় সারাদিনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একটাই পদ সে গেয়ে থাকে। হিমগিরির যেমন 'কানমে ঘুষল', রামলছমনের তেমনি 'চলে বনবাস রামসীয়া—'। এগুলো তার ধরতাই বুলি।

রামসীতা জনকীয়ার গান গাইলে কী হবে, রামলছমনের নজরটা সর্বক্ষণ ভাগাড়ের দিকে। ভূমিদাসদের কাজকর্মের ওপর নজর তো সে রাখেই, তা ছাড়া তার চোখ চরকির মতো ছুঁক ছুঁক করে অচ্ছুৎদের ডাঁটো যুবতী মেয়েদের দিকেই বেশি ঘুরতে থাকে। শুধু ভূমিদাসদের মেয়েই না, যে কোন ঢঙ্গিলা যুবতী ছুকরি দেখলেই রামলছমন চনমনিয়ে ওঠে। 'চলে বনবাস রামসীয়া জনকীয়া—' গাইতে গাইতে তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায় সে। এই স্বভাবের জন্য গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের লোকজনেরা তাকে বলে 'বগুলা ভকত' বা বকধার্মিক। আর ভূমিদাসরা বগুলা ভকত তো বলেই, তা ছাড়া আরো বলে 'চুহা'। সেটা হিমগিরির কাছে অনবরত তাদের নামে রামলছমন লাগায় বলে। ও যা লোক, অচ্ছুৎদের পান থেকে চুনটা একবার খসলে আর উপায় নেই। সেটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হিমগিরির কানে গুজগুজিয়ে তুলে ছায়।

দূর থেকে রামলছমনকে দেখামাত্র সবাই সতর্ক হয়ে গেল। চাপা গলায় আধবুড়ো গণেরি বলে, 'হোঁশিয়ার—'

অন্যরা অস্পষ্ট স্বরে বলাবলি করে, 'চুহাকে বচ্চে আ গৈল—'

যুবতী মেয়েদের মধ্যে দুর্দান্ত বেপরোয়া এবং ডাকাবুকো যারা তারা বলে, 'আ গৈল গারুদিয়াকে নাগরিয়া বগুলা ভকত—'

গানের সেই পদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার গাইতে গাইতে পরনের কাপড় লিকলিকে উরু পর্যন্ত গুটিয়ে এ ক্ষেত থেকে ও ক্ষেতে চরকিপাক দিতে থাকে রামলছমন। ঘুরতে ঘুরতে সে চলে আসে আধবুড়ো ধানপতের ছ'কোণা জমিতে। তার বয়সী অনেকেই আছে ভূমিদাসদের মধ্যে। কিন্তু ধানপত কমজোরি দুব্‌লা মানুষ; গেল সাল চীচকের ব্যায়রামে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিল। সেই থেকে শরীর ভেঙে পড়েছে। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে এ বছর যেভাবে সে ধুঁকছে তাতে বেশিদিন আর তাকে খোরাকি দিয়ে রঘুনাথ সিং রাখবেন বলে মনে হয় না। খুব শীগগিরই সে খারিজ হল্‌ বলে।

রামলছমনকে দেখে গায়ের সবটুকু শক্তি হাতের মুঠে জড়ো করে

ধানপত পাথরের মতো নীরেট মাটিতে প্রাণপণে লাঙলের শীষ ঢোকাতে থাকে। পরিশ্রমে এবং কষ্টে হাত আর গলার শির দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে তার; ঘোলাটে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে। পোড়া তামাটে রঙের গা বেয়ে স্রোতের মতো গল গল করে ঘাম ছুটতে থাকে।

কতটা জমি চষা হয়েছে, চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে রামলছমন বলে, 'ক্যা রে বুড়হা, আধি রোজ কাম করে এইটুকু জমিন চষেছিস!' সত্যি সত্যিই বেশি চষতে পারে নি ধানপত। অবশ্য বেশি চষলেও রামলছমন এই এক কথা প্রতিটি জমিতে ঘুরে ঘুরে বলবেই। এটা ওর কথার মাত্রা বা মুদ্রাদোষ, যাই বলা যাক না।

ধানপত উত্তর না দিয়ে লাঙল ঠেলতে থাকে। ঠিকমত জমি চৌরস করতে না পারলে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, সে জানে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই ভীত হয়ে পড়েছে ধানপত।

রামলছমন ফের বলে, 'হারামজাদ অচ্ছুৎ ভৈস! চলে বসবাস রামসীয়া জনকীয়া—' কথার ফাঁকে এক পদ গেয়েই আবার শুরু করে, 'ধান্দেবাজ ফাঁকিবাজ নিকম্মা উল্লু কাঁহিকা! আধি রোজে এই কাম! বিনা কামে খোরাকি মারার মতলব! অ্যায়সা অ্যায়সা পেটের দানা মেলে! চলে বনবাস রামসীয়া জানকিয়া—'

ওধারের ক্ষেত থেকে আধবুড়ো গণেরি হাতজোড় করে এগিয়ে আসে। দোসাদটুলির সে মাতব্বর মানুষ। সবার বিপদে আপদে একেবারে বুক দিয়ে পড়ে। ধানপতের হয়ে সে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, 'ধানপতিয়া দুবলা আদমী; পিছলা সাল ভারী বুখার ভৈল। বামহন দেওতা, গুস্‌সা দায় হোনা। বহোত রওদ (রোদ)—'

গণেরির দিকে ফিরে খেঁকিয়ে ওঠে রামলছমন, 'বহোত রওদ! শালেলোগদের মাখ্‌খনের তবিয়ত, রোঁদে গলে যাবে! চলে রাম-সীয়া জানকীয়া—বারিষ নামার আগে পুরা জমিন চষা না হলে সব হারামজাদের খোরাকি বিলকুল বন্ধ—'

গণেরি বলে, 'হো জায়গা দেওতা, জরুর হো জায়েগা। গুস্‌সা নায় হোনা—'

রামলছমন বলে, 'কথায় কাম হবে না। চষা না হলে সবার বুকে শুখা চানা ফেলে রগড়ানো হবে।' বলেই সামনের দিকের জমিতে তাকায়। সেখানে লাঙল দিচ্ছে বুধেরি। তার একটা পা সামান্য

ছোট। রামলছমন চেল্লায়, 'অ্যাই বুধেরি, ল্যাংড়া বকরা (ছাগল), তোর জমিনের আধাআধিতেই তো আঁচড় পড়ে নি।'

বুধেরি ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বলল, 'বারিষকো মুহ্‌মেই (শুরুতেই) হো যায়েগা হুজৌর—'

'দেখেগা।'

শুধু ধানপত বা বুধেরিকেই না, আরো কয়েকজনকে ধমকধামক দিল রামলছমন, তর্জন গর্জন করল। বোঝা যায়, যাদের ওপর সে বেশি হম্বিটম্বি করেছে তাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ আছে। ক্ষেতি থেকে সোজা খামারবাড়িতে গিয়ে হিমগিরির কাছে তাদের নামে লাগাবে রামলছমন। ফলে খোরাকি বাবদ যে মাড়োয়া গেঁহু মকাই বা সামান্য গুমো আতপ মেলে তার থেকে কিছু কাটা যেতে পারে। হিমগিরি আর রামলছমন আংরেজি করে বলে 'ফাইন' বা জরিমানা। রামলছমনের চুকলির জন্য ফী সপ্তাহে কাউকে না কাউকে 'ফাইন' দিতে হয়।

রামলছমন এবার আলাদাভাবে কাউকে না, তাবত খরিদী ভূমিদাসের উদ্দেশ্যেই গলায় অনেকখানি আবেগ ঢেলে বলে, 'কাম কর। থোড়া পেয়ারসে লাঙল চালা। বড়ে সরকার মালিক তোদের জন্যে এত করছেন, খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছেন। নিমকহারামী না করে তাঁর জন্যে তোরা কিছু কর। কতবার তোদের বলেছি, মালিকের জন্যে করলে 'পুণ' (পুণ্য) হয়—'

ক্ষেতে ক্ষেতে ভূমিদাসেরা বয়েলের ল্যাজ মোচড়াতে মোচড়াতে চেঁচাতে থাকে, 'উররা—উরর—উরর—'

বুধেরির ক্ষেতে দাঁড়িয়ে রামলছমন শকুনের চোখ দিয়ে চারদিক দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে আর 'রামসীয়া, জানকীয়া' গাইতে গাইতে খানিকক্ষণ পর ধর্মার জমিতে চলে আসে। ধর্মার পেছন পেছন দৌড়ুতে দৌড়ুতে যথারীতি আগাছা বাছছিল কুশী ; কখনও বা একটু থেমে ঝুঁকে মাটি ভেঙে ঝুরঝুরে করে দিচ্ছে।

আলের ওপর দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ধর্মা এবং কুশীর কাজ ছাখে রামলছমন। কিন্তু না, হাজার চেষ্টা করেও কোথাও এতটুকু খুঁত বার করতে পারে না সে। তাতে মনে মনে কিছুটা ক্ষেপে যায়। কী ভেবে সে ডাকে 'এ ধম্মা—'

ধর্মা লাঙল ঠেলতে ঠেলতেই ঘাড় ফেরায়। বলে, 'ক্যা দেওতা ?'

'কাল রাতে বাজারে কালালীর কাছে তোকে আর কোশীকে দেখলাম না ?'

ধর্মা তটস্থ হয়ে উঠে। ঢোক গিলে বলে, 'উধরি গৈয়া থা (গিয়েছিলাম)।'

রামলছমন শুধোয়, 'আমাকে দেখে তুরন্ত ভেগে পড়লি যে তোরা ?'

ধর্মা ভাবে, সত্যি গিধের চোখ জানবরটার। কুশী আর সে যে তাকে দেখে দারুখানার রাস্তা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে এসেছিল, সেটা তা হলে রামলছমনের নজর এড়ায় নি। তার চোখে ধুলো দেওয়া খুবই মুশকিল। শ্বাসটানার মতো শব্দ করে সে বলে, 'নায় দেওতা, নায়। আপহিকো নায় দেখা হামনি—'

'ঝুটফুস—'

'নায় দেওতা, নায়—'

এ ব্যাপারে আর জল ঘোলা করে না রামলছমন। সরু মরকুটে বাঁশের মতো পা ফেলে ফেলে কাছে এসে কুশীর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কুশী চলতে শুরু করলে, সে-ও চলতে থাকে। কুশী থামলে সে-ও থামে।

এই ভয়টাই করা হয়েছিল। যুবতী ছুকরি দেখলে বিশ হাত তফাতে আলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমন ধাতই নয় রামলছমনের। এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক। জমিতে এসে চাষ-টাষ নিয়ে খানিকক্ষণ একথা সেকথা বলার পর মেয়েদের গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যায় বগুলা ভকতটা।

রামলছমন গ্যাদগেদিয়ে একটু হাসে। তারপর দ্রুত 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া' কলিটা গেয়ে বলে, 'কী গতর করেছিস কোশিয়া! ক্যা গদরাই জওয়ানি। ফিলমকা (ফিল্মের) হিরোইন য্যায়সা। হোয় হোয়, চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া—' গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে বর্ষাকাল বাদে সারা বছর তাঁবু খাটিয়ে যে টেম্পোরারি সিনেমা হল বসানো হয় সেখানে গিয়ে প্রচুর হিন্দী ছবি ভাখে রামলছমন। যে ছবিই আসুক সে দেখবেই। 'রামসীয়া জানকীয়া'র সঙ্গে তার কথায় 'ফিলমকা' হিরো-হিরোইনেরা এসে যায়।

লোভের বদবু মাখানো রামলছমনের গোল গোল ছোট ছোট চোখ কুশীর বুক কোমর এবং কোমরের তলার দিকে অনবরত ছোটাছুটি

করতে থাকে। আর মাঠের কোদো বাছতে বাছতে দম আটকে আসে কুশীর, শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে। কেননা খাটো হেটো শাড়ি আর জামায় তার পুষ্ট সতেজ শরীর পুরোপুরি ঢাকা পড়ে নি। আগাছা বাছার ফাঁকে ফাঁকে একবার বুকে হাত চাপা দেয় কুশী, একবার শাড়ির খুঁট টেনে কোমরের কাছের ফাঁকা জায়গাটা ঢাকতে চেষ্টা করে।

কুশীকে দেখতে দেখতে কুর্তার পকেট থেকে কৌটো বার করে রামলছমন। সেটার ভেতর থেকে বেরোয় চুন এবং তামাকপাতা। হাতের পাতায় ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে প্রথমে নিজের ঠোঁটের ফাঁকে খানিকটা ঢুকিয়ে ছায়। তারপর কুশীকে বলে, 'লে—'

কুশী খৈনি যে খায় না তা নয়। কিন্তু রামলছমনের কাছ থেকে নেশার এই উপহার নেবার ফলাফল কতদূর যেতে পারে সে সম্বন্ধে তার মোটামুটি ধারণা আছে। দূর থেকে শুধু শরীর দেখার দাম হিসাবে খৈনি দেবার মতো শৌখিন লোক রামলছমন নয়। কিছু নিলে এই বগুলা ভকত তার দশগুণ উশুল করে নেবে অন্যভাবে। কুশী একটা হাত নেড়ে কাচুমাচু মুখে বলে, 'নায় দেওতা, নায়—'

'লে না—' রামলছমন একরকম জোরই করতে থাকে।

'নায় নায়—'

'ঠিক ছায় —' অগত্যা বাকী খৈনিটুকুও দাঁতের গোড়ায় পুরে পিচিক করে থুতু ফেলে রামলছমন ফের বলে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। ক্যা বদন, ক্যা আঁখ, ক্যা সিনা রে তোর কোশিয়া! বামহন-কায়াথ-রাজপুতদের ঘরে অ্যায়সা মেলে না।'

নিজের শরীরটা নিয়ে কী করবে, কোথায় লুকোবে, ভেবে পায় না কুশী। করুণ মুখে সে বলতে থাকে, 'নায় নায় দেওতা, অ্যায়সা নায় বোলো—'

রামলছমন আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাল-বয়েল চালাতে চালাতে হঠাৎ থমকে ঘুরে দাঁড়ায় ধর্মা। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি সে। এবার বলে, 'বামহন দেওতা, এক বাত—'

'কী?'

'কুশী জমিন সাফ করতে না পারলে বারিষ নামের আগে কাম পুরা হবে না। অব আপহিকো কিরপা।' বলে রামলছমনের মুখের দিকে তাকায় ধর্মা। বগুলা ভকত যেভাবে কুশীর পেছনে লেগেছে তাতে তাকে ঠেকানো দরকার। কিন্তু ও যা ধূর্ত শয়তান আদমী

তাতে কাজের দোহাই ছাড়া অন্য কোনভাবেই আটকানো যাবে না। রামলছমনের রকমসকম দেখে ভেতরে ভেতরে ভয়ানক রেগে যাচ্ছিল ধর্মা। ইচ্ছা হচ্ছিল দৌড়ে ঘর থেকে একটা টাঙ্গি বার করে এনে চুহাটার ঘাড়ে কোপ ঝেড়ে ছায়। শালে শয়তানের বাচ্চাটা কেন কুশীর পেছনে লেগেছে, সে বোঝে। কিন্তু টাঙ্গি ঝেড়ে ফায়দাও যে নেই, তাও সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হয়। তার আর কুশীর জীবন স্রেফ খতরা হয়ে যাবে। তার চাইতে কৌশলে ওকে যতটা তফাতে হটিয়ে রাখা যায়।

গোল গোল স্থির চোখে কিছুক্ষণ ধর্মাকে ছাখে রামলছমন। পিচিক করে আরেক বার থুতু ফেলে। থেমে থেমে বলে, 'এ ছোকরিরা তুহারকা ডুলহানিয়া হোগী—নায়?' তারপর উত্তরের জন্য না দাঁড়িয়ে 'চলে বনবাস—' গাইতে গাইতে ডান দিকের চারটে ক্ষেত পেরিয়ে গিধনীর কাছে চলে এল।

গিধনী মাধোলালের জমিতে তার লাঙলের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে মাটি সাফ করে। রামলছমনকে দেখে বুক চিতিয়ে চোখ কুঁচকে সে বলে, 'আও আও বামহনিয়া, হামনিকো প্যারা ডুলহন—' দোসাদটুলির এই একটা মেয়ে যার মুখে কিছুই আটকায় না। কাউকে রেয়াত করে কথা বলা তার ধাতে নেই। বিশেষ করে রামলছমনকে সে আদপেই পরোয়া করে না। যে নিজের মান-সম্মান রাখতে জানে না তাকে কে রেয়াত করবে?

রামলছমন ট্যারাবাঁকা কালচে দাঁত বার করে শিয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'তু বহোত হারামী ছোকরিয়া—'

গিধনি বলে, 'তা হলে আমার গায়ে গা ঘষতে রোজ রোজ আসো কেন রে বামহনিয়া?'

রামলছমন উত্তর ছায় না; আরেক দফা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে। হাসিটায় নোংরা থকথকে কাথ মেশানো যেন।

গিধনি আবার বলে, 'ক্যা মাংতা হামনিকো পাস? কী চাও?'

রামলছমন হাসতে হাসতেই চোখ টেপে। তারপর তড়িঘড়ি করে বলে, 'বুঝিস না। জওয়ান আদমী জওয়ানী ছোকরির কাছে কেন ঘোরে?'

দ্রুত এক পলক মধ্যবয়সী গিধটাকে দেখে নেয় গিধনি। তারপর

বলে, 'তুম জওয়ান ছোকরে—'

'তব ক্যা বুড়হা ? উমর (বয়স) তিশ সাল পুরা হয় নি ; গেল বছর গর্মীতে আধা শির সফেদ হয়ে গেল। আগর—'

'এক কাম করোগে বামহনিয়া ?'

'কা ?'

'আমাকে সাদি করবে ?'

অন্য দিন রামলছমনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নোংরা অশ্লীল ঠাট্টা করে গিধনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অচ্ছুৎ দোসাদের ঘরের মেয়ে হয়ে কিনা সে রামলছমনকে সাদি করতে বলার মতো হঠকারিতা দেখায় ! বগুলা ভকত যত খারাপ যত গন্ধী লোকই হোক না, বামহন তো—তুনিয়ার সেরা জাত। কী করে যে গিধনির সিনায় এত সাহস হয়, কে জানে। গোটা গারুদিয়া তালুকটাই যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বাজ পড়ার পরের অবস্থার মতো স্তব্ধ হয়ে যায়।

এদিকে হাসতে হাসতে থমকে গিয়েছিল রামলছমন। মুখ আলগা হলেও গিধনির মুখে আগে 'আর কখনও এমন কথা শোনে নি। রাগে রামলছমনের মুখচোখ এবং কানের লতি গনগনে আগুনের মতো হয়ে উঠতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'বদ আওরত ! রাণ্ডী কাঁহিকা—' বলেই ঘাড়টা বাঁই বাঁই করে ডাইনে এবং বাঁয়ে ঘোরাতে থাকে।

প্রথমটা চারধারের জমিতে খরিদী কিষাণরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে মজা পেয়ে তারা দাঁত বার করে হাসতে শুরু করেছে। রামলছমনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ধাঁ করে মুণ্ডু ঘুরিয়ে আবার বয়েলের ল্যাজ মোচড়াতে মোচড়াতে চেঁচাতে থাকে, 'উরর—উরর—উররা—'

এদিকে গিধনি রামলছমনকে বলে, 'সাদি না করে মধু পীতে (খেতে) চাও ? তা হলে রাতকো ঘরের তুয়াজ (দরজা) খুলে রাখব। চলে এসো—'

উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিশেষ করে মালিক বড়ে সরকার এবং হিমগিরি বা রামলছমনের মতো তাঁর প্রবল দাপটওলা নৌকরেরা পুরুষানুক্রমে খরিদী কিষাণদের ঘরের যুবতী মেয়েদের ভোগদখল করে আসছে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মতো এটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ঠাট্টা করবে, মজা করবে—সেটা খুবই অসম্মানজনক।

গিধনির কথায় চারপাশ থেকে হাসির শব্দ ওঠে। একসঙ্গে অনেক আতসবাজী ফাটলে যেরকম হয় সেরকম শব্দ। জষ্ঠি মাসের তাতানো বাতাসে ভর করে সেই আওয়াজ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

রামলছমন ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুঁড়ে এধার-ওধার দেখতে দেখতে চিৎকার করতে থাকে, 'কৌন হাসতা, কৌন রে বান্দরকে বাচ্চা—'

কেউ উত্তর দেয় না। নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে ঘাড় গুঁজে সবাই ফের জমি চষতে থাকে।

গিধনির দিকে ফিরে রামলছমন আবার বলে, 'হারামী আওরত কাঁহিকা। তুহারকে হালচাল বদ, জবান বদ, তোর সারা গায়ে বদবু (খারাপ গন্ধ)—'

'তা হলে বদবু শুঁকবার জন্য আসো কেন রে বামহনিয়া? বগুলা ভকত, তোমাকে কে অচ্ছুৎদের মেয়ের কাছে আসতে বলে!'

রামলছমন গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে এবার চেঁচাতে থাকে, 'তোকে আমি সিধা করে ছেড়ে দেব রাণ্ডী—'

আজ যেন গিধনির ওপর জিন বা সাঁখরেল (ভূত বা শাঁকচুন্নী) ভর করেছে। দু হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে সে। তারপর নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বলে, 'আরে যা যা বামহনিয়া, তোর মতো সিধা করনেবালা আমি বহোত দেখেছি। যা যা, তুহারকে মুহ্‌মে থুক—' বলে তার মুখে ঠিক না, জমিতে গুনে গুনে সাতবার থুতু ফেলে গিধনি।

গিধনির মা-বাপ এবং ওপর দিকের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে খিস্তি খেউড় করতে করতে রামলছমন বকের মতো পা ফেলে ফেলে তার সেই সাইকেলটায় গিয়ে ওঠে। তারপর ক্ষেতের পাশের শক্ত পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে ঝক্কর ঝাঁই, ঝক্কর ঝাঁই আওয়াজ তুলতে তুলতে হাইওয়ের দিকে চলে যায়।

বড় সড়ক বা হাইওয়ের বাঁকে রামলছমনের সাইকেল অদৃশ্য হয়ে যাবার পর চারদিকের ক্ষেত থেকে সবাই উঠে এসে গিধনিকে ঘিরে ধরে, 'তোর জন্যে ঐ বামহনিয়া চুহাটা আমাদের সবার পেট (খোরাকী বা

রোজগার) কাটার ব্যবস্থা করবে। বিলকুল ভুখা থাকতে হবে ক'রোজ।'

গিধনি বোঝাতে চেষ্টা করে, 'কসুর করেছি আমি।' পেট যদি কাটে আমারটা কাটবে। তোমাদের কেন কাটবে? কভ্‌ভি নায়—'

'চুহাটার কথায় আমরা হাসলাম যে। হারামজাদ বগুলা ভকত গুস্‌সা হো গৈল। শোধ না তুলে কি আমাদের ছাড়বে ঐ বামহনিয়া গিধটা জানিস না ও কিত্তে বড়ে (কত বড়) খাতারনাক আদমী—'

গিধনি হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'ডরো মাত। আমি সব ঠিক করে দেব।'

মাধোলাল গলার শির ফুলিয়ে চেঁচায়, 'কী ঠিক করবি তুই, কী ঠিক করবি? মর গিয়া হামনিলোগ, জরুর মর গিয়া—' কোন ব্যাপারে জোর দিতে হলে বা উত্তেজিত হয়ে উঠলে একটা কথা দু'বার করে বলে সে।

গিধনি বলে, 'আরে নায় নায়। বগুলা ভকতের কথায় যদি খোরাকি কাটা যায় আমি সিধা বড়ে সরকারের মকানে চলে যাব। বলব, গলতি আমার। খোরাকি কাটতে হলে আমারটা কাটো।'

এতক্ষণ অভিজ্ঞ জ্ঞানী গণেরি একটা কথাও বলে নি। চুপচাপ সবার চিৎকার চেঁচামেচি আর গিধনির কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, 'তোরা ডরাস না; এখন খোরাকির মাড়োয়া কি গেঁহু কাটা যাবে না।' গণেরির বলার ভঙ্গিটি ধীর কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়।

সবাই সমস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কায় কায়?' গণেরির কথায় তারা রীতিমত অবাকই হয়েছে।

গণেরি বুঝিয়ে দেয়, 'চুনাও আ গৈল নায়? বড়ে সরকার হামনিলোগকো মিঠাইয়া খিলাইল। ভোট মাংনেকো টেইনমে (টাইমে) খোরাকি নায় কাটেগা।' গণেরি বহুদর্শী মানুষ। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিপুল। এই ভূমিদাসদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে তার জ্ঞান সব চাইতে বেশি। আগেও অনেক বার দেখা গেছে সে যা বলে তার ষোল আনাই ঘটে যায়। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সে বুঝেছে এই নির্বাচনের সময় বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং তাঁর ভোটদাতাদের চটাবেন না—তা তারা তাঁর জমির খরিদী ভূমিদাসই হোক, জল-অচল অচ্ছুৎই হোক আর ভিখমাঙোয়া গরীব মানুষই হোক।

গণেরির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আবার সবাই চাষের কাজে নামে ; এখন আর তাদের কোনরকম দুর্ভাবনা নেই।

সন্ধের আগে আগে সূর্য ডোবার মুখটায় রঘুনাথ সিংয়ের ভূমিদাস এবং অবোধ বয়েলের পাল যখন খামারবাড়িতে ফিরছে সেই সময় সবার চোখে পড়ে ভোটের সেই গাড়িটা বিজুরি তালুকের দিক থেকে ফিরে আসছে।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট (ভোট) দো।'

'রঘুনাথ সিং—'

'বোট দো।'

জীপটা তাদের পাশ কাটিয়ে একসময় বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যায়।

গণেরি যে সত্যি সত্যিই অত্যন্ত জ্ঞানী এবং দূরদর্শী, খামারবাড়িতে এসে তা টের পাওয়া যায়। ধর্মাদের এক দানা খোরাকিও কাটা গেল না।

এগারো

আজ সকাল থেকেই রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে বিপুল তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বড়ে সরকার কিছুক্ষণের ভেতর বিজুরি তালুকে মিশিরলালজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। রঘুনাথ সিংয়ের ভাগে যে নির্বাচনকেন্দ্রটি পড়েছে তার একদিকে গারুদিয়া তালুকের গোটা সতের আঠার গ্রাম, অন্যদিকে বিজুরি মৌজার পনের ষোলটা গ্রাম। সব মিলিয়ে বত্রিশ তেত্রিশটা গ্রাম। মোট ভোটদাতা লাখের ওপরে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই নির্বাচনকেন্দ্রের এবং তার ভোটদাতাদের অর্ধেকটাই পড়েছে বিজুরিতে। চুনাওতে জিততে হলে বিজুরির ভোটদাতাদের কথা ভাবতেই হবে। তাদের বাদ দিয়ে জেতা অসম্ভব। এই নির্বাচনে আরো কয়েকজন প্রার্থী রয়েছে। তাদের কেউ যদি আগেভাগেই এসে মিশিরলালজীকে ভজিয়ে নিজের দিকে টানতে পারে তা হলে ভরাডুবি অনিবার্য। তাই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে রঘুনাথ সিং বিজুরি ছুটছেন।

বিজুরি তালুক যাঁর খাস দখলে এবং সেখানকার মানুষজনের ওপর যাঁর পুরো কনট্রোল, তিনি হলেন মিশিরলালজী—উচ্চবর্ণের এদেশী ব্রাহ্মণ। তাঁর কথায় বিজুরির দু-তিন লাখ মানুষ ওঠে বসে, বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অতএব এই মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়াটা রঘুনাথ সিংয়ের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিশিরলালজী একটা আঙুল তুললে বিজুরি মৌজার তাবত ভোটদাতা ভোটের কাগজে রঘুনাথ সিংয়ের নামের পাশে রাবার স্ট্যাম্পের মোহর মেরে দেবে।

মিশিরলালজীর সঙ্গে কোনরকম অসদ্ভাব নেই রঘুনাথ সিংয়ের। বরং এক জাতের প্রীতি এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কই রয়েছে। মিশিরলালজী উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ আর রঘুনাথ সিং রাজপুত ক্ষত্রিয়। এমনিতে জাতপাতের প্রচণ্ড কড়াকড়ি আর বাছবিচারের দেশ এই বিহারে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। নিমন্ত্রণ করলে মিশিরলালজী গারুদিয়ায় রঘুনাথ সিংয়ের কোঠিতে যান কিংবা রঘুনাথ সিং বিজুরিতে আসেন। তোহারের দিনে কিংবা বিয়ে-টিয়ের মতো কোন পারিবারিক উৎসবে পাশাপাশি বসে খেতে, গল্প-গুজব বা ঠাট্টা-তামাসা করতে তাঁদের আটকায় না।

সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে মিশিরলালজী যে 'ক্লাসে' পড়েন, রঘুনাথ সিংও হুবহু সেই ক্লাসেরই একজন জবরদস্ত প্রতিনিধি। দু'জনেই স্বাধীন ভারতের এক প্রান্তে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমকে বিপুল দাপটে কায়েম করে রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রক্তের সম্পর্কের চাইতেও 'ক্লাসে'র এই সম্পর্ক অনেক বেশি গাঢ় এবং গভীর।

একই শ্রেণী বা 'ক্লাসে'র মানুষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাই স্বাভাবিক কিন্তু অন্য অসুবিধাও আছে। একজনের প্রতিপত্তি বা বাড়বাড়ন্ত অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে অনেক সময়। রঘুনাথ সিং বা মিশিরলালজী পরস্পরকে হয়ত ঈর্ষা করেন কিন্তু তা খুবই সূক্ষ্ম এবং ভেতরকার ব্যাপার। বাইরে তার প্রকাশ নেই। উল্টে বাইরের দিকে অতীব ভদ্রতা এবং বিনয়ের একটা চকচকে চোখ-ধাঁধানো পালিশ রয়েছে।

কাল রাতেই সাবেক আমলের ঢাউস ঢাউস চাকাওলা এবং হুডখোলা প্রকাণ্ড ফোর্ড গাড়িটাকে দু গণ্ডা নৌকর ধুয়েমুছে তকতকে

করে রেখেছিল। আজ ভোরেও মুনশী আজীবচাঁদের তদাবকিতে নতুন করে আরেক দফা মোছা-টোছা চলছে। গলাব শিরায় দড়ি পাকিয়ে সে সমানে চেঁচিয়ে যায়, 'এ বুদ্ধ, এ লাঙ্গুর হিঁয়া কাপড়া মার (কাপড় দিয়ে মোছ), এই টায়রিয়া (টায়ার) সাফা কর—' তারপরেই গদগদ ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'মেরে সরকার এম্লে বনে ! হোয় হোয়—'

খানিক দূরে চৌকো চৌকো শ্বেত পাথর বসানো বারান্দায় পুরু গদিওলা ইজিচেয়ারে আধশোয়ার মতো করে কাত হয়ে আছেন রঘুনাথ সিং। তাঁর পরনে দামী চুস্ত বা মলমলের কলিদার পাঞ্জাবী বা নাগরা টাগরা নেই। তার বদলে অত্যন্ত সস্তা পোশাক—খেলো হ্যাণ্ডলুমের সাদা পাঞ্জাবী, ঢোলা পাজামা, মোটা চামড়ার চপ্পল। গলায় না সোনার হার, আঙুলে না হীরে-বসানো আংটি। এখন হাজার লোকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তাঁকে আলাদা করে চেনা যাবে না; একেবারে জনগণের একজন হয়ে গেছেন তিনি।

রঘুনাথ সিংকে ঘিরে বারান্দা আলো করে বসে আছেন বড় ভকিল গিরিধরলালজী, বঙ্গালী ডাগদর শ্যামতুলাল সেন, হেড মাস্টারজী বদ্রীবিশাল চৌবে। অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের বন্ধু-বান্ধব বা তাঁর পা-চাটা কুত্তার দল। বড়ে সরকারের সঙ্গে তাঁরাও বিজুরিতে যাবেন। এঁদের বাদ দিয়ে এক পা-ও চলতে পারেন না রঘুনাথ।

বারান্দার আরেক ধারে রয়েছে টাটকা ভয়সা ঘিয়ের একটা টিন, বাদামের বরফি আর মুগের লাড্ডুর বিরাট ঝুড়ি, দুটো আমের টুকরি, লাল টকটকে মজঃফরপুরী লিচুর একটা ঝুড়ি আর চিতাবাঘের আস্ত ছাল এবং হাতীর ধবধবে দুটো দাঁত। রঘুনাথ সিংয়ের তরফ থেকে মিশিরলালজীকে এগুলো উপহার দেওয়া হবে। সূক্ষ্মভাবে এটাকে এক ধরনের ঘুষই বলা যায়।

রঘুনাথ সিং মিশিরলালজীর কাছে বিজুরি তালুকের ভোট পাওয়ার ব্যাপারে কীভাবে সাহায্য চাইবেন তাই নিয়ে ভকিল সাহেব ডাগদর সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করতে করতে ফোর্ড গাড়িটার দিকে নজর রেখে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি আজীবচাঁদকে তাড়া লাগালেন, 'অনেক সাফসুতরো হয়েছে। আর দেরি করা যাবে না। জষ্ঠি মাসের রোদ যেভাবে চড়ছে, এরপর বেরুলে বিজুরি থেকে ফিরে আসতে আসতে 'লু' ছুটতে শুরু করবে—'

আজীবচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'হো গিয়া বড়ে সরকার। আপ

'গাড়ি পর চড়িয়ে—'

দলবল নিয়ে বারান্দা থেকে নামতে নামতে রঘুনাথ সিং ফল মিষ্টির টুকরি ফুকরির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওগুলো ক্যারিয়ারে তুলে দাও—'

তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হল।

একটু পর পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি শব্দ করতে করতে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পেছন থেকে আজীবচাঁদ গুনগুনিয়ে বলতে থাকে, 'মেরে সরকার এম্লে বনেগা। রামরাজ আ যায়েগা রে, রামরাজ আ যায়েগা।'

ঘণ্টাখানেকের ভেতর বিজুরি তালুকে মিশিরলালজীর হাভেলিতে পৌঁছে গেলেন রঘুনাথ সিংরা।

প্রায় তিন একর জায়গা জুড়ে মিশিরলালজীর হাভেলি। বিরাট কমপাউণ্ড ঘিরে রয়েছে উঁচু মজবুত দেয়াল। ভেতরে ঢোকার জন্য লোহার বড় বড় চাকতি বসানো প্রকাণ্ড দরজা। সেখানে বন্দুক কাঁধে এক জোড়া সাড়ে ছ'ফুট মাপের দারোয়ান: তাদের গায়ে খাকী উর্দি; গলা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে আসা টোটার মালা; নাকের তলায় চৌগাফা।

এ অঞ্চলে জমির বড় বড় মালিকদের বাড়ি যেমন হয়, মিশির-লালজীর বাড়িটা প্রায় তেমনিই। ভেতরে ঢুকলে প্রথমে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তার একধারে অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় ঝকঝকে নতুন মডেলের খান পাঁচেক দিশী এবং ইমপোর্টেড গাড়ি। রঘুনাথ সিংয়ের মতো ওয়েলার ঘোড়া, টমটম বা হাতী মিশিরলালজীর নেই।

যেদিকে গাড়ির শেড তার উল্টো দিকেও একটা ছোট শেডের তলায় খানকতক বেঞ্চ পাতা রয়েছে। এ বাড়িতে যারা একবারও এসেছে তারাই জানে শেডের তলায় ঐ বেঞ্চগুলো মিশিরলালজীর দর্শন-মাঙনেওহা লোকেদের জন্য। সকালের দিকে বেলা এগারটা পর্যন্ত মিশিরলালজী লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। নিয়ম হল, নৌকর এসে একজন করে দর্শনার্থীকে মিশিরলালজীর কাছে নিয়ে যাবে। একজনের সঙ্গে কথা শেষ হলে আর একজনের পালা।

ঢাকা জায়গাটার পর মধ্যযুগের দুর্গের মতো তিন ফুট পুরু দেয়াল আর মোটা মোটা থামওলা বিশাল তেতলা বাড়ি। বাড়িটার মাথায় রামসীতার মন্দির। মন্দিরের চূড়াটা দু মাইল দূর থেকে নজরে পড়ে।

জোড়া দারোয়ান সসম্ভ্রমে স্যালুট ঠুকে রঘুনাথ সিংয়ের ফোর্ড গাড়ির জন্য রাস্তা করে দিল। রঘুনাথ সিংকে তারা চেনে।

ভেতরে বাঁ দিকের শেডের তলায় মিশিরলালজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক লোক বসে আছে। তা ছাড়া এধারে ওধারে রয়েছে নৌকরেরা।

এ বাড়ির দারোয়ানদের মতো নৌকরেরাও রঘুনাথ সিংকে চেনে। বেশ কয়েক বার পারিবারিক উৎসব বা অন্য কোন তৌহারের দিনে তিনি এখানে এসেছেন। ফোর্ড গাড়ি একধারে থামতেই গণ্ডাখানেক নৌকর দৌড়ে এল। ঘাড় নুইয়ে বলল, 'নমস্তে সরকার—' একজন আবার তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিল। এরা সবাই জানে তাদের মালিক মিশিরলালজীর মতোই বহোত বড়া আদমী এই রঘুনাথ সিং। রাজা মহারাজা য্যায়সা। শুধু দু জনের তালুকই যা আলাদা।

রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'মিশিরলালজী ঘরমে হ্যায়?'

'জী সরকার—'

রঘুনাথ সিং গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গীরাও নামতে যাচ্ছিলেন; তাঁদের বললেন, 'আপনারা একটু বসুন। আমি আগে গিয়ে দেখা করি।'

এ বাড়ির প্রতিটি ইট রঘুনাথ সিংয়ের চেনা। সকালবেলা কোথায় মিশিরলালজীর আম-দরবার বসে, কোথায় কীভাবে বসে তিনি দর্শন-মাঙোয়াদের সঙ্গে কথা বলেন—সবই জানা আছে। সুতরাং লম্বা লম্বা সিঁড়ি ভেঙে বিশাল বারান্দায় উঠে ডান দিকে খানিকটা যাবার পর একটা বিরাট ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রঘুনাথ সিং।

ভেতরে ছ ইঞ্চি পুরু কার্পেট পাতা। একেবারে বিলিতী কেতায় চারদিকে দামী দামী সোফা আর সেন্টার টেবল সাজানো। একটা প্রকাণ্ড সোফায় দু পা তুলে বসে আছেন মিশিরলালজী। পয়সাওলা বড়লোক মাত্রেরই কিছু পা-চাটা কুত্তা থাকে। তেমনি জনকয়েক মিশিরলালজীকে ঘিরে আছে।

একটা ব্যাপার বরাবরই লক্ষ্য করেছেন রঘুনাথ সিং, মিশির-লালজীর বাড়িটা বাইরে থেকে মধ্যযুগের দুর্গের মতো মনে হলেও ভেতরে একেবারে ঝকঝকে বিলাইতী চাল। বাড়িটা ভেঙে ওখানে

নতুন ধরনের বাংলো বানাবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে জাগে মিশির-লালজীর। বানান না, তার একমাত্র কারণ, এটা তাঁর ঠাকুরদার তৈরি হাভেলি। পুরনো সেন্টিমেন্টকে কিছুটা দাম তিনি এখনও দিয়ে থাকেন।

পৃথিবীর এই অংশে মধ্যযুগ যখন মোটামুটি কায়েম হয়ে আছে তখন মিশিরলালজী পুরনো চাল পুরনো কেতার সঙ্গে হাল আমলকে অনেকখানি মিশিয়েছেন। হাতি ঘোড়া আর সাবেক মডেলের গাড়ি-টাড়ি বিদায় দিয়ে তিনি নতুন মডেলের ঝকমকে 'কার' আনিয়েছেন। হাল-বয়েল দিয়ে মান্ধাতার বাপের আমলের চাষবাসের বদলে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চষার বন্দোবস্ত করেছেন। এ অঞ্চলে, এ অঞ্চল কেন, বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মিশিরলালজী ছাড়া আর কারো জমিতে 'মিসিনে'র লাঙল নামে নি। তা ছাড়া বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াতে পাঠিয়েছেন কলকাতায় আর লণ্ডনে। তিনি নিজে সাবেকী চালে ধুতি-কুর্তা বা পাঞ্জাবী পরলেও ছেলেমেয়েদের পোশাক খাস বিলাইতী ধাঁচের। মিশিরলালজীর ধ্যানধারণা বা জীবনযাত্রায় 'পুরাপাক্কা' না হলেও বারো আনা সাহেবী কেতা।

রঘুনাথ সিং যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে কোণাকুণি তাকালে মিশিরলালজীকে দেখা যায়। তবে মিশিরলালজী এখনও তাঁকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি ভেতরে ঢুকতে যাবেন, একটা নৌকর অন্য দরজা দিয়ে আরেকটা লোককে নিয়ে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই লোকটা মিশিরলালজীর পায়ের দিকে হাত বাড়ায়।

লোকটা পায়ে হাত দেবে বলে মিশিরলালজী যেন কতই বিব্রত হয়েছেন এমন ভঙ্গি করে দু-হাত নাড়তে নাড়তে বলেন, 'আরে নেহী নেহী—' বলেন ঠিকই, কিন্তু লোকটার কপালের কাছ জোড়া পা বাড়িয়ে দেন।

রঘুনাথ সিং জানেন, শুধু তিনিই বা কেন, বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যে কয়েক লাখ মানুষ বাস করে তারা সবাই জানে মিশির-লালজীকে প্রণাম করতে গেলে মুখে 'না না' বলবেন কিন্তু পা দুটো ঠিক কপাল বরাবর এগিয়ে দেবেন। এ অঞ্চলে তাঁর নাম 'চরণ ছু মহারাজ'।

লোকটার 'চরণ' ছোঁয়া হয়ে যাবার পর মিশিরলালজী বললেন, 'বৈঠো—'

লোকটা কার্পেটের এক কোণে হাতজোড় করে জড়সড় হয়ে বসল।

মিশিরলালজী ফের বললেন, 'বাতাও ক্যা মাঙতা হ্যায়—' কিন্তু লোকটা উত্তর দেবার আগেই রঘুনাথ সিংকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন, 'আরে মেরা ক্যা সৌভাগ! সবেরে কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম। আসমানকা তারা মেরা দরোয়াজা পর খাড়া হ্যায়। আইয়ে আইয়ে রঘুনাথজী—' বলে নিজে উঠে এসে রঘুনাথ সিংয়ের হাত ধরে তাঁর পাশের সোফাটায় বসালেন। তারপর নিজের জায়গায় বসতে বসতে সেই লোকটাকে বলল, 'আজ যাও। পরশু এসো—'

লোকটা আরেক বার মিশিরলালজীর পা ছুঁয়ে চলে গেল।

সেই নৌকরটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মিশিরলালজী তাকে জানিয়ে দিলেন, আজ আর কারো সঙ্গে দেখা যাবে না। দর্শন-মাঙোয়াদের যেন চলে যেতে বলা হয়।

রঘুনাথ সিং মিশিরলালজীকে বললেন, 'কৃপা করে যদি হুকুম করেন—'

'হুকুমকা ক্যা বাত! কহিয়ে কহিয়ে—'

'আমার তিন বন্ধু এসেছেন, বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। কিছু জিনিসও এনেছি। নৌকর বন্ধুদের যদি ডেকে আনে আর জিনিসগুলো নিয়ে আসে—'

'ক্যা তাজ্জবকা বাত; বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এসেছেন!' বলেই নৌকরের দিকে তাকালেন মিশিরলালজী, 'যা, রঘুনাথজীর দোস্তদের ডেকে আন আর ফাগুয়াকে পাঠিয়ে দে।'

নৌকর দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

এবার রঘুনাথের দিকে পুরোপুরি ঘুরে মিশিরলালজী বললেন, 'ক্যা, দিনমে ম্যায় খোয়াব দেখ রহা হো? আপনি আসল রঘুনাথ সিংজী তো?'

রঘুনাথ সিং হাসলেন।

এদিকে মিশিরলালজীর পা-চাটা কুত্তারা ঘাড় ঝুঁকিয়ে এধার ওধার থেকে সমানে 'নমস্তে' বা 'পরণাম' জানাতে লাগল। তাদের মালিকের সমান স্তরের এই মানুষটার সঙ্গে খাতির রাখা ভালো। কখন মিশিরলালজী 'গুসসা' হয়ে যাবেন তখন দাঁড়াবার মতো আরেকটা আশ্রয় আগে থেকেই ঠিক করে রাখা উচিত। এ জাতীয় পরগাছাদের

নিয়মই এই।

মিশিরলালজী ফের বললেন, 'আপনি এসেছেন ; ভারি খুশ হয়েছি রঘুনাথজী।'

রঘুনাথ সিং বললেন, 'আগে খবর না দিয়ে আচানক (হঠাৎ) চলে এসে খুব অসুবিধা ঘটালাম। কিন্তু না এসে উপায় ছিল না। একটা জরুরী কাজের—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মিশিরলালজী বললেন, 'কাজের কথা পরে হবে। আগেই একটা আর্জি পেশ করছি। দয়া করে যখন এসেছেন, দুপুরে এখানে 'ভোজন' করে যেতে হবে।'

হাত জোড় করে রঘুনাথ সিং বলেন, আজ তাঁকে ক্ষমা করে দিতে হবে। পরে আরেক দিন এসে নিশ্চয়ই খেয়ে যাবেন।

এ ব্যাপারে আর জোর করলেন না মিশিরলালজী।

এই সময় গাট্টাগোট্টা চেহারার ফাগুয়া নৌকর এসে ঘরে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন গিরধরলালরা অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা তিন কুত্তা। অন্য দুটো নৌকর ঘাড়ে এবং মাথায় করে সেই লাড্ডু-বরফির ঝোড়া টোড়াও নিয়ে এসেছে।

উপহারের জিনিসগুলো দেখে একটু অবাক হয়েই মিশিরলালজী জিজ্ঞেস করেন, 'এসব কী?'

রঘুনাথ সিং জানান, খুব সামান্য ব্যাপার। মহারাজের দর্শন করতে এলে কিছু নজরানা আনা নিয়ম।

অত্যন্ত বিব্রত যে হয়ে পড়েছেন, মিশিরলালজীর মুখচোখের ভাবে তা প্রকাশ পায়। তবে 'মহারাজ' বলায় মনে মনে তিনি বেজায় খুশী। বলেন, 'ইসকা ক্যা জরুরত থা রঘুনাথজী—'

'বললাম তো, তুচ্ছ ক'টা জিনিস। স্রেফ আপনার সম্মানের জন্যে আনা—' বলেই হাত নেড়ে নৌকর দুটোকে ফল-মিঠাইর টুকরিগুলো বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে বলেন রঘুনাথ সিং।

হাল ছেড়ে দেবার মতো ভাব করেন মিশিরলালজী। বলেন, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

এদিকে গিরিধরলালেরা মাথা ঝুঁকিয়ে মিশিরলালজীকে 'নমস্তে' বা 'পরণাম' (প্রণাম) জানাতে থাকেন। মিশিরলালজীর পোষা কুকুরেরা এইভাবেই রঘুনাথ সিংকে 'নমস্তে' জানিয়েছিল। মালিকের সমগোত্রীয় লোকেদের তোয়াজ এবং তোষামোদ করাটা

চাটুকারদের পবিত্র কর্তব্য। তুনিয়ার পা-চাটা সব কুত্তারই এক আদত।

মিশিরলালজী ঈষৎ হেসে এবং তু-একটা কথা বলে গিরিধরলালদের চোদ্দ পুরুষকে কৃতার্থ করে ফাগুয়া নৌকরের দিকে তাকান। বলেন, 'মাঈজীকে খবর দে, গারুদিয়া থেকে রঘুনাথ সিংজী এসেছেন—' মাঈজী অর্থাৎ মিশিরলালজীর স্ত্রীকে এই খবর দেওয়ার মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তা হল অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।

'জী —' ফাগুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এবার রঘুনাথ সিং নতুন করে আসল কথাটা তুলতে চান। যে কারণে জষ্ঠি মাসের গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে ঝলসানো মাঠের মাঝখান দিয়ে এতদূর ছুটে এসেছেন এবং তাঁরই মাপের একটা লোককে বাড়তি পাঁচশো গুণ মর্যাদা চড়িয়ে 'মহারাজা' পর্যন্ত বলেছেন, এমন কি উপহারের নাম করে অত্যন্ত চতুরভাবে ভেট বা ঘুষ দিয়েছেন সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি আর উত্তেজনা হচ্ছে। রঘুনাথ বললেন, 'একটা জরুরী দরকারে আপনার কাছে—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেন মিশিরলালজী, 'জীওনভর দরকার তো আছেই। আগে বাড়ির খবর বলুন। আমার বহেনজীরা কেমন আছেন?' রঘুনাথ সিংয়ের কায়াথ এবং রাজপুত তুই স্ত্রীকে তিনি 'বহেনজী' বলেন।

রঘুনাথ বললেন, 'ঠিক আছে।'

'তুই বহেনজীর বনিবনা হল?'

কায়াথনী এবং রাজপুতানীর ঝগড়া এ অঞ্চলের এক বিখ্যাত ঘটনা। প্রায় কিংবদন্তীর মতো ব্যাপার। গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের প্রতিটি মানুষ এ ব্যাপারটা জানে। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'মৌত পর্যন্ত বনিবনা হবে না। বলা যায় না, মরার পরও হয়ত শাঁখরেল হয়ে তু'জনে লড়াই করবে। তবে এ নিয়ে আমি ভাবি না।'

'ছেলেমেয়েরা?'

'ভালই আছে।'

রঘুনাথ সিংও মিশিরলালজীর বাড়ির খুঁটিনাটি খবর নেন। এই সব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মধ্যে ফাগুয়া নৌকর ঢাউস ঢাউস

রুপোর থালায় বিরাট আকারের গণ্ডা গণ্ডা মিঠাই আর গরমকালের যাবতীয় দামী ফল এনে সবার সামনে সাজিয়ে দেয়। চাঁদির কারুকার্য-করা গেলাসে ঠাণ্ডাইও নিয়ে আসে সে। পেস্তা বাদাম দই বরফ দিয়ে তৈরি আর খুসবু মেশানো উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই। এই জষ্ঠি মাসে স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক শীতল রাখার পক্ষে এর চাইতে ভাল জিনিস আর হয় না।

খাবারের পরিমাণ দেখে ভীতভাবে রঘুনাথ সিং বলেন, 'আরে বাবা, এ যে আমার দশদিনের 'র‍্যাশন'। এত খাওয়া যায় নাকি?'

এ ঘর থেকে অন্দরের দিকে যাবার জন্য একটা দরজা আছে। সেখানে পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওধার থেকে মহিলার মৃদু সুরেলা গলা ভেসে আসে, 'না বললে শুনছি না। এমন কিছুই দেওয়া হয় নি।'

মিশিরলালজীর স্ত্রী পদ্‌মাবতী। এমনিতে বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোন না; তবে পর্দানশীন নন। খুবই কম কথা বলেন; তাঁর মধ্যে অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেশানো আছে স্নেহপ্রবণতা। মিশিরলালজীর বিশাল সংসার এবং অগুনতি আশ্রিত আত্মীয়-স্বজনকে অত্যন্ত সুচারুভাবে তিনি সামলান। এ বাড়িতে এলে তাঁর যত্ন এবং মমতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

রঘুনাথ সিং সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি মিশিরলালজী বাদে ঘরের বাকী সবাইও। রঘুনাথ হাতজোড় করে বললেন, 'নমস্তে ভাবীজী। আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?'

পদ্‌মাবতী বললেন, 'নমস্তে। আপনি এসেছেন; আমি আসব না! কষ্ট কিসের?'

'হুকুম করলে নৌকরই আপনার কাছে হাজির হত।'

'ছি ছি কী বলছেন আপনি! বিনয়ের আর শেষ নেই। এখন ভালো ছেলের মতো বসে বসে সব খেয়ে নিন। আমি দাঁড়াচ্ছি।'

আরা জেলার রাজা খেতাবওলা বাপের মেয়ে পদ্‌মাবতী। তাঁর আচার ব্যবহার রাহান সাহানই আলাদা। মহিলাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন রঘুনাথ সিং। বলেন, 'এত খেতে হলে বিলকুল মরে যাব ভাবীজী।' মুখচোখের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে তাঁর।

পদ্‌মাবতীর হয়ত করুণা হয়। বলেন, 'ঠিক আছে, যা পারেন খান।'

অগত্যা রুপোর থালার দিকে রঘুনাথ সিং এবং ঘরের বাকী লোকজনেরা হাত বাড়ায়। খেতে খেতে এলোমেলো টুকরা টাকরা কথা হয়। এরই ফাঁকে মিশিরলালজীর মতো পদ্মাবতীও জানান, দুপুরে রঘুনাথ সিংরা এখানে ভোজন করে গেলে তাঁর আনন্দের কারণ হত। ক্ষমা চেয়ে আগের মতোই রঘুনাথ সিং উত্তর দ্যান, আরেক দিন এসে অবশ্যই খেয়ে যাবেন।

পদ্মাবতী বলেন, 'তা হলে দিন ঠিক করে আমাদের জানিয়ে দেবেন। আর বহেনজীরাও সেদিন এখানে যেন দয়া করে আসেন। মঞ্জুর?'

'মঞ্জুর।'

খাওয়া দাওয়ার পর নৌকররা এসে থালা-গেলাস তুলে নিয়ে যায়। পর্দার আড়াল থেকে পদ্মাবতীও সরে যান।

এবার রঘুনাথ সিং মুখ খোলার আগেই মিশিরলালজী শুরু করেন, 'আপনি কী জরুরী কাজে এসেছেন, আমি বোধহয় জানি। বলছি, দেখুন তো মেলে কিনা—'

খানিকটা অবাক হয়েই মিশিরলালজীর দিকে ঘুরে বসেন রঘুনাথ সিং।

মিশিরলালজী বলতে থাকেন, 'চুনাওতে নামছেন, এম-এল-এ হয়ে পাটনার অ্যাসেম্বলিতে যাবেন—এই জরুরী ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন তো?'

রঘুনাথ সিংয়ের বিস্ময় এক লাফে অনেকখানি বেড়ে যায়। তিনি বলেন, 'আপনি জানলেন কী করে?'

'আরে ভেইয়াজী, আপনাদের গারুদিয়া আর আমাদের বিজুরি তালুকের গাঁওকে গাঁও জেনে গেল। শুধু আমি জানব না? পাটনায় চুনাওর বাত পাক্কা করে ফিরে এসে গারুদিয়ার হর আদমীকে মিঠাই খাইয়েছেন, এ খবরও আমার জানা।'

'তবে তো আপনি সবই জানেন।'

'লেকিন ভেইয়াজী—'

'কী?'

'আপনি পোলটিক্সে (পলিটিক্স) গেলেন কেন? পোলটিক্স বহোত গান্ধা চীজ। উসমে বহোত বহোত বদবু—' খুব বেশি

লেখাপড়া শেখেন নি মিশিরলালজী। তবে দেখেছেন অনেক, জেনেছেন তার চাইতেও বেশি। তার কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা আংরেজি বুলি ঢুকে যায়।

একটু থেমে মিশিরলালজী ফের বলেন, 'আমরা যারা জমিজমার মালিক তাদের আঁখ জমিতে রাখাই ভালো ; অন্য দিকে আঁখ ফেরালে জমিও যায়, অন্য ব্যাপারটাও যায়। অবশ্য আমার কথা শোনা বা না-শোনা আপনার মর্জি।'

অত্যন্ত বিনীতভাবে রঘুনাথ সিং এবার বলেন, 'আপনি যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলি—'

'হাঁ হাঁ জরুর। একটা কেন, বিশটা বলুন না।'

'জমি-জায়গীরের মালিকদের স্বার্থেই আমাদের কাউকে না কাউকে পোলটিক্সে ঢুকতে হবে। জনতাকে প্রতিনিধি হয়ে অ্যাসেম্বলিতে যেতে হবে। না হলে এত জমিজমা কিছুই রাখতে পারবেন না।'

ভুরু কুঁচকে যায় মিশিরলালজীর। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কী রকম? থোড়েসে সমঝা দিজিয়ে—'

রঘুনাথ সিং বুঝিয়ে যা বলেন তা মোটামুটি এই রকম। ল্যাণ্ড রিফর্মের কানুন দিনকে দিন যেরকম কড়া হচ্ছে তাতে পুরনো ফিউডাল সিস্টেম আর খরিদী কিষাণদের বেট বেগারি চিরকাল চালিয়ে যাওয়া যাবে না। এখনও যে তারা চালাচ্ছেন তা বে-কানুনি। বড় বড় শহরের খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালিখিও হচ্ছে। নানা 'পোলটিক্যাল' দলের নজরও এসে পড়েছে এদিকে। এই সব রাজনীতিক দলের কাজই হল একটা কিছু হুজ্জুত বাধিয়ে বাজার গরম করা। এখন না হলেও ভবিষ্যতে এ নিয়ে ঝামেলা হবেই।

ফী বছরই লোকসভায় বা বিধানসভায় একবার করে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে কানুন পাশ হয়ে যায়, তাতে জমির মালিকদের ক্ষমতা কমতে থাকে। এভাবে কিছুকাল চলতে থাকলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দশ ইঞ্চি মাটিও কেউ রাখতে পারবে না। এই বিপজ্জনক ভূমিসংস্কার যেভাবেই হোক রুখতে হবে। সেই কারণে যারা কানুন বানায় তাদের মধ্যে নিজেদের লোক ঢোকানো প্রয়োজন। রঘুনাথ সিং জমিজমার মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে আপাতত বিধানমণ্ডলে যেতে চাইছেন।

শুনতে শুনতে বিশাল সোফার ভেতর নড়েচড়ে বসেন মিশির-

লালজী। বলেন, 'আপনি খুব ভালো ভেবেছেন। আমি এসব চিন্তা করি নি। হামে আপনা ইণ্টারেস্ট জরুর দেখনা ছায়। হাম আপনে লীডরোসে সোসালিজম পর লম্বী চওড়ী বাত শুনতা আয়ে ছায়। ও চীজ আনেসে হাম বিলকুল চৌপট হো যায়েঙ্গে।'

রঘুনাথ সিং এবং মিশিরলালজীর পা-চাটা কুত্তারা সমস্বরে বলে, 'জরুর, জরুর ' এরা সব হাঁ'তে হাঁ মিলানোর দল। মালিক প্রভুরা মুখ দিয়ে যা বার করবেন এরা তাতেই সায় দেবে।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'এই জন্যেই তো সবেরা হতে না হতেই আপনার কাছে দৌড়ে এলাম। চুনাওর ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

মিশিরলালজী জিজ্ঞেস করেন, 'কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন—'

রঘুনাথ জানান, দিল্লীর লোকসভা বা পাটনার বিধানসভায় যেতে হলে জনগণের ভোট পেয়ে পাশ করতেই হবে। এবারের চুনাওতে তিনি যে নির্বাচনকেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছেন তার শতকরা পঞ্চাশজন ভোটদাতাই বিজুরি তালুকের। মিশিরলালজী দয়া করে যদি একবার আঙুল তোলেন, এই ভোটদাতাদের মতদান পুরোটাই রঘুনাথ সিংয়ের স্বপক্ষে যেতে পারে। একবার বিধানসভায় যেতে পারলে ক্লাস ইণ্টারেস্ট দেখার জন্য তিনি সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এখন সবটাই মিশিরলালজীর অনুগ্রহ।

মিশিরলালজী বলেন, 'এ তো আপনা ইণ্টারেস্ট আপনা জাত-ওয়ারিকা সওয়াল (এখানে স্বজাত অর্থাৎ নিজের ক্লাসের প্রশ্ন)। আপনাকে বিধানসভায় পাঠাতে যা করার দরকার সব করব।'

হাত বাড়িয়ে মিশিরলালজীর দু হাত জড়িয়ে ধরেন রঘুনাথ সিং। বলেন, 'কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না। আমি আপনার খরিদী নৌকর হয়ে রইলাম।'

এ সবই যে উৎকৃষ্ট চাটুকারিতা, বুঝতে অসুবিধা হয় না মিশিরলালজীর। তবে মন্দ লাগে না। মনেপ্রাণে তিনি স্বীকার করেন, রঘুনাথ সিং তাঁর আঁখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। দূরদর্শী হলেও ভূমি সংস্কারের দিকে এতকাল তাঁর নজর পড়ে নি। অথচ পড়া উচিত ছিল। ভূমি সংস্কারের বিপজ্জনক দিকটা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, 'আপনি কেন ধন্যবাদ দেবেন, আমারই ওটা দেওয়া উচিত। ভূমি সম্স্কারের কথাটা আপনি মনে

করিয়ে না দিলে ওটা আমি ভাবতামই না।'

'তা হলে বিজুরির ভোট নিয়ে আমি কিন্তু কিছু ভাবছি না।'

'বিলকুল না। সব তো ঐরু-গৈরু-নাথু আর গৈরুর (রামা-শ্যামা-যদু-মধু) দল। যাকে যা বলব বকরার পালের মতো লাইন দিয়ে তাই করে আসবে। একেবারে দুশ্চিন্তা করবেন না।'

এরপর সামান্য দু-একটা কথা বলে বিদায় নেন রঘুনাথ সিং এবং তাঁর তিন পা-চাটা কুকুর।

আরো খানিকক্ষণ বাদে বিজুরি তালুক পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে গারুদিয়া তালুকের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে রঘুনাথ সিংয়ের চোখে পড়ে, জষ্ঠি মাসের রোদে ঝলসে যেতে যেতে তাঁর জমিগুলোতে লাঙল ঠেলে চলেছে ধর্মারা। এইসব আনপড় অচ্ছুৎ খরিদী মানুষগুলো জানে না আগামী চুনাওতে তাদের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ কীভাবে নির্ধারিত হতে চলেছে।

বারো

টিরকে সেদিন একজোড়া কোট্‌রার বাচ্চা (এক ধরনের হরিণ, ছাগলের মতো দেখতে, ইংরেজিতে বলে **barking deer**) যোগাড় করে দেবার কথা বলে গিয়েছিল। ধর্মা ভেবেছিল পরের দিনই ক্ষেতির কাজে ডুব মেরে জঙ্গলে যাবে। কিন্তু যাওয়া হয় নি। অবশ্য টিরকের কাছ থেকে দিন তিনেক সময় নেওয়া আছে।

দু'দিন পর সে দেখল, এখন জঙ্গলে না গেলেই নয়। হাতে আর একটা দিন মোটে রয়েছে। এক দিনে কোট্‌রার ছানা জোটানো যাবে কিনা সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ধর্মা, তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। সে ঠিক করল, পরের দিন ভোর হলেই মাঠকুড়ানি, জঙ্গলকুড়ানিদের সঙ্গে সে দক্ষিণ কোয়েলের শুখা খাতের দিকে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু শেষ দিনেও যাওয়া হল না। তার কারণ, আগের দিন ক্ষেতির কাজের পর খামারবাড়িতে হাল-বয়েল জমা দিতে এসে সে শুনল, পরের দিন তাকে রামলছমনের সঙ্গে চার মাইল তফাতে চাহাড়ের হাটে যেতে হবে। ফী বছর চাষ-আবাদের মরসুমে

আদিবাসী ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল আর চেরোরা ওখানে কাজের আশায় এসে বসে থাকে। জমিজমার মালিকরা দরকারমতো তাদের ভেতর থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে যায়। পুরো চাষের সময়টা পেটভাতায় তারা জমিতে খাটবে। যাবার সময় মাথাপিছু মজুরি বাবদ কিছু পয়সা আর কিলোকয়েক করে মকাই বা জনার বা গুমো আতপ দেওয়া হবে তাদের। আবার ওরা আসবে সেই ফসল কাটার মরসুমে। দ্বিতীয় দফায় এসে ফসল খামারবাড়িতে তুলে রবিশস্যের কাজ চুকিয়ে ফিরে যাবে। বছরের পর বছর আবহমান কাল এই নিয়মেই চলছে।

চাহাড়ের হাটে রামলছমনের সঙ্গে ধর্মাকে যে যেতে হবে, তার কারণটা হল এই। রামলছমন মুণ্ডা আর ওরাওঁ টোরাওঁদের ভেতর থেকে ক্ষেতমজুর বেছে দিয়ে সাইকেলে চলে আসবে। আর ধর্মা তাদের সঙ্গে করে রাস্তা দেখিয়ে আনবে। ভূমিদাসদের মধ্য থেকে একেক বছর একেক জনকে রামলছমনের সঙ্গে পাঠানো হয় আদিবাসী মজুর আনতে। এবার ধর্মার পালা।

তুরপুন চালানোর মতো সরু গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হিমগিরি-নন্দন বলেছে, 'কাল সবেরা হবার আগে আন্ধেরা থাকতে থাকতে 'পাক্কী'তে (হাইওয়ে) বাস ইস্টাণ্ডে গিয়ে বড়া পীপর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকবি। রামলছমন ওখানে গিয়ে তোকে সাথে করে নিয়ে যাবে। কানমেঁ ঘুষল্? বলেই ভয়সা দুধের বোতল বার করে গলায় ঢেলে দিয়েছে। খাওয়া হলে ধুতির খুঁটে ঠোঁট মুছে একটা পান মুখে পুরে চিবোতে শুরু করে দিয়েছে।

চাহাড়ে যাওয়া মানেই জঙ্গলে যাওয়া হবে না। জঙ্গল থেকে কোটরার বাচ্চা ধরে আনতে পারলে টিরকের কাছ থেকে বিশটা টাকা পাওয়ার আশা পুরোপুরি চৌপট। কিন্তু হিমগিরির মুখের ওপর 'না' বলে দেবার হিম্মত ধর্মার মতো ভূমিদাসদের সিনায় থাকে না। ঘাড় নুইয়ে সে বলেছে, 'হাঁ হুজৌর—'

হিমগিরি এবার বলেছে, 'চাহাড় থেকে ফিরে আসার পর কাল আর ক্ষেতির কাম করতে হবে না তোকে। বাকী রোজ বিলকুল ছুট্টি—সমঝা?'

অর্থাৎ এতটা রাস্তা যাতায়াতের জন্য ধর্মাকে যে ধকল পোয়াতে হবে সেই বাবদে ছুটি না হয় দেওয়া হল কিন্তু তাতে বিশটা টাকা

ক্ষতির কতটা পূরণ হবে, সে পুরোপুরি বুঝতে পারে না। তবু মাথা নাড়িয়ে কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলেছে, 'হঁ দেওতা—'

'চাহাঢ়ের হাটে নাস্তা আর একবেলার খোরাকিও পেয়ে যাবি।'

ফী বছরই দেখা গেছে, চাহাঢ়ে যারা মুণ্ডা ওরাওঁ জাতীয় মরসুমী কিষাণ আনতে যায় তাদের ওখানকার দোকানে নাস্তা আর দুপুরের কালোয়া খাইয়ে দেওয়া হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই এই নাস্তা এবং কালোয়াটা ভালই দেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। রীতিমতো একটা ভাতকা ভোজই বলা চলে। শিকার অর্থাৎ মাংস, ডাল, ভাজি, আচার, হরা মিরচি, পেঁয়াজ দিয়ে এরকম উৎকৃষ্ট 'ভোজন' জীবনে ক'দিন করেছে, অচ্ছুৎ ভূমিদাসরা গুনে বলে দিতে পারে।

কালোয়ার লোভও ধর্মাকে তেমন চাঙ্গা করে তুলতে পারে না। বিশ রুপাইয়া যে বহোত বড় ব্যাপার। তবু মুখে চোখে হাসি ফুটিয়ে তাকে বলতে হয়েছে, 'হঁ হুজৌর—'

পরের দিন ভোর হতে না হতেই এক পেট মাড়ভাত্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। আজ ক্ষেতে গিয়ে কুশীকে গণেরি বা অন্য কারো পেছন পেছন দৌড়ে কোদো বাছাতে হবে বা বড় বড় শক্ত মাটির ডেলা পিটিয়ে গুঁড়ো করতে হবে।

হাইওয়ের বাসস্ট্যাণ্ডে প্রকাণ্ড পীপর গাছের তলায় ধর্মা যখন এসে পৌঁছয় তখনও আকাশে অগুনতি তারা ফুটে আছে। এখানে গোটা তিনেক যে দোকান রয়েছে তার মধ্যে চায়ের দোকানটা ছাড়া আর কোনটাই খোলে নি। 'পাক্কী'তে এখন গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় নেই। ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকারে ক্বচিৎ এক-আধটা দূর পাল্লার বাস চোখে পড়ে।

এখনও রাত ঝিম ঝিম করছে। পীপর গাছের মাথায় বাদুড়েরা ডানা ঝাপটায়। কামার পাখিরা (এক ধরনের পেঁচা) থেকে থেকে অদ্ভুত আওয়াজ করে ডাকতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ছে রাস্তায়, ঝোপেঝাড়ে এবং ওধারের আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রে। আর আছে লাখ বেলাখ মশা। ধর্মার চামড়ায় অনবরত সুই (ছুঁচ) ফোটাতে থাকে তারা।

যতক্ষণ না রামলছমন আসছে, এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেতে হবে ধর্মাকে। অবশ্য ওপাশের চায়ের দোকানের সামনে

চেরা বাঁশের বেঞ্চিটা এখন বিলকুল ফাঁকা; খদ্দের-টদ্দের একজনও নেই। সকালে রোদ উঠলে চারদিক যখন আলো হয়ে যাবে সেই সময় এই চায়কা দুকান গাহেকে ভরে উঠবে। তখন থেকে অনেক রাত পর্যন্ত ওখানে ভনভনে মাছির মতো ভিড়।

বাঁশের ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসলে কারো কোন ক্ষতি হবার কারণ নেই কিন্তু ধর্মার পক্ষে ওখানে বসা সম্ভব না। কেননা সে জল-অচল অচ্ছুৎ ভূমিদাস আর দোকানটা হল উচ্চবর্ণ এক কায়াথের। সে ওখানে বসলে মেরে হাড় ঢিলে করে দেবে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় পাটনার দিক থেকে দূর পাল্লার একটা বাস এসে পীপর গাছের তলায় দাঁড়িয়েই আবার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়।

বাস থেকে একটা লোকই নেমেছে। প্রথমটা অন্ধকারে খেয়াল করে নি ধর্মা। কখন রামলছমন আসবে সেই জন্য সে প্রায় দম আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় বলে, 'কৌন—ধম্মা?'

ধর্মা চমকে তার দিকে তাকায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে না। শেষ রাতে পাটনার দিক থেকে আসা বাসটা থেকে কেউ নেমে তার নাম ধরে ডাকবে, একটু আগেও ভাবতে পারে নি ধর্মা। তার ধ্যান-জ্ঞান জুড়ে এখন রামলছমন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তাই চমকটা থিতিয়ে যেতে খানিক সময় লাগে।

অবাক চোখে তবু তাকিয়েই থাকে ধর্মা। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'আপ—আপ—'

লোকটা আরো কাছে এসে ধর্মার কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'নায় পয়চানা হামনিকো? আমাকে চিনতে পারছিস না নালায়েক?'

'নায়—' আস্তে মাথা নাড়ে ধর্মা।

'হামনি গণা—'

বিস্ময়টা আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায় ধর্মার। এই কি বুড়ি সৌখীর বেটোয়া (ছেলে) তার আজন্মের চেনা গণেশ বা গণা? এর পরনে এখন বিলাইতী ফুর পানট (ফুল প্যান্ট), বিলাইতী কুর্তা, পায়ে জুতিয়া, হাতে ঘড়ি, গলায় রঙ বেরঙের রেশমী রুমাল বাঁধা, মাথার চুল কাকাই দিয়ে বাহার করে আঁচড়ানো। এক হাতে

চামড়ার দামী বাকস্ (স্যুটকেশ)। দেখেও বিশ্বাস হয় না দামী পোশাক-পরা শহুরে এই চমকদার ছোকরাটাই গণা! পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত বদলে গেছে সে। অথচ বছরখানেক আগেও এই গণা তাদের সঙ্গে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে মাটি চষত, ফসল রুইত, ধান-গেঁহু-তিল-তিসি পাকলে কাটতে যেত। সারা দিন মাঠে মাঠে ঘুরে তার রুখা কর্কশ চামড়া থেকে খই উড়তে থাকত, খরায় পুড়ে বারিষে ভিজে শীতে কুঁকড়ে হাত-পা ফেটে যেত, সারা শরীরে ছিল ভুখ আর কষ্টের ছাপ।

এক বছর আগে যেদিন গণা দোসাদটোলা থেকে ভেগে যায় সেদিন থেকেই মনে মনে একই সঙ্গে তাকে শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষা করে আসছে ধর্মা। অচ্ছুৎ ভূমিদাসের ঘৃণ্য জীবন থেকে নিজের হাতে মুক্তি জুটিয়ে নেবার জন্য শ্রদ্ধা, আর ধর্মা নিজে তা না পেরে পরাধীন ক্রীতদাসের মতো দিন কাটাচ্ছে বলে ঈর্ষা।

এই মুহূর্তে অন্ধকারে স্বাধীন মানুষটাকে বড় মহিমান্বিত মনে হয় ধর্মার। কোন দিন যে গণা তার সঙ্গে মাঠে নেমে হাল-বয়েল চালাত, রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়িতে ফসল কেটে নিয়ে যেত—সে সব যেন কোন মিথ্যে স্বপ্নের মতো। নিজের মাথাটা আপনা থেকেই যেন গণার পায়ের দিকে নুয়ে পড়তে থাকে ধর্মার। আস্তে করে সে বলে, 'আপ কিধরসে (কোত্থেকে)—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে গণা বলে, 'আপ আপ করছিস কেন? 'তু করে বল।'

যদিও গণা ছিল তার আজন্মের সঙ্গী, সমবয়সী, ক'দিন আগেও একই সঙ্গে দোসাদটোলায় ক্রীতদাসের জীবন কাটিয়েছে তবু তাকে 'তুই' বলতে সাহস হয় না। অনেক জোরাজুরির পর শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজী হতে হয়। সে জিজ্ঞেস করে, 'এত্তা রোজ তুই কোথায় ছিলি গণা? তুই চলে যাবার পর মহল্লার সবাই আমরা কত ভেবেছি।'

গণা তামাসা করে বলে, 'জরুর ভেবেছিলি আমি মরে ফৌত হয়ে গেছি।'

'আরে নায় নায়—'

গণা ফের বলে, 'এখান থেকে পয়লা রাঁচী ভেগেছিলাম। উহাসে পটনা, পটনাসে ফরবিসগঞ্জ। ঘুমতে ঘুমতে (ঘুরতে ঘুরতে)

ধানবাদ চলে গেলাম। এখন ওখানেই থাকি।'

ধর্মা জিজ্ঞেস করে, 'কী করিস ওখানে ?'

'ফেক্টরিমে কাম করতা। তিন শ রুপাইয়া তলব।'

একসঙ্গে তিন শ টাকা ধর্মার চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও চোখে দ্যাখে নি এবং এ নিয়ে তার পরিষ্কার কোন ধারণাও নেই। সে বলে, বহোত রুপাইয়া—নায় ?'

গণা গম্ভীর চালে হাসে ; কিছু বলে না।

ধর্মা ফের শুধোয়, 'ফেক্টরি কা চীজ ?'

'কারখান্না। 'মিসিনে' (মেসিনে) বহোত কুছ ওখানে বানানো হয়।'

ধর্মা কতটুকু বোঝে সে-ই জানে। জিজ্ঞেস করে, 'এখন তুই কোত্থেকে এলি ?'

গণা জানায়, 'ধানবাদসে। চায় খাবি ? চল্ ঐ দুকানটায় যাই—'

চা খুবই পছন্দ করে ধর্মা কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ে যায় উচ্চবর্ণের কায়াথ দোকানদার জেনেশুনে তাদের মতো অচ্ছুৎদের গেলাসে চা দেবে না। তার উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। গণাকে নিজের মনোভাব জানিয়ে দেয় সে।

গণা বলে, 'ঘাবড়াস না, আমার কাছে পিলাস্টিকের গিলাস আছে।' চামড়ার বাক্স খুলে চটপট দুটো রঙিন গেলাস বার করে দোকান থেকে চা কিনে ফের পীপর গাছের তলায় ফিরে আসে সে।

চা খেতে খেতে গণা বলে, 'এত্তে রোজ বাদ কেন এলাম জানিস ?'

'কায় ?' তরিবত করে চা খেতে খেতে ধর্মা মুখ তোলে।

'মাকে এবার নিয়ে যাব। কোম্পানিকা কোয়াটার মিলা। এত মাইনে পাই আর আমার মা ভিখমাঙনী হয়ে ঘুরে বেড়াবে তা হয় না।'

হঠাৎ ধর্মার মনে পড়ে, বুড়ী সৌখীর মুখে এই কথাটাই ক'দিন আগে সে শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা ব্যাপার ভেবে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ধর্মা বলে, 'তুই যে আসবি নওরঙ্গী টের পেয়ে গেছে। অন্ধেরা থাকতে থাকতে মহল্লায় গিয়ে তোর মাকে নিয়ে ভেগে যা। বহোত হোঁশিয়ারিসে যাবি।' বহুদিন পর গণাকে দেখে, তার চালচলন এবং পোশাক-টোশাকের বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করে তার এত চমক

লেগেছিল যে নওরঙ্গীর কথাটা আগে মনে পড়ে নি। তা ছাড়া এখনই রামলছমন এসে পড়বে।

'নওরঙ্গী কৌন ?'

'ওহী ছমকী রাণ্ডী আওরত—ভুলা গৈল ?'

'আগে বড়ে সরকারের রাখনী ছিল ? উসি বাদ হিমগিরিকা ?'

'হাঁ। জরুর ও রাণ্ডী তোর কথা হিমগিরির কানে তুলে দিয়েছে। করজের রুপাইয়া শোধ না করে তুই ভেগে গিয়েছিলি। তোকে পেলে হিমগিরি খতম করে দেবে।'

'অত সোজা না। দেশে পুলিশ আছে, কানুন আছে। যা খুশি করা যায় না।'

পাটনা ফরবেশগঞ্জ ধানবাদ ইত্যাদি ভারী ভারী টৌনে ঘুরে এই এক বছরে নিশ্চয়ই অনেক কিছু দেখেছে গণা, অনেক কিছু জেনেছে। হয়ত সে যা বলছে তা-ই ঠিক। তবু আজন্মের সহজাত ভয়ের সংস্কার ঘুচতে চায় না। ধর্মার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসতে থাকে। চোঁ চোঁ করে গরম চা শেষ করে গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা নে ; পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে পারলাম না। যা, চলে যা। তোকে দেখলেই মহল্লার লোকজন শোর তুলে দেবে। সাথ সাথ খবর হিমগিরিকো পাস পৌছ যায়েগা। চুপকে চুপকে মহল্লায় ঢুকবি। মাকে নিয়ে সড়কে উঠবি না ; মাঠ দিয়ে দিয়ে চলে যাবি। কেউ যেন দেখতে না পায়।'

'তু বহোত ডর গিয়া। এত্তে রোজ বাদ তোকে দেখলাম। দু-চারটে বাতচিত করি।'

গণার দুঃসাহস তার সম্পর্কে ধর্মাকে আরো শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। তবু ভীতভাবে সে বলে, 'নায় নায়। আভি রামলছমন চলা আয়েগা। তোকে দেখলে মুসিবত হয়ে যাবে।'

'ঠিক হ্যায়। তুই যখন বলছিস তখন যাই।' কয়েক পা এগিয়ে কী ভেবে আবার ফিরে আসে গণা। বলে, 'গারুদিয়ায় আমাদের মতো অচ্ছুৎদের জীওন হল জানবরের জীওন। চুহা কি কুত্তার মতো বেঁচে না থেকে আমার কাছে চল। ফেক্টরিতে নৌকরি জুটিয়ে দেব। বিলকুল বঁচ (বেঁচে) যায়েগা।'

ভারী টৌনে থেকে থেকে শুধু চেহারা পোশাকে না, কথাবার্তাতেও 'জেল্লা' লেগে গেছে গণার। সত্যিই তো এখানে পশুর জীবন তাদের

—অসহনীয় এবং গ্লানিকর। এই আলোবাতাসহীন নরক থেকে বেরিয়ে যাবার কথা বলছে গণা। বলছে সে নিজের হাতে তার জন্য স্বাধীন সম্মানজনক জীবনের দরজা খুলে দেবে। ধর্মার বুকের ভেতর রক্ত ছলকাতে থাকে ; লোভে চোখ চকচকিয়ে ওঠে। অসীম আগ্রহে গণার দুটো হাত ধরে সে বলে, 'সচমুচ এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবি তো?'

'সচমুচ। আমার ঠিকানা মনে করে রাখ। ঊষা ইঞ্জিনার কোম্পানি ; বয়লট ডিবিজান (বয়লার ডিভিসন)। ধানবাদ টিশনকা বগলমে বহোত ভারী ফেক্টরি। গেটে গিয়ে বয়লট ডিবিজন বলবি। আমাকে ডেকে দেবে।'

গণার ঠিকানা বার বার বিড় বিড় করে আওড়াতে থাকে ধর্মা।

গণা আর দাঁড়ায় না। ধর্মার রক্তে স্বাধীনতার প্রাণবাণ একটি বীজ বুনে দিয়ে হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

পাক্কীর দূর বাঁকে গণা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ধর্মা। অন্ধকার যখন দ্রুত ফিকে হয়ে আসতে থাকে, পুবদিকের আকাশ যখন ফর্সা হয়ে যায় সেই সময় পুরনো লঝঝড় সাইকেলে ঝক্কর ঝাঁই ঝক্কর ঝাঁই আওয়াজ তুলে রামলছমন এসে পড়ে। গাড়িটা না থামিয়েই চোখের তারা ধারাল করে পীপর গাছের তলায় তাকায়। ডাকে, 'ধম্মা হো, আ গিয়া তু?'

ধর্মা তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়, 'হুঁ—'

'হামনিকো পিছা আ যা—'

অর্থাৎ চাহাড়ের হাট পর্যন্ত পাক্কা পাঁচ মাইল সড়ক রামলছমনের সাইকেলের পিছু পিছু এখন দৌড়ে যেতে হবে ধর্মাকে। সাইকেলটার পেছনে ক্যারিয়ার লাগানো আছে। ইচ্ছা করলে ধর্মাকে সেখানে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু উঁচু জাতের রামলছমন এই ভোরবেলা অচ্ছুৎ ভূমিদাসকে বয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের নরকে যাবার রাস্তা সাফ করতে পারে না।

চাহাড়ের হাটে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেশ রোদ উঠে গেল। পনের দিন পর পর এখানে হাট বসে। তিরিশ চল্লিশ মাইলের ভেতর এত বড় আর এত জমজমাট হাট আর নেই।

এর মধ্যেই হাটের চালাগুলোর তলায় কেনাবেচা শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে বয়েল কি ভৈসা গাড়িতে করে আরো অনেক দোকানদার এখনও আসছে। পায়ে হেঁটে আসছে গাদা গাদা দেহাতী মানুষ।

রামলছমন হাটের মাঝখানে ঢুকল না। এক ধারে গৈয়া (গরু) হাটার পাশ ঘেঁষে সার সার পরাস কড়াইয়া আর চিলাম গাছ। পরাস এবং কড়াইয়া গাছগুলোতে সেই চৈত্র মাস থেকে গনগনে লাল রঙের থোকা থোকা ফুল ফুটতে শুরু করেছিল। এখনও গাছগুলো ফুল ফুটিয়েই যাচ্ছে।

পরাস কড়াইয়ার তলায় রোদ এবং ছায়া মেশানো জায়গাটায় অনেকগুলো মুণ্ডা ওরাওঁ চেরো আর সাঁওতাল মেয়েপুরুষ তাদের কাচ্চাবাচ্চা সমেত বসে আছে।

ফী বছর চাষবাসের সময় আদিবাসীরা এভাবে চাহাড়ের হাটের একধারে এইসব গাছের তলায় গা জড়াজড়ি করে বসে থাকে। চারধার থেকে জমির মালিক বা তাদের লোকজনরা এসে এখান থেকে ক্ষেতমজুর বাছাবাছি করে নিয়ে যায়।

এতকাল হিমগিরিনন্দন স্বয়ং ক্ষেতমজুর নেবার জন্য চাহাড়ের হাটে আসত। ইদানীং বছর দুই তিন রামলছমন আসছে। তবে ধর্মা এই প্রথম এল।

পাঁচ মাইল পাক্কীতে সাইকেল চালিয়ে আসার দরুন জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল রামলছমনের। সাইকেলটা একটা চিলাম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ওরাওঁ মুণ্ডাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে সে বসে এবং বাছরির (বাছুরের) মতো জিভ বার করে হাঁপাতে থাকে। ধর্মাও একটা কড়াইয়া গাছের তলায় বসে হাঁপায়।

খানিকটা ধাতস্থ হবার পর উঠে দাঁড়ায় রামলছমন। বলে, 'আমি আগে চায়-পানি খেয়ে আসি। বহোত ভুখ ভি লাগ গিয়া। আমি এলে তুই খেতে যাবি। ততক্ষণ সাইকেলের ওপর নজর রাখ। আর ওরাওঁ মুণ্ডাগুলোর ভেতর কাকে কাকে ক্ষেতির কামে নিবি দেখে রাখ্। দুব্‌লা কমজোরি আদমী চলবে না। সমঝা?'

ধর্মা ঘাড় কাত করে, 'হুঁ।'

রামলছমন এগিয়ে গিয়ে হাটের থিকথিকে ভিড়ে মিশে যায়।

কড়াইয়া গাছের ছায়ায় বসে বসে এক অচ্ছুৎ ভুমিদাস একদল

ভূমিহীন আদিবাসী ক্ষেতমজুরের দিকে তাকায়। জষ্ঠি মাসের বেলা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এ সময় চড়তি সূরযের ভয়ানক তেজ।

ধর্মা লক্ষ্য করল, এখনও অন্য ক্ষেতমালিক বা তাদের লোকজনেরা আদিবাসী কিষাণ নিতে আসে নি। তবে দুটো লোক ওরাওঁ-মুণ্ডাদের গা ঘেঁষে ওধারের পরাস গাছটার তলায় বসে আছে। লোক দুটো পাহাড় জঙ্গলের আদিবাসী না ; মনে হয় টৌনের (শহরের) লোক। পরনে ফুর পান্ট (ফুল প্যান্ট), ভালো কামিজ, পায়ে জুতো। তারা হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছিল, 'লোকের জমিনে কাজ করে ক'টা পাইসা আর পাবি? এক দো মাহিনা বাদ তো ভাগিয়েই দেবে। আমাদের সাথ চল। রোজ এক এক আদমী পাঁচ সাত রুপাইয়া মজুরি পাবি, খোরাকি পাবি, চার মাহিনা বাদ বাদ নয়া কাপড়া মিলবে, কামিজ ভি। আওরতরা শাড়ি পাবি, চোলিয়া পাবি—' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'এক-দো মাহিনার পর কেউ তোদের ভাগাবে না ; সালভর (বছর ভর) কামাই (রোজগার) করতে পারবি। পেটের জন্যে, কাপড়ের জন্যে কোন চিন্তা থাকবে না। বিলকুল গিরান্টি (গ্যারান্টি)।'

বছরভর যাদের পায়ে পায়ে দুর্ভিক্ষ ঘুরতে থাকে, সারা গা ঢাকার মতো যথেষ্ট আচ্ছাদন যাদের নেই, তেমন একদল সরল নিষ্পাপ ক্ষুধার্ত আদিবাসী মেয়েপুরুষের চোখ লোভে চকচক করতে থাকে। কানে শোনার পরও তাদের বোধহয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। একজন মধ্য বয়সী মুণ্ডা বলে ওঠে, 'ঝুটফুস (মিথ্যে কথা)।'

লোকদুটো প্রাণপণে হাত নেড়ে বলতে থাকে, 'নায় নায়, বিলকুল সচ। তোদের জাতের বহোত আদমী পাইসা কামাতে আমাদের সাথ গেছে।'

'হঁ, শুনা। রোজ পাঁচ সাত রুপাইয়া মিলেগা?'

'জরুর।'

'নয়া কাপড়া ভি?'

'হাঁ।'

'কোথায় যেতে হবে তোদের সাথ?'

'আসাম, আগরতলা—'

'বহোত দূর?'

'নায় নায়, নজদিগ। হাজারিবাগসে থোড়া দূর—'

এ অঞ্চলের লোক হাজারিবাগের নামটা জানে। মধ্যবয়সী মুণ্ডা কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে। তারপর বলে, 'টিরেনের ডিব্বায় চড়ে যেতে হয় ?'

লোকদুটো মাথা নাড়ে, 'হাঁ। তা হলে আর বসে থেকে কী হবে। আমাদের সাথ চল। নে নে, উঠে পড়। দুকানে গিয়ে চায়-পানি, নিমকিন, বুনিয়া (বোঁদে), সমোসা খাইয়ে দিচ্ছি। টিসনে গিয়ে ভাতকা ভোজ লাগিয়ে দেব। ওঠ ওঠ—'

দূরে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল ধর্মা। আগেই সে কার কাছে যেন শুনেছে, খুব সম্ভব মাস্টারজীর কাছেই—আড়কাঠিরা মুণ্ডা ওরাওঁ আর সাঁওতালদের দূর দেশে নিয়ে যায়।

কিন্তু ভালো ভালো দামী দামী খাবার এবং নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের প্রলোভন সত্ত্বেও উঠে পড়ে না আদিবাসীরা। প্রবীণ মুণ্ডা নিজেদের ভাষায় স্বজাতের লোকজনের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করে। সাঁওতাল এবং ওরাওঁদের মধ্যে যারা বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ তারাও উঠে এসে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে। বোঝা যায়, অজানা জায়গায় যাবে কিনা সে জন্য তারা মন ঠিক করতে পারছে না। কিন্তু টাকাপয়সা আর দু'বেলা ভরপেট খাওয়ার ব্যাপারটা রয়েছে। সেটা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আড়কাঠি দুটো তাড়া লাগাতে থাকে, 'কী হল রে, জলদি উঠে পড়। ধুপ (রোদ) চড়ে যাচ্ছে—' তাদের ব্যস্ততার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, ক্ষেতমালিকের লোকেরা এসে গেলে আদিবাসীদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে না। ভালো হোক, মন্দ হোক, পুরুষানুক্রমে জমির মালিকদের তারা চেনে। তাদের কাছ থেকে কতটুকু কী পেতে পারে সে সম্বন্ধে এই আদিবাসীদের স্পষ্ট ধারণা আছে। হাজার লোভ দেখানো সত্ত্বেও দূরে অজানা জায়গায় যেতে এরা ভয় পায়।

আড়কাঠিদের তাড়াতেও লোকগুলো ওঠে না। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ চালাতেই থাকে।

এইসময় রামলছমন চা এবং নাস্তা খেয়ে ফিরে আসে। এসেই শুধোয়, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। আদমী পসন্দ করে রেখেছিস ?'

আদিবাসী এবং আড়কাঠিদের কথা শুনতে শুনতে এ ব্যাপারটা

পুরোপুরি মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ধর্মার। সে বেজায় ভয় পেয়ে যায় এবং বুকের ভেতর দম আটকে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কসুর হো গিয়া দেওতা। আভি পসন্দ কর লেতা—'

প্রচুর সুখাদ্যের তলায় চনচনে খিদেটা চাপা পড়ার দরুনই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক রাগ যতটা চড়া উচিত ঠিক ততটা চড়ে না রামলছমনের। সে বলে, 'ভইস কাঁহিকা! তুহারকা ফাইন হো গিয়া—নাস্তা বন্ধ্। এক দফে তুফারমে কালোয়া মিলেগা—'

সকালে ভালো নাস্তার আশা ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যায় ধর্মার। পাক্কী ধরে পাঁচ মাইল দৌড়ে আসার জন্য খিদেটাও পেয়েছে মারাত্মক। কিন্তু কিছু করার নেই আর। দুপুর পর্যন্ত পেটে ভুখ নিয়ে তাকে থাকতে হবে।

বিষণ্ণ মুখে ধর্মা আদিবাসীদের দিকে এগিয়ে যায়। রামলছমনও হাত দশেক দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু এগুতে থাকে।

রামলছমন আর সে যে ক্ষেতমালিকের লোক তা বোধ হয় আগে টের পায় নি আড়কাঠি দুটো। তারা ভীষণ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে এবং খানিকটা দূরে অন্য একটা চিলাম গাছের তলায় গিয়ে বসে।

এইসব আড়কাঠিরা ক্ষেতমালিকদের ভয় পায়। তার কারণ অস্থায়ী কিষাণ ছাড়া মালিকদের চাষ আবাদের খুবই অসুবিধা। অথচ বেশ কিছুকাল ধরে এই মরসুমী কিষাণদের ফুসলে সুদূর আসাম বা ত্রিপুরায় চা-বাগান কিংবা ইটখোলায় কাজে নিয়ে যাচ্ছে আড়কাঠিরা। ফলে জমি মালিকের লোকেরা এদের ওপর ক্ষিপ্ত। ক'বছর বেশ কয়েকজন আড়কাঠি মালিকদের লোকের হাতে বেদম মার খেয়েছে। স্বার্থে চোট লাগলে যা হয় আর কি।

দূর থেকেই রামলছমন আদিবাসীদের শুধোয়, 'কি রে, গারুদিয়ায় গিয়ে ক্ষেতের কাজ করবি তো?' এটা বলার জন্যই বলা। সে জানে ক্ষেতের কাজ না করে ওদের গতি নেই।

রামলছমনকে ওরাওঁ মুণ্ডাদের অনেকেই চেনে। কেননা ক'বছর ধরে সে মরসুমী কিষাণ নিতে আসছে। আড়কাঠিদের কথা ভুলে গিয়ে এই মুহূর্তে ওরা বলে, 'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো বসে আছি হুজৌর।'

কী করে ক্ষেতমজুর বেছে নিতে হয় সে সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাদের দোসাদটোলার আধবুড়ো গণেরি এবং মাধোলালের কাছে এ ব্যাপারে অনেক শুনেছে ধর্মা। আদিবাসীদের কাছে এসে

একটা ওরাওঁকে সে বলে, 'ওঠ—'

ওরাওঁটা উঠে দাঁড়ায়। ধর্মা তার আগাপাশতলা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, 'যা, ওধারে গিয়ে দাঁড়া—' লোকটাকে তার পছন্দ হয়েছে।

ওরাওঁটা ডান দিকে পা বাড়িয়েছিল, রামলছমন পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে উল্লু, একবার আঁখে দেখেই পসন্দ্ করে ফেল্লালি? চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। ভালো করে টিপে টিপে হাত ছাখ, পা ছাখ, পিঠ ছাখ, সিনা ছাখ—অ্যায়সা অ্যায়সা কিষাণ পসন্দ করা যায়!'

অগত্যা রামলছমনের হুকুম অনুযায়ী লোকটার গা টিপে দেখতে হয়।

রামলছমন ফের বলে, 'কী মালুম হল, জানবরটার গায়ে তাকত আছে?'

ধর্মার একটা কথায় ওরাওঁটা নাকচ হয়ে যেতে পারে, আবার মাসখানেক মাস দেড়েকের জন্য তু'বেলা পেটের চিন্তা ঘুচতেও পারে। যখন তার শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের পরীক্ষা চলছে সেইসময় করুণ চোখে সে ধর্মার দিকে তাকায়। মুখে কিছু না বললেও, চাউনি দেখে টের পাওয়া যায়—ধর্মা যেন তাকে বাতিল করে না দেয়।

ধর্মা বলে, 'আছে হুজৌর।'

ধর্মার কথায় ভরসা করলেও রামলছমন ওরাওঁটাকে শুধোয়, 'তু'বেলা পাটনাই বয়েলের লাঙল টানতে পারবি তো?'

'পারব হুজৌর।'

'ঠিক হ্যায়। ওধারে গিয়ে গাছের নিচে বসে থাক।' বলে ধর্মার দিকে তাকায়, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া, এবার তুসরা আদমী—'

পুরুষদের বেলায় হাত-পা টিপে পরখ করে নিলেও মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না ধর্মা। কিন্তু রামলছমনের একান্ত ইচ্ছা পুরুষদের মতো মেয়েদেরও যাচিয়ে বাজিয়ে নেওয়া হোক। সে জন্য ধর্মাকে ধমক ধামকও দিতে থাকে, 'গায়ে হাত দিলে কি ফোস্কা পড়ে যাবে। রাজা মহারাজার ঘরবালী সব! চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। লাগা হাত কুত্তীদের গায়ে।' পারলে কাপড় খুলিয়ে শারীরিক শক্তি যাচাই করিয়ে নেয় সে।

ধর্মা কুঁকড়ে যেতে থাকে। ভয়ানক কাচুমাচু মুখে সে বলে, 'নায় নায় হুজৌর। এ আওরত হ্যায়—'

প্রচুর চেঁচামেচি করেও কোন মেয়ের গায়ে ধর্মাকে হাত দেওয়াতে পারে না রামলছমন। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ব্যাপারটা তাকে মেনে নিতে হয়।

কিষাণ বাছতে বাছতে বকরি কি গো-হাটের কথা মনে পড়ে যায় ধর্মার। যেভাবে মানুষ টিপেটুপে বকরি বা ছাগরি বা গাই-বয়েলের শাঁস দেখে নেয় সেইভাবে এই মনুষ্যসন্তানদের বেছে নিতে হচ্ছে। বড় খারাপ লাগে তার।

বাছাবাছি করে মেয়েপুরুষ মিলিয়ে মোট চল্লিশ জনকে একধারে জড়ো করল ধর্মা আর রামলছমন। এ ছাড়া বারো চোদ্দটা বাচ্চাও রয়েছে মেয়েগুলোর সঙ্গে। বাচ্চাগুলো গুনতির মধ্যে নয়; ওরা পুরোপুরি হিসেবের বাইরে। বাপ-মা গতর খাটিয়ে মজুরি আর খোরাকি পাবে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিচ্ছু না। যাদের বাচ্চা, খাওয়াবার দায় তাদেরই। এই নিয়মই বছরের পর বছর চলে আসছে। তবু রামলছমন কথাটা আরেক বার মনে করিয়ে দেয়, 'তোদের আণ্ডা-বাচ্চার জন্যে কিন্তু কিছু মিলবে না।'

আদিবাসীরা মাথা নাড়ে, 'জানতা হ্যায় হুজৌর—'

'পরে আবার ঝামেলা বাধাস না।'

'নায় নায়।'

এবার শিশুগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যদের মাথা গুনে গুনে প্রত্যেককে একটি করে টাকা দেয় রামলছমন। বলে, 'এক রুপাইয়া 'ইডভান্স' দিলাম। যা, খেয়ে আয়। খাওয়া হলে এখানে লৌটবি। সমঝা?'

'হাঁ হুজৌর--' একটা করে টাকা হাতে পেয়ে আদিবাসী মানুষগুলো ভীষণ খুশী। তারা ছাতু বা মকাই টকাই কেনার জন্য দোকানের খোঁজে চলে যায়।

এই সময় চাহাড়ের হাটের আরেক দিক থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসে।

'সুখন রবিদাসকো —'

'বোট দো, বোট দো —'

'সুখন রবিদাসকো--'

'বোট দো, বোট দো—'

চেঁচাতে চেঁচাতে লোকগুলো এদিকে চলে আসে। সব মিলিয়ে তিরিশ চল্লিশ জন। তাদের মাঝখানে সাতাশ আটাশ বছরের, মাঝারি

মাপের, পেটানো চেহারার হাসিমুখ সুখন রবিদাসকে দেখা যায়। পরনে মোটা সুতোর খাটো ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ, পায়ে সস্তা খেলো স্যাণ্ডেল। সর্বক্ষণ তার মুখে হাসি লেগেই থাকে।

গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত চামারদের এই ছেলেটাকে বহু লোক চেনে এবং খাতির টাতিরও করে। সুখন 'পাড়িলিখী' আদমী; পাটনায় গিয়ে কয়েক সাল 'কালেজে' পড়েছে। তা ছাড়া বহোত তেজীও। বামহন, কায়াথ, ভকীল, ডাগদর, সরকারী অফসর—সবার মুখের ওপর ঠাঁই ঠাঁই কথা বলতে পারে। আংরেজি বলে জলের মতো। উঁচু জাতের লোকেদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে তর্কাতর্কি করার জন্য অনেক বার মারধরও খেয়েছে। একবার এমন মার খেয়েছিল যে পুরা দু দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল।

সুখনকে অনেক কাল ধরেই চেনে ধর্মা। ওদের বাড়িও গারুদিয়া মৌজায়—চামারটোলায়। চামারটোলাটা যদুবংশী ছত্রিদের অর্থাৎ গোয়ালাদের গাঁ চৌকাদের পশ্চিম ধারে। যাই হোক অচ্ছুৎ হয়েও সুখন বামহন কায়াথদের পরোয়া করে না। এই সব নানা কারণে তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে ধর্মা। জল-অচল অচ্ছুৎ হলেও একটি আদমী বটে সুখন রবিদাস; বহোত তেজ আদমী। বহোত উঁচা শির।

রামলছমনও সুখনের ভোটের দলটাকে লক্ষ্য করছিল। ক্রমশঃ তার ভুরু দুটো কুঁচকে যাচ্ছে আর মুখে তাচ্ছিল্য বিরক্তি আর প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠছে। সে বলে, 'আচ্ছা, অচ্ছুৎ চুহার বাচ্চাটা তা হলে চুনাওতে নেমেছে! বোট মাঙতে বেরিয়েছে! হাঁথীর সাথ চুহা লড়তে এসেছে! এক লাথ খেয়ে যে চ্যাপ্টা হয়ে যাবি হারামজাদের ছৌয়া (ছেলে)।' এখানে যাঁর সম্বন্ধে হাতীর উপমা দেওয়া হল তিনি রঘুনাথ সিং।

রামলছমনের কথাগুলো পুরোপুরি কানে ঢোকে না ধর্মার। দু চোখে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় নিয়ে সুখনের দিকে তাকিয়েই থাকে। যতদূর মনে আছে, সুখন রবিদাস এই প্রথম চুনাওতে নামল। অন্যমনস্কের মতো রামলছমনকে সে শুধোয়, 'সুখন রবিদাস কি বড়ে সরকারের সাথ চুনাওতে লড়বে?'

রামলছমন বড় বড় গজালের মতো কালচে দাঁত বার করে খিঁচিয়ে ওঠে, 'হাঁ রে উল্লু, হাঁ। চুহাকা বাচ্চাটার পাখনা গজিয়েছে। মরেগা, জরুর ফৌত হো যায়েগা। কাঁহা বড়ে সরকার, কাঁহা ও চামারকে

ছোঁয়া !'

সুখন রবিদাস তার চুনাওর দল নিয়ে ধর্মাদের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে থিকথিকে ভিড়ের ভেতর মিশে যায়। সেদিকে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়ে থাকে রামলছমন।

বেলা আরো বেড়ে গেছে। চড়তি সূরয আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ধর্মা হঠাৎ টের পায় সেই গনগনে খিদেটা পেটের ভেতরটা যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

রামলছমন সুখনদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মাকে বলে, 'ওরাওঁ মুণ্ডাগুলো ফিরে এলে আর দেরি করব না ; গারুদিয়ায় ফিরে যাব।'

খিদের কথাটা 'বলব না বলব না' করেও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে ধর্মা, 'হুজৌর দেওতা, বহোত ভুখ লাগি।'

রামলছমন চেঁচিয়ে উঠে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া! হারামজাদ তুহারকো আভি 'ফাইন' কর দিয়া—নাস্তা বন্ধ! ভুল গিয়া?' বলতে বলতেই তার মনে পড়ে যায়, ক'দিন আগে বড়ে সরকার নিজের হাতে অচ্ছুৎ দোসাদদের ভৈসা ঘিয়ে তৈরি দামী লাড্ডুয়া বেঁটে দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই চুনাও। এখন ছোট বড় চামার-দোসাদ-গঞ্জু-ধোবি-তাতমা-ধাঙড় কাউকেই চটানো ঠিক না। চুনাওর দিক থেকে এরা কেউ মানুষ না ; একটা করে ভোট। দেশে বামুন কায়াথ আর কত? এইসব গরীব জল-অচল মানুষই তো গুনতিতে বেশি। এরা সবাই ক্ষেপে গেলে মতদান রঘুনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে চলে যাবে। সাধে কি আর বড়ে সরকার ভুখা, আধা-নাঙ্গা, জানবর য্যায়সা অচ্ছুৎগুলোকে আর তাবত গারুদিয়া তালুকের দেহাতী মানুষগুলোকে মিঠাইয়া বিলোন! মাথাটা ভীষণ সাফ তাঁর।

সরকার এই এক 'মিশিন' বার করেছে—চুনাওকা মিশিন। ভোট হল এই মিশিনের তেল। বেশি লোকের ভোট যে পাবে মিশিন তার পক্ষেই চালু থাকবে। তাই জলচল হোক, জল-অচল হোক, লিখিপড়ী হোক আর আনপড়ই হোক—চুনাওতে জেতার জন্য সবাইকেই খাতির করতে হয়, তোয়াজ করতে হয়। চুনাওর মরসুম পার হলে মাথার ওপর থেকে নামিয়ে এদের উপযুক্ত জায়গায় ঝেড়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ বড়ে সরকারের নাগরার তলায় তখন আবার এরা ফিরে যাবে।

এসব কথা এই মুহূর্তে রামলছমনের মনে পড়বার কথা ছিল না; সুখন রবিদাসের ভোটের দলটাকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে যায়। যার ভোট আছে, এমন কোন লোককেই এখন চটানো ঠিক নয়। সে তাড়াতাড়ি ফের বলে ওঠে, 'ফাইন মাপ কর দিয়া। এই নে, এক রুপাইয়া নাস্তার জন্যে, দো রুপাইয়া কালোয়ার জন্যে। তুরন্ত খেয়ে আয়।'

নগদ তিনটে টাকা পাওয়া আর আকাশের তিনটে তারা হাতে পাওয়া ধর্মার কাছে একই ব্যাপার। খুশি এবং উত্তেজনায় তার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড লাফাতে থাকে। আর সেই অবস্থাতেই হাটের দিকে দৌড়য় ধর্মা। কিছুক্ষণ পর পুরাপাক্কা দু'টাকা খরচা করে রহেড় ডাল, বেইগন আর বদির তরকারি, শিকার এবং পুদিনার আচার দিকে ভাতকা ভোজ খেয়ে পরাস আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে। নাস্তার একটা টাকা তার হাতেই থেকে যায়। এটাই তার মস্ত লাভ। এই টাকাটা খরচ না করে সে জমিয়ে রাখবে ভবিষ্যতের জন্য।

এদিকে ওরাওঁ এবং মুণ্ডারাও খেয়েদেয়ে ফিরে এসেছে। রাম-লছমন আর দেরি করতে চাইল না। তাড়া দিয়ে বলে, 'পেট ঠাণ্ডা করেছিস। এবার চল সব—'

• ওরাওঁরা তৎক্ষণাৎ রাজী, 'হুঁ-হুঁ---'

ধর্মারা যে চল্লিশ জনকে বেছে নিয়েছে তারা ছাড়াও পরাস গাছগুলোর তলায় আরো অনেক আদিবাসী বসে ছিল। চারপাশের অন্য ক্ষেতমালিক বা তাদের লোকজনেরা ঐ সব ঝড়তিপড়তি ওরাওঁ মুণ্ডাদের ঝাড়াই বাছাই করে নিচ্ছে। ধর্মা যখন খেতে গিয়েছিল সেই ফাঁকে অন্য ক্ষেত মালিকরা এখানে হানা দিয়েছে।

আদিবাসীদের সঙ্গে করে এক সময় ধর্মারা রওনা হয়ে যায়। তার আগেই মেয়েরা তাদের বাচ্চাগুলোকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। আগে আগে লঝঝড় সাইকেলে ঝক্কর ঝাঁই ঝক্কর ঝাঁই আওয়াজ তুলতে তুলতে পাক্কী ধরে গারুদিয়ার দিকে এগুতে থাকে রামলছমন। পেছনে বাকী সবাই।

চড়তি সূরয খাড়া মাথার ওপর উঠে এসে এখন গনগনে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই জষ্ঠি মাসের দুপুরে রোদের ভাপ মারাত্মক হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর। উল্টোপাল্টা তেজী হাওয়া উত্তর থেকে

দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে আড়াআড়ি ছুটে চলেছে।

মাতব্বর গোছের সেই আধবুড়ো মুণ্ডাটার পাশাপাশি হাঁটছিল ধর্মা। খানিকক্ষণ আগে আড়কাঠি তুটো কড়াইয়া গাছের তলায় এরই গা ঘেঁষে বসে আসাম বা ত্রিপুরা কোথায় যেন নিয়ে যাবার জন্য অনবরত ফুসলে যাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝবয়সী মুণ্ডার সঙ্গে নানারকম গল্প হতে থাকে। কথায় কথায় ধর্মা জানতে পারে, ওদের গাঁও এখান থেকে কম করে পনের বিশ ক্রোশ উত্তরে। সালভরই তাদের বড় কষ্ট। বিশেষ করে এই শুখা গরমের সময়টা।

রোদে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এক দানা খাদ্য কোথাও নেই, দশ হাত বালি খুঁড়লে তবে হয়ত এক লোটা খাবার জল মেলে।

মুণ্ডাটা যা বলে যায় তা এইরকম। এখন চাষের মরসুম বলে তাদের মতো কিছু শক্তসমর্থ তাকতওলা মানুষকে জমির মালিকেরা কাজের জন্য ডাকে। বাদবাকীদের যে কী হাল, ভাবা যায় না। কাজ নেই, খাদ্য নেই, পাইসা নেই। একমাত্র ভরসা হল মহুয়ার ফল আর সুথনি। টৌনের লোকেরা এসে মাঝে মাঝে তাদের অনেককে কাজের আর ভরপেট খাওয়ার লোভ দেখিয়ে বহু দূরের কোন অজানা দেশে নিয়ে যায়।

ধর্মার মতো ভূমিদাসদের সঙ্গে এই ভূমিহীন আদিবাসী ক্ষেত-মজুরদের তফাৎ সামান্যই। জীবনযাত্রা প্রায় একই ধাঁচের। তফাতের মধ্যে এরা মোটামুটি স্বাধীন আর ধর্মারা বাপ-নানার করজের শেকলে পুরুষানুক্রমে বাঁধা হয়ে আছে। তবু খানিকটা কৌতূহল দেখায় ধর্মা। জিজ্ঞেস করে, 'টৌনের লোকেরা তোদের জাতের আদমীদের কোথায় নিয়ে যায়?'

মুণ্ডাটা হাত নেড়ে বলে, 'মালুম নহী।'

'যারা বাইরে যায়, ফিরে এসে কী বলে? খেতে পায়? পাইসা পায়?'

'মালুম নহী।'

'কায়?'

'যারা বাইরে গেছে তাদের কেউ এখনও ফেরে নি। পিছা সাল গাঁও ধামুদা থেকে শ আদমী গেল। তার আগের সাল গোলগোলি,

পাট্টন, চৌহট—এই সব গাঁও থেকে গেল দেড় শ আদমী ; কোই নহী লোটা।'

'বেঁচে আছে তো?'

'মালুম নহী—'

এরপর চুপচাপ। পাশ দিয়ে দূর পাল্লার বাস গরম বাতাস চিরে ক্ষ্যাপা জানবরের মতো অনবরত ছুটে যায়, সাইকেল-রিকশা যায়, ভৈসা আর গৈয়া গাড়ি যায়। আর এক ভূমিদাস মুক্ত আকাশের তলা দিয়ে একদল ভূমিহীন মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

রামলছমন ধর্মার কাঁধে মরস্থমী ক্ষেতমজুরদের দায়িত্ব চাপিয়ে জোরে জোরে সাইকেল চালিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না।

মাইলখানেক যাবার পর চাহাঢ় হাটের সেই আড়কাঠি দুটো দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে তাদের ধরে ফেলে। খুব সম্ভব তারা পেছন পেছন আসছিল। রামলছমনকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে এখন এগিয়ে এসেছে। ক্ষেত মালিকের লোক রামলছমন তাদের দেখলে গোলমাল বাধিয়ে দেবে। তাই এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে স্থযোগ বুঝে এগিয়ে আসা।

ধর্মা যে মধ্যবয়সী মুণ্ডাটার সঙ্গে কথা বলছিল, তার গা ঘেঁষে চলতে চলতে আড়কাঠিদের একজন জিজ্ঞেস করে, 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস?'

মুণ্ডাটা জানায়, 'গারুদিয়া তালুকে।'

'কার জমি চষতে যাচ্ছিস?'

'মালুম নহী। ইসকো পুছো—' বলে মধ্যবয়সী মুণ্ডা ধর্মাকে দেখিয়ে দেয়।

আড়কাঠিরা চাহাঢ় হাটের একধারে খানিকক্ষণ আগে কড়াইয়া গাছের তলায় ধর্মাকে দেখেছে। ক্ষেতমালিকের লোকের সঙ্গে এলেও চেহারা এবং জামাকাপড়ের হাল দেখে তারা টের পেয়ে গেছে, ধর্মা তুচ্ছ কিষাণ বা ঐ জাতীয় কিছু ; তাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই। তারা জানতে চায়, গারুদিয়ার কার জমিনে আদিবাসীদের লাগানো হবে।

ধর্মা বলে, 'বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের।'

আড়কাঠিরা আর দাঁড়ায় না, নতুন কোন প্রশ্নও করে না। ঘুরে

চাহাড়ের হাটের দিকে ফিরে যেতে থাকে।

সামান্য এই খবরটার জন্য জেঠ মাহিনার এই ঝলসানো রোদে এতটা রাস্তা কেন যে ওরা দৌড়ে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে, জানবার ইচ্ছা হয় ধর্মার। সাতপাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত আর কথাটা জিজ্ঞেস করা হয় না।

রাস্তায় মাঝে মাঝে জিরিয়ে শেষ পর্যন্ত গারুদিয়ায় রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। এর মধ্যে গণেরি মাধোলাল কুশীরা হাল-বয়েল জমা দিয়ে দোসাদটোলায় ফিরে গেছে।

তেরো

আদিবাসী মরসুমী ক্ষেতমজুরদের যেদিন আনা হয় সেদিন হিমগিরিনন্দন তার 'কানটোল রুমে' বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করে। কেননা প্রথম দিন তাদের খোরাকির ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু আজ তাকে দেখা গেল না। এমন কি তার পা-চাটা কুত্তা রামলছমনও নেই।

এই দু'জন না থাকলেও অন্য লোকজন আছে। তারা জানালো হিমগিরি আদিবাসীদের জন্য সব বন্দোবস্ত করে রেখে গেছে। ওরাই তাদের মকাইর ছাতু, নিমক, মিরচা, মিট্টি তেল ইত্যাদি দিল। থাকার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই। খামারবাড়ির লম্বা লম্বা টিনের চালাগুলোর পেছনে আদিবাসীদের জন্য স্থায়ী মেটে ঘর রয়েছে। ক্ষেতের কাজ যতদিন চলবে ততদিন ওরা ওখানেই থাকবে।

আদিবাসীদের রাতের খোরাকি টোরাকি দিতে দিতে খামারের লোকজনেরা ধর্মাকে জানায়, হিমগিরি এবং রামলছমন তাদের দোসাদটোলায় গেছে।

ধর্মা অবাক হয়ে যায়। রামলছমন বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঝে মাঝেই তাদের টোলায় হানা দেয়। সে যায় ক্ষেত-খামারের কোন একটা কাজের ছুতো ধরে। তবে আসল উদ্দেশ্য হল, মেয়েদের পেছনে পেছনে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ানো। কিন্তু নওরঙ্গী

হিমগিরিনন্দনের রাখনি হলেও কখনও কোন কারণেই দোসাদটোলায় তাকে যেতে দেখা যায় না। অচ্ছুৎ দুসাদিনকে রাতের আন্ধেরাতে বিছানায় নিয়ে তুললেও তাদের পাড়ায় গিয়ে উচ্চবর্ণের হিমগিরি ব্রাহ্মণত্বকে বিপন্ন করতে পারে না।

ধর্মা শুধোয়, 'আমাদের ওখানে কেন গেছে?'

'মালুম নহী—' খামারের লোকজনেরা জানায়।

'কখন গেছে?'

'আভভি। তুই গেলেই দেখতে পাবি।'

কী কারণে হিমগিরি এবং রামলছমন এই ভর সন্ধ্যায় অচ্ছুৎদের মহল্লায় ছুটল, ভেবে পায় না ধর্মা। এক অজানা ভয়ের শিহরণ তার শিড়দাঁড়ায় খেলে যেতে থাকে। আর দাঁড়ায় না সে। ঝাঁ ঝাঁ রোদে পুরা পাক্কা চার মাইলের বেশি রাস্তা ভেঙে চাহাড়ে গেছে ধর্মা; আবার ততটা পথই হেঁটে এসেছে। এতক্ষণ হাতপায়ের জোড় ঢিলে হয়ে আসছিল তার। সে সব ভুলে এখন দোসাদটোলার দিকে দৌড়ুতে থাকে।

মহল্লার সিকি 'মিলে'র (মাইলের) মধ্যে আসতেই দূর থেকে বাতাসে গোঙানির মতো শব্দ ভেসে আসতে থাকে। ধর্মা একটু থমকায়। টের পায়, বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠেছে। কান খাড়া করতেই সে বুঝতে পারে, ওটা গোঙানি না, কান্নার আওয়াজ। কেউ গলার সুর কখনও একটু উঁচুতে তুলে, কখনও নামিয়ে ঘ্যানঘেনে টিপির টিপির 'বারিষে'র মতো শব্দ করে কেঁদে চলেছে। কান্নাটা কোন আওরতের। কে হতে পারে? বুকের ভেতর দম আটকে ধর্মা শক্ত কাঁকুরে মাটির ওপর দিয়ে হঠাৎ তিনগুণ জোরে ছুটতে থাকে।

কাছাকাছি আসতেই ভয়ে হাড় কেঁপে যায় ধর্মার। দোসাদ-টোলার সামনের জমিতে ক'টা লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা যায়, গণা মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে আছে। তার হাত-পা বাঁধা। খালি গা। চামড়া ফেটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। গালের কষ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। দেখেই বোঝা যায়, এখনও পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে যায় নি গণা। থেকে থেকে কামারের হাপরের মতো বুক তোলপাড় করে এককেটা শ্বাস পড়ছে।

গণার এধারে হিমগিরি রামলছমন এবং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের তিন চারটে পহেলবান দাঁড়িয়ে আছে। রঘুনাথের বাপ, ঠাকুরদা এবং তাঁদেরও আগে থেকে পুরুষানুক্রমে পহেলবান পোষা হচ্ছে। এক জমানা যায়, আরেক জমানা আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বুড়ো পহেলবানদের জায়গায় নয়া পহেলবান আসে তাদের পোষার উদ্দেশ্য একটাই—বেয়াড়া ঠেঁটা প্রজা বা ভূমিদাসদের শাসন। ঘরে আগুন দেওয়া থেকে খুন করে রাতারাতি লাস গুম করে দেওয়া পর্যন্ত হেন কাজ নেই যা তারা পারে না। এতক্ষণে বোঝা যায় হিমগিরি আর রামলছমন কেন এই ভর সন্ধ্যায় দোসাদটোলায় হানা দিয়েছে।

শেষ রাতে বড় সড়কে পীপর গাছের তলায় গণার সঙ্গে দেখা হতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল ধর্মা। হোঁশিয়ার হয়ে সে বচপনের বন্ধু গণাকে দোসাদটোলায় ঢুকতে বলেছিল। ধর্মা জানত, ধরা পড়লে রঘুনাথ সিংয়ের পোষা পহেলবানেরা তার কী হাল করে ছাড়বে। 'করজে'র রুপাইয়া শোধ না করে টৌনে পালিয়ে যাওয়া কোনমতেই বড়ে সরকার বরদাস্ত করবেন না। তারপর চাহাড়ের হাটে আদিবাসী ক্ষেতমজুর বাছাবাছি করে তাদের নিয়ে গনগনে রোদের মধ্য দিয়ে গারুদিয়ায় ফিরতে ফিরতে গণার কথা ভুলে গিয়েছিল ধর্মা। ভূমিদাসদের নোংরা পরাধীন পশুর জীবন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল গণা। পুরোপুরি স্বাধীন হবার এক বছর বাদে ভিখমাংনি মাকে নিতে এসে ধরা পড়ে গেল সে। কিন্তু একটা খটকা ধর্মার যায় না। গণা ধরা পড়ল কী করে? একমাত্র নওরঙ্গী ছাড়া দোসাদটোলার আর কেউ তো যেচে গিয়ে হিমগিরিদের কাছে গণার খবর দেবে না। গণা জনমদাসের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে দোসাদরা তার সম্পর্কে খুবই ঈর্ষান্বিত। তাই বলে তার ক্ষতির কথা কেউ ভাবে না। গণা পালিয়ে যাবার পর অনেক দিন পর্যন্ত দোসাদটোলায় সবাই বলাবলি করেছে, 'হামনিলোগ নায় সাকা, লেকেন গণানে সাকা। ছোকরা বচ্ যাওল।'

'বড়ে সরকার আর তার কুত্তাদের আঁখে ধুলো দিয়ে বুদ্ধ বানিয়ে গণা ভাগল। বহোত সাবাস!'

মনে মনে গোটা দোসাদটোলা এরকম একটা কৃতিত্বের জন্য গণার সম্বন্ধে এক ধরনের শ্রদ্ধাই পোষণ করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র

নওরঙ্গীই হিমগিরিকে তার খবর দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু শেষ রাতে যখন গণা দোসাদটোলায় গেছে তখন ঐ ছমকি আওরতের তো হিমগিরির বিছানায় থাকার কথা। অবশ্য খুব ভোরে আকাশ ফর্সা হতে না হতেই সে হিমগিরির কাছ থেকে ফিরে আসে। ধর্মা ভাবে, কীভাবে গণা ধরা পড়ল, সেটা জানা দরকার। পরে কুশীর কাছ থেকে সে জেনে নেবে।

ওদিকে গণার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরে হাত বুলোতে বুলোতে তার ভিখমাংনি মা বুড়ী সৌথী জড়ানো শব্দ করে নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। তার কোঁচকানো গালের ওপর দিয়ে চোখের জলের স্রোত গড়াতে থাকে অনবরত। দূর থেকে সৌথীর কান্নাই তা হলে শুনতে পেয়েছিল ধর্মা।

মাঝখানে গণা আর সৌথী, এপাশে পহেলবানসুদ্ধু হিমগিরি রামলছমন আর ওপাশে দোসাদটোলার লোকজনেরা। তাদেরই একজনের স্বাধীন হতে চাওয়ার পরিণাম কী দাঁড়াতে পারে দেখতে দেখতে দোসাদ আর দোসাদিনরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ওখানে ভিড়ের মধ্যে কুশীকে দেখতে পেয়ে চোরের মতো চুপি চুপি তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মা।

এদিকে হিমগিরি ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ সরু গলায় কানের পর্দায় তুরপুন চালাতে থাকে, 'দেখা, চুহাকে বাচ্চাকো হাল দেখা। করজ শোধ না করে ভাগলে কী ফল, নিজের আঁখে তোরা ছাখ। কেউ যদি এভাবে ভাগার মতলব করিস হাড্ডি ঢিলা করে দেব। কানমে ঘুষল্ হামনিকো বাতরি?'

দোসাদ দোসাদিনরা এত ভয় পেয়ে গেছে যে তাদের গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয় না। নিঃশব্দে ঘাড় কাত করে শুধু জানায়—ঘুষেছে।

হিমগিরি ইচ্ছা করলে গণাকে খামারবাড়িতে টেনে নিয়ে পহেলবান দিয়ে হাড়-মাংস আলাদা করে দিতে পারত। তার বদলে সিধা দোসাদটোলায় এসে ভূমিদাসদের ডেকে তাদের চোখের সামনে গণাকে এই যে বেধড়ক মারধোর করানো হল, সেটা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। অর্থাৎ অচ্ছুৎ কুত্তার দল, তোরা সবাই দেখ, ভূমিদাসের জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে ফল কী দাঁড়ায়। এরকম একটা ভয়াবহ দৃষ্টান্ত দেখা থাকলে কেউ আর স্বাধীনতার খোয়াব দেখতে

সাহস করবে না।

গণাকে ছু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুড়ী সৌখী সমানে কেঁদে চলেছে। আর গণার ঠোঁট কপাল ভুরু ঘাড়—বলা যায় সারা শরীরটাই রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

হিমগিরিনন্দন ঘাড়টা এদিকে হেলিয়ে ওদিকে হেলিয়ে চোখ বুঁচকে গণার মারের বহরটা দেখে নেয়। ঠ্যাঙানোটা বেশ ভালই হয়েছে। হিমগিরির মুখেচোখে পরিতৃপ্তির চিকণ একটু হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়। ছুঁচের মতো সরু গলায় সে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা রে গণোয়া, বুলা লে তেরে পুলিশ বাপকো! পুলিশ দিখলায়া! কানুন দিখলায়া! আরে হারামজাদকে বেটোয়া, এই গারুদিয়া তালুকে একজন আদমীরই কানুন চালু আছে—ও আদমী বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। কানমে ঘুষল্?'

আধা বেহুঁশ গণা কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা বোঝা যায় না। তার রক্তাক্ত ঠোঁটতুটো অল্প অল্প কাঁপে শুধু। তবে বুড়ী সৌখী জড়ানো বিকৃত গলায় অনবরত বলে যায়, 'ঘুষা হুজৌর, ঘুষা হুজৌর—'

কুশীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধর্মার মনে পড়ে যায়, ভোরবেলা হিমগিরির কথা তুলতে গণা বলেছিল, দেশে পুলিশ আছে, জজ-ম্যাজিস্টার আছে, বে-কানুনি কাম করা অত সোজা নয়। নিশ্চয়ই এসব কথা হিমগিরিকেও বলেছিল। তাই নিয়ে বড়ে সরকারের পা-চাটা এই কুত্তাটা এখন তাকে বিদ্রূপের সঙ্গে হুঁশিয়ারিও দিচ্ছে।

হিমগিরি ফের গর্জে ওঠে, 'আজ তোকে কিছুই করলাম না। আবার যদি এখান থেকে ভাগার মতলব করিস হাড্ডি বিলকুল 'চূরণ' করে বালির তলায় তোর লাস পুঁতে দেব। তোর পুলিশ বাপেরা কিছু করতে পারবে না। কানমে ঘুষল্?'

সৌখী আগের মতোই বলে যায়, 'ঘুষা হুজৌর, ঘুষা হুজৌর—'

আধবুড়ো গণেরি খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, 'ভাগবে না হুজৌর, গণা ভাগবে না—'

হিমগিরি বলে, 'আচ্ছী বাত। তুই তো এদের মাতব্বর। গণা চুহার বেটোয়াটাকে থোড়া-বহোত সমঝে দিস, এখান থেকে ভাগবার ফল ভাল হবে না। কানমে ঘুষল্?'

'হুঁ দেওতা—'

এরপর আর দাঁড়ায় না হিমগিরিনন্দন। একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত

স্থাপনের পর দলবল নিয়ে চলে যায়।

এদিকে গণেরি, মাধোলাল, নাথু, এমনি আরো জনাকয়েক গণাকে ধরাধরি করে দোসাদটোলায় তাদের ঘরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। বুড়ী সৌথী গোঙানির মতো একটানা শব্দ করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাদের পেছন পেছন যায়। বাদবাকী আর সবাইও শক্ত কাঁকুরে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কুশীর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সেই কথাটা মনে পড়ে যায় ধর্মার। গণাটা হিমগিরির হাতে ধরা পড়ল কী করে? সে কি তার হুঁশিয়ারি গ্রাহ্য করে নি? কুশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে ধর্মা বলে, 'আজ সবেরে যখন চাহাড়ে যাই তখন 'পাক্কী'তে পীপর গাছের তলায় গণার সাথ দেখা হয়েছিল।'

কুশী অবাক হয়ে বলে, 'হুঁ!'

'হুঁ।' তারপর গণার সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে সব বলে যায় ধর্মা। শুধোয়, 'ও ধরা পড়ল কী করে?'

কুশী যা উত্তর দ্যায় তা এইরকম। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে দোসাদটোলায় ফিরে চুপি চুপি বুড়ী সৌথীকে নিয়ে পালিয়ে যায় নি গণা। বরং এতকাল বাদে এসেছে বলে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে গল্পটল্প করে; মাঝখানের পুরা এক বছর কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কী কী করেছে, সে সব কথা বলে এবং গারুদিয়া তালুকে এই জানবরের জীবন থেকে পালিয়ে যাবার জন্য সবাইকে ফোঁসলায়। কিন্তু তখন সবারই ক্ষেতিতে যাবার তাড়া। তাই জমিয়ে বেশিক্ষণ গল্প করার সময় কারো ছিল না।

এদিকে সারা রাত হিমগিরির কাছে কাটিয়ে ভোর ভোর দোসাদটোলায় ফিরেই গণাকে দেখে ফের হিমগিরির কাছে ফিরে যায় নওরঙ্গী। গণাকে নিয়ে দোসাদরা এত মেতে ছিল যে তার আসা বা যাওয়া কোনটাই কেউ লক্ষ্য করে নি। সবাই যখন গণার সঙ্গে কথাটথা বলে নাস্তা সেরে বেরুতে যাবে সেই সময় হিমগিরি পোষা পহেলবানদের নিয়ে দোসাদটোলায় আসে। তখন কিন্তু গণাকে মারধোর করা হয় না। শুধু কুয়োর পাড়ে একটা মোটা সাগুয়ান গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে দু'জন পহলবানকে পাহারায় রেখে যায়। গণা তখন চেঁচাতে থাকে—সে থানায় যাবে, পুলিশের কাছে নালিশ করবে, কোমরে দড়ি পরিয়ে সবাইকে ফাটকে ঢোকাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর ক্ষেতি থেকে কামকাজ সেরে দোসাদটোলার বাসিন্দারা সন্ধ্যের মুখে মুখে যখন ফিরে এল সেইসময় আবার হানা দেয় হিমগিরি। কানুন বা পুলিশের কথা না বলে পায়ে পড়লে হিমগিরি গণাকে অত মারধোর করাত না; হয়ত ক্ষমাই করে দিত। তবে এটা মানতেই হবে, গণার বুকের ছাতিতে দুর্দান্ত সাহস; বহোত তেজ ছোকরা।

শুনতে শুনতে আগের অনেক বারের মতো আরো একবার গণার সম্পর্কে শ্রদ্ধায় ধর্মার মাথা নুয়ে পড়তে থাকে।

চোদ্দ

দেখতে দেখতে দিন কয়েক কেটে গেল। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটু ফুরসত পাওয়া যায় নি যাতে কোটরা হরিণের বাচ্চা যোগাড়ের জন্য ধর্মা জঙ্গলে যেতে পারে।

রাঁচী থেকে টিরকের আসার কথা ছিল পরশু দিন। ধর্মার পক্ষে বাঁচোয়া, সে আসেনি। হয়ত কোন কাজে আটকে গিয়ে থাকবে। তবে যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

অন্য দিনের মতো অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে পড়ল ধর্মা। সে ঠিকই করে ফেলেছে আজ আর ক্ষেতিতে লাঙল ঠেলতে যাবে না। মাঠকুড়ানি জঙ্গল-কুড়ানিদের সঙ্গে মাড়ভাত্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়বে। দক্ষিণ কোয়েলের শুখা খাতের ওধারে সেই জঙ্গলটায় গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবে—কোটরার বাচ্চা জোটাতে পারে কিনা। যদি দুপুরের মধ্যেও জোগাড় করা যায়, বিকেলে টিরকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। টিরকের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে।

ক্ষেতিতে না যাবার ব্যাপারটা কুশীকে আগে জানায় নি ধর্মা। কুয়োয় নাহানা সেরে মাড়ভাত্তা খেয়ে সবাই যখন দোসাদটোলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে তখন সে কুশীকে বলল, 'আমি আজ ক্ষেতিতে যাব না।'

কুশী জিজ্ঞেস করে, 'কায় ?'

কাঁধে করে একটা টাঙ্গি নিয়ে এসেছিল ধর্মা। সেটা নামিয়ে কুশীর সামনে ঘুরিয়ে বলে, 'এটা দেখলি তো ? আজ আমি জঙ্গলে যাব।'

হঠাৎ টিরকের কথা মনে পড়ে কুশীর। সে বলে, 'কোটরার তালাসে ?'

'হঁ। পরশু টিরকের আসার কথা ছিল। আসে নি। আজ এলে দাঁড়াতে বলবি।'

'ঠিক ছ্যায়। বেশি দেরি করিস না।'

'নায়।'

'বগুলা ভকত তোর কথা পুছলে কী বলব ?'

'বলবি বুখার হয়েছে।' বলে একটু থেমে ফের শুরু করে ধর্মা, 'আজ তুই গণেরিচাচার সাথ কাম করিস।'

কুশী মাথা নাড়ে, 'হঁ।'

দোসাদটোলার বাইরে শক্ত কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে খানিকটা যাবার পর কুশীরা বাঁ দিকে পাকা সড়কে গিয়ে ওঠে আর মাঠ-কুড়ানিদের সঙ্গে ডান দিকে হাঁটতে থাকে ধর্মা। সে যে দলটার সঙ্গে যায় তাতে তার এবং কুশীর মা-বাপেরাও রয়েছে। আর রয়েছে দোসাদটোলার অগুনতি বাচ্চাকাচ্চা। দলের প্রায় সবার মাথাতেই একটা করে মেটে হাঁড়ি। কোয়েলের বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খাবার জল বার করে আনবে।

ধর্মারা যখন নদীর শুখা খাতের মাঝামাঝি চলে আসে সেই সময় দেখা যায় জষ্ঠি মাসের সূর্য পুবের আকাশে মাথা তুলতে শুরু করেছে। এই সকালবেলাতেই তার রঙ গনগনে আগুনের মতো। দিনের প্রথম রোদ পড়ে লক্ষ কোটি সোনার দানার মতো কোয়েলের মরা খাতের বালি ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। বাতাস গরম হচ্ছে ক্রমশ।

এখান থেকে রাঁচী আর পাটনাগামী পাকা সড়কের দু পাশে গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের শস্যক্ষেতগুলো ধু-ধু দেখায়।

মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশী শুগা বাতাসে ভেসে চলেছে। এই গরমের সময়টা কোথেকে যেন শুগার ঝাঁক এদিকে চলে আসে। শুগা ছাড়া কচিৎ দু-একটা চোটা আর পেরোয়া চোখে পড়ে।

আকাশ এখন গাঢ় নীল, মাঝে মাঝে তুলোর পাহাড়ের মতো সফেদ মেঘ। রোদ লেগে মেঘের কানাতে সোনার ঝিলিক লাগে।

পাখি আকাশ মেঘ—কোন দিকেই নজর নেই ধর্মার। এক-জোড়া কোটরার বাচ্চা জঙ্গল থেকে তাকে ধরে আনতেই হবে।

বাচ্চা দুটোর দাম নগদ বিশ রুপাইয়া। বিশটা টাকা মানে স্বাধীন জীবনের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া। কীভাবে কোটরার বাচ্চা খুঁজে বার করবে, ভাবতে ভাবতে বালিতে পা গেঁথে গেঁথে এগুতে থাকে ধর্মা।

একসময় সবাই সেই সাবুই ঘাসের জঙ্গলটার কাছাকাছি চলে আসে। এখানেই রোজ ধর্মা আর কুশী বগেড়ির জন্য ফাঁদ পেতে রেখে যায়।

সাবুই ঘাসের ঘন ঝোপটার পর রশিভর গেলেই দক্ষিণ কোয়েলের শুখা খাতের দুধারে পাতলা জঙ্গল আর আছে ঘাসেভরা অনেকটা মাঠ। এখানে বিজুরি আর গারুদিয়া তালুকের গৈয়া আর বকরি চরানিরা তাদের জন্তুগুলোকে খাওয়াতে নিয়ে আসে। কিন্তু এবার চৈত্র মাস থেকে আকাশে না একফোঁটা মেঘ, না ঝরছে এক বুঁদ বারিষ। মাঠে যেটুকু ঘাস ছিল চোত পেরিয়ে বৈশাখের পাঁচ সাতটা দিনও কেটেছে কিনা সন্দেহ; তার আগেই প্রায় খতম হয়ে গেছে। বাদবাকী যা আছে তা গনগনে রোদের তাতে জ্বলে হেজে হলদে মরকুটে হয়ে উঠেছে। গরু ছাগলে তা ছুঁয়েও ছাখে না। কাজেই আজকাল বকরিচরানি আর গৈয়াচরানিরা এদিকে বড় একটা আসে না।

ধর্মার সঙ্গে দোসাদটোলা থেকে যারা এসেছিল তাদের জনাকতক মেয়ে পুরুষ আর সবগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে কোয়েলের বালির ডাঙা খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করার জন্য বসে গেল। এক হাঁড়ি জল যোগাড় করার পর তারা জঙ্গলে আসবে সুথনি রামদানা বা অন্য কোন কন্দ অথবা ফল ফলারির খোঁজে। তবে বেশির ভাগই জঙ্গলে যাবার জন্য ধর্মার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জঙ্গল থেকে কিছু খাদ্য জুটিয়ে এনে তারা বালি খুঁড়ে জল বার করতে আসবে।

সাবুই ঘাসের ঝোপগুলো থেকে আরো দু রশি যাবার পর ওরা জঙ্গলের মুখে এসে পড়ে।

এখানে বন ঘন নয়; বেশ ছাড়া ছাড়া। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে কড়াইয়া, পরাস, সিমার, সাগুয়ান আর কাঁটাওলা পুটুস গাছের ঝাড়। এই জষ্ঠি মাসে পরাস আর সিমার গাছগুলোর ডালে থোকা থোকা আগুনের মতো ফুল ফুটে আছে। তবে খুব বেশি করে যা নজরে পড়ে তা হলো মহুয়া। ফুল আর ফলের খুসবুতে বাতাস এখানে

ভারী হয়ে আছে।

ধর্মার সাথীরা এই পাতলা জঙ্গল থেকেই খাদ্যটাদ্য সংগ্রহ করবে। কিন্তু ধর্মা যাবে আরো তিন রশি—জঙ্গল ক্রমশ ঘন হতে হতে যেখানে চাপ বেঁধে আছে সেইখানে। কোটরা হরিণ সেখানে না গেলে মিলবে না।

কিন্তু জঙ্গলের এই মুখটায় এসেই ধর্মারা থমকে গেল। ঘাস ফুরোবার পরে এখানে গৈয়া বা বকরিচরানিরা আর আসে না। জঙ্গল ফাঁকা পড়েই থাকে। কিন্তু আজ হাট্টাকাট্টা চেহারার অনেকগুলো লোককে দেখা গেল। তারা মহুয়ার ফল পেড়ে পেড়ে ঢাউস বাঁশের ঝোড়া বোঝাই করছে। লোকগুলোকে ধর্মারা চেনে।

গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকে রঘুনাথ সিং এবং মিশির-লালজীকে বাদ দিলে আরো জনকয়েক পয়সাওলা লোক রয়েছে। রঘুনাথদের তুলনায় তারা অবশ্য কিছুই না। রঘুনাথদের মতো অত বিপুল জমিজমা বা ক্ষেতখামারও তাদের নেই। এ অঞ্চলের তাবত চাষের জমি ওঁরা দু'জনেই পুরুষানুক্রমে দখল করে রেখেছেন। বাকি যেটুকু ছিটেফোঁটা রয়েছে তা পড়েছে ঐ ক'জন ভাগ্যবানের ভাগে। জমিজমা না থাকলেও এদের আছে সুন্দর কারবার, গারুদিয়া আর বিজুরির বাজার-গঞ্জে বড় বড় আড়ত, দোকান, ভাড়ায় খাটানোর জন্য গৈয়া আর ভয়সা গাড়ি, লরি, সাইকেল রিকশা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে পাল পাল গরু মোষ এবং ছাগল। যে লোকগুলো মহুয়া পাড়ছে তারা ঐ সব পয়সাওলা আদমীদের বকরিচরানি গাইচরানি মোষচরানির দল।

বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই কচু, সুথনি, মেটে আলু ইত্যাদি খাওয়ার যোগ্য যাবতীয় জিনিসই সাবাড় হয়ে আসছিল। এই গরমের সময়টা বড় কষ্ট এদিকের মানুষের। এখন না মেলে জল, না মেলে খাদ্য। কচু কন্দের টান পড়তে কিছুদিন ধরেই ধর্মার মা-বাপ থেকে শুরু করে দোসাদটোলার বাতিল মানুষেরা মহুয়ার ফল নিয়ে যাচ্ছিল। পেট তো কোন কথা শোনে না। অন্য বঢ়িয়া খাদ্য না পেলে মহুয়ার ফলই সই। দু-একটা মাস এই মহুয়ার ফল তাদের বাঁচিয়ে রাখে। বেশ কয়েক বছর ধরে এরকম চলছে। সে যাই হোক, ধর্মারা কিন্তু আগে আর কোনদিন গাইচরানি বকরিচরানিদের এভাবে মহুয়ার ফল পেড়ে নিয়ে যেতে ছাখে নি।

ধর্মার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দোসাদটোলার অন্য সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এইভাবে পয়সাওলা আদমীদের লোকেরা যদি তাদের মতো গরীব না-খাওয়া মানুষের খাদ্যে হাত বাড়ায় তা হলে বড়ই বিপদ; বিলকুল ভুখা মরে যেতে হবে তাদের। কী যে করবে, ভেবে উঠতে পারছিল না ওরা।

হঠাৎ পেছন দিকে বহু লোকের পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরাল ধর্মারা। শ দেড় দুই আদিবাসী মুণ্ডা ওরাঁও আর সাঁওতাল বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে আসছে। হাড্ডিসার ক্ষুধার্ত চেহারা; চোখ এক আঙুল করে গর্তে ঢুকে গেছে। পরনে ময়লা চিটচিটে টেনি। মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগই কোমরে একটি করে বাচ্চা ঝুলছে। মায়েদের মরুভূমির মতো ধু-ধু নির্জলা বুকের বোঁটায় চোঁ চোঁ করে দু-একটা টান দিয়েই তারা চিৎকার করে উঠছে। না-না, কিছুই নেই সেখানে। দেখেই টের পাওয়া যায়, দু-তিন দিন ওদের কারো খাওয়া হয় নি।

ওরাঁও মুণ্ডারা ধর্মাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল। ধর্মারা কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ক্ষুধার্ত আধন্যাংটো মানুষগুলোকে দেখে। আগে আর কখনও আদিবাসী ওরাঁওদের দক্ষিণ কোয়েলের এদিকটায় আসতে দেখা যায় নি। দোসাদটোলার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন ধর্মা শুধোয়, 'কা বাত? তোরা কোথাকার আদমী?'

আদিবাসীদের ভেতর থেকে একটা বুড়ো ওরাঁও বেরিয়ে এসে আঙুল বাড়িয়ে খাড়া পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বলে, 'উহাকা—'

'এখানে তো কোনদিন তোদের দেখিনি—'

'নায়। এই পয়লা এলাম।'

'কা বাত?'

নিজের গর্তে ঢুকে যাওয়া চিমড়ে পেট দেখিয়ে ওরাঁওটা বলে, 'ইসকে বাস্তে—'

ধর্মা পুরোটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে।

বুড়ো ওরাঁও ফের বলে, 'আমাদের ওদিকে কিছু নেই—নায় চাওর (চাল), নায় গেঁহু, নায় রামদানা, নায় মাড়োয়া, নায় মকাই —কুছ নায়। জঙ্গলের গাছপাতাও পুরা খতম। পরশু শুনলাম, এখানকার জঙ্গলে কিছু মিলবে। কমসে কম মৌয়াকে (মহুয়া) ফল। শুনেই গাঁও ফেলে সব বেরিয়ে পড়েছি। কিছু না পেলে ভুখা

মর যায়েগা।'

ধর্মা খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা অর্থাৎ অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরাও ভুখা-নাঙ্গা আদমী। কিন্তু এমন ভয়াবহ দুর্দশার কথা যেন ভাবা যায় না। অবশ্য সেদিন চাহাড়ের হাটে মরসুমী ক্ষেতমজুর আনতে গিয়ে আদিবাসীদের কাছে কিছু কিছু শুনেছিল। উত্তর না দিয়ে আঙুল দিয়ে জঙ্গলের দিকটা দেখায় সে। ওখানে এখনও মহুয়ার ফল পাড়া চলছে।

বুড়ো ওরাঁও এবং তার সঙ্গীরা দৃশ্যটা দেখার পর ভয়ানক হতাশ হয়ে যায়। হাপরের মতো জোরে শ্বাস ফেলে বালির ওপর সে বসে পড়ে। বলে, 'মর যায়েগা, হামনিলোগ জরুর ভুখা মর যায়েগা।'

ধর্মা আর দাঁড়ায় না। পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভেতর যেখানে মহুয়ার ফল পাড়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। এই লোকগুলো তো পয়সাওলা আদমীদের গাই বকরি চরায় এবং দু বেলা ভরপেট খেতে পায়। তা হলে গরীবের খাদ্য মহুয়ার ফল পাড়ছে কেন? অনেকক্ষণ থেকেই জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল ধর্মার। সে শুধোয়, 'কা ভেইয়া, মৌয়ার ফল নিচ্ছ কেন?'

বড়ে আদমীদের গাই বকরি চরানিদের মেজাজই আলাদা। প্রথমটা তারা ধর্মার কথার উত্তর দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করে না। অনেক বার ঘ্যান ঘ্যান করার পর একজন রুক্ষ গলায় বলে, 'গাই বকরির জন্যে।'

'গাই-বকরি মৌয়া দিয়ে কী করবে?'

'কী আবার করবে? খাবে।'

'মৌয়া খাবে?'

'না তো কী? দশ বিশ মিলের (মাইলের) মধ্যে কোথাও ঘাসপাতা আছে? সব জ্বলে গেছে। জানবরগুলো কি ভুখা মরবে?'

জানবারের চাইতে মানুষের বেঁচে থাকাটা অনেক বেশি জরুরী, এই কথাটা বলতে গিয়েও বলা হয় না ধর্মার। দক্ষিণ কোয়েলের পার ধরে মাইলের পর মাইল এই জঙ্গলের মালিক কে, সে জানে না। তবে তার মনে হয় বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের পায়ে পড়লে কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। তাঁকে জানাতে হবে এই শুখা মরসুমে প্রচণ্ড কষ্টের দিনগুলোতে গাই বকরি চরানিরা যেন মহুয়া ফলের দিকে হাত না বাড়ায়, ওগুলো যেন গরীব ভুখা মানুষদের জন্যই থাকে।

রঘুনাথ সিং বলে দিলে কারো ক্ষমতা নেই গাই-বকরির জন্য জঙ্গলে যায়। রঘুনাথ সম্পর্কে এই কথাটা যে ধর্মা ভাবতে পারল তার কারণ একটাই। তা হল সেদিনকার সেই লাড্ডু বিতরণ। মাস্টারজীর কথায় ভোটকা ভোজ। যে মানুষ এত আদর করে নিজের হাতে তাদের মতো অচ্ছুৎদের মিঠাইয়া বেঁটে দিয়েছেন তিনি কি আর গরীব লোকদের না খেয়ে মরতে দেবেন! কিন্তু তাঁকে গিয়ে ধরবে কে? ধর্মা ভাবল, পরে এ নিয়ে গণেরিদের সঙ্গে কথা বলে দেখবে।

এধারে মহুয়ার ফলে বারো চোদ্দটা ঝোড়া বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। গাই বকরি চরানিরা সেগুলো মাথায় চাপিয়ে চলে গেল।

ধর্মা জানে, জঙ্গলের সামনের দিকে খুব বেশি মহুয়ার গাছ নেই। তবে একটু ভেতর দিকে গেলে অগুনতি রয়েছে। কিন্তু গাই-ছাগলের জন্য অনবরত মহুয়া ফল নিয়ে গেলে ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণ। কিন্তু এসব পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে। এখন আর দেরি করার উপায় নেই। বেলা চড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে তিন রশি রাস্তা ভেঙে গভীর জঙ্গলে ঢুকে কোটরার বাচ্চার খোঁজ করতে কতটা সময় লাগবে, কে জানে। রাঁচী থেকে টিরকে এসে যেতে পারে। বিকেলের মধ্যেই জঙ্গল থেকে তার ফিরে যাওয়া দরকার।

পেছন ফিরে সে দোসাদটোলার লোকজনকে আর আদিবাসী ওরাঁও-মুণ্ডাদের ডাকে, 'আও আও—'

কুশী আর তার চার বাপ-মা এবং ওরাঁও-মুণ্ডারা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। ধর্মা তাদের জানায় জঙ্গলের ভেতর খানিকটা গেলে আর অজস্র মহুয়া গাছ আছে। তারা যেন সেখানে যায়।

সেই বুড়ো ওরাঁওটা, যে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার গর্তে ঢোকা চোখ ঝকমকাতে থাকে। সে বলে, 'তুমি আমাদের বাঁচালে।' তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাত নাড়তে থাকে, 'আ যা—'

রশিখানেক যাবার পর চাপ-বাঁধা মহুয়ার বন দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে সবাইকে রেখে এগিয়ে যেতে থাকে ধর্মা। পেছন থেকে তার এবং কুশীর চার মা-বাপ সাবধান করে দেয়, 'জঙ্গলে হোঁশিয়ার থাকবি।'

ধর্মা বনভূমির বেলেমাটির ওপর দিয়ে বড় বড় পা ফেলতে ফেলতে বলে, 'হুঁ—'

'হাড়চেঁবুয়া হ্যায়—'
'জানি।'
'শের হ্যায়—'
'জানি।'
'সাঁপ হ্যায়—'
'জানি।'
'ভালু (ভালুক) হ্যায়—'
'জানি।'
'বহোত বদমাস জাদবার ভি হ্যায়—'
'জানি।'

চার বুড়োবুড়ির গলার স্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে পেছনে মিলিয়ে যায়।

পনেরো

ঘন জঙ্গলে গিয়ে ধর্মা যখন পৌঁছায়, তখন প্রায় দুপুর। কিন্তু বন এখানে এত নিবিড়, মাথার ওপর ডালপালা আর পাতা এত ঘন হয়ে আছে যে জষ্ঠিমাসের গনগনে রোদ ভেতরে ঢুকতে পারেনি। চিকরিকাটা টুকরো টুকরো আলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

জঙ্গলের ভেতরটা এই আগুনঢালা গরমের সময়ও বড় ঠাণ্ডা, ছায়াচ্ছন্ন। গা একেবারে জুড়িয়ে যায় যেন। অল্প অল্প হাওয়াও বয়ে যাচ্ছে। একধারে দক্ষিণ কোয়েলের একটা আধমরা খাতও চোখে পড়ে। এই গরমের সময় জল শুকিয়ে সেটা সরু হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু জল রয়েছে তা কাচের মতো পরিষ্কার আর টলটলে। দোসাদ-টোলার লোকজন এখানে যে জল নিতে আসে না তার কারণ ভয়ঙ্কর সব জন্তুজানোয়ার—চিতা, ভাল্লুক, হাড়চেঁবুয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই জঙ্গল ধর্মার বহুকালের চেনা। এখানকার প্রতিটি গাছ লতা, ঝোপঝাড় তার মুখস্থ। এই বনভূমিতে বেশির ভাগ গাছই হল শাল, মহুয়া, সাগুয়ান, গামায়ের, কাঁটাওলা পুটুস, তেতর, আমলকি, পরাস, কেঁদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এধারে ওধারে, যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, থোকা থোকা মনরঙ্গোলি, সফেদিয়া, রাত-কি-রানী আর হলুদ রঙের চিলাম ফুলে

বনের ভেতরটা রানীর মতো সেজে আছে। মাথার ওপর রয়েছে লাল ডগডগে সিমার আর পরাস ফুল। দূর থেকে মনে হবে মাইলের পর মাইল জুড়ে বনের মাথায় আগুন ধরে আছে। মহুয়া ফুলের গন্ধে বাতাস ম ম করছে।

এতটা পথ হেঁটে আসার দরুন হাঁপ ধরে গিয়েছিল ধর্মার। কাঁধের টাঙ্গি একটা ঝাঁকড়া মাথা গামায়ের গাছের তলায় রেখে বসে পড়ল ধর্মা। খানিকক্ষণ জিরিয়ে কোটরার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে সে।

চারপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা উড়ছে; আর উড়ছে ফড়িং। গাছের পাতার ফাঁকে থেকে পরদেশী শুগা আর চোটাদের অবিশ্রান্ত কিচিরমিচির ভেসে আসছে। দূরে দূরে দু-একটা ময়ুর দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।

একসময় ধর্মা লক্ষ করে, সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। কাজেই আর বসে থাকা যায় না। টাঙ্গি ফাঙ্গি কাঁধে চাপিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পরাস সাগুয়ান সীসম ইত্যাদি গাছের পাশ দিয়ে ডান দিকে এগুতে থাকে। খানিকটা যাবার পর চোখে পড়ে একটা হড়হড়িয়া (হেলে সাপ) এঁকে বেঁকে ওধারে ঘন ঝোপটার ভেতর ঢুকে যায়।

ধর্মা ঝোপটা পেছনে ফেলে কপা গিয়েই থমকে যায় এবং চোখের পাতা পড়ার আগেই কাঁধ থেকে টাঙ্গি নামিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সামনে দশ হাত তফাতে মোটা সাগুয়ান গাছটার গা ঘেঁষে একটা হাড়চেঁবুয়া দাঁড়িয়ে ধর্মার দিকে তাকিয়ে আছে। জানবরটার ছুঁচলো মুখ। জঙ্গলের ঘন ছায়ায় সেটার চোখ আগুনের মতো জ্বলছে।

যে কোন মুহূর্তে ধর্মার ওপর জন্তুটা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। গলার ভেতর থেকে একটু পরে পরেই চাপা হিংস্র শব্দ বার করছে সেটা। মাঝে মাঝে করাতের মতো ধারাল দাঁত বার করছে।

ধর্মা তৈরি হয়েই আছে। জানবরটা ঝাঁপাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটার ঘাড়ে টাঙ্গি হাঁকিয়ে দেবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত হাড়চেঁবুয়াটা ঝাঁপালো না; পিছু হটতে হটতে আচমকা ঘুরে গেল। তারপর এক দৌড়ে কোয়েলের মরা খাতটা পেরিয়ে ওধারের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জোরে একটা শ্বাস ফেলে ধর্মা। একসময় টাঙ্গিটা হাতে ঝুলিয়েই

এগিয়ে যায়।

আরো অনেকটা সময় কেটে যায়। ধর্মা টের পায়, পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্যটা বেশ খানিকটা নেমে গেছে। চিকরিকাটা যে রোদের টুকরোগুলো বনের ভেতর এসে পড়েছে সেগুলোর রঙ হলুদ হয়ে যেতে শুরু করেছে।

হাতে আর বেশি সময় নেই। দিন থাকতে থাকতেই ধর্মাকে এই ভয়ঙ্কর বনভূমি থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে পড়তে হবে। চোখের সবটুকু জোর দিয়ে সে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে অনবরত তাকাতে থাকে। কিন্তু কোটরা হরিণেরা আজ যেন ষড়যন্ত্রই করেছে, কিছুতেই গভীর জঙ্গল থেকে বেরুবে না। শুধু কি কোটরা, সজারু, ভালুক, চিতা, লাকরা, শিয়ার, শুয়ার—কিছুই চোখে পড়ছে না।

এই জঙ্গলের হাড়হদ্দ, এখানকার জন্তু জানবর পশুপাখির স্বভাব, সব কিছুই ধর্মার জানা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। বানরদের সঙ্গে হরিণদের খুবই দোস্তি। দূরে ডোরাকাটা শের কিংবা চিতা-টিতা দেখলে গাছের মাথা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরিণদের হুঁশিয়ার করে দেয় বানরেরা। আবার গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বার করে ডেকেও আনে। হরিণরা কাছাকাছি এসে গেলেই গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে তাদের পিঠে পড়েই শিং ধরে মজাসে জঙ্গলের ভেতর ঘোড়দৌড় লাগিয়ে দেয়।

বানরের ডাক হুবহু নকল করতে পারে ধর্মা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর টাঙ্গিটা মাটিতে রেখে দু হাত মুখের দুপাশে চোঙার মতো ধরে উপ উপ করে অবিরাম ডাকতে থাকে। এভাবে আওয়াজ করতে করতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়, দম ফুরিয়ে আসে কিন্তু কোটরা দূরে থাক, অন্য জাতের সাদা সাদা ফুটকিওলা হরিণও চোখে পড়ে না।

মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ধর্মার; ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে সে। আজকের দিনটাই বেফায়দা বরবাদ হয়ে গেল।

সূর্য আরো খানিকটা পশ্চিমে নেমে গেছে। জঙ্গলের ভেতর ছায়া আরো গাঢ় হতে থাকে। সন্ধ্যে হবার আগেই এখানে অন্ধকার নেমে যাবে। তার আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত। বনভূমির সর্বত্র বিপদ ওত পেতে আছে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কখন চিতা বা লাকরা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, আগে হদিশ পাওয়া যায় না। হতাশ ক্লান্ত নিরানন্দ ধর্মা আজকের মতো কোটরার আশা ছেড়ে দেয়। তাব

মানে বিশটা টাকা পাবার কোন ভরসাই নেই। অগত্যা সে ফেরার পথ ধরে।

জঙ্গল যেখানে পাতলা হতে শুরু করেছে তার কাছাকাছি আসতেই আচমকা চোখে পড়ে তিন চারটে খেরাহা অর্থাৎ খরগোস আস্তে আস্তে একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আরেকটা ঝোপের দিকে চলেছে। ধর্মা যতদিন এই জঙ্গলে এসেছে, খালি হাতে ফেরেনি। কিছু না কিছু নিয়ে গেছে। ঠিক করে ফেলে, আজও খালি হাতে ফিরবে না।

খরগোস যখন চোখে পড়েছে তখন এই নিরীহ জানবরটাকেই মারবে। পয়সা রুপাইয়া না মিলুক, ছুটো দিন পেট ভরে মাংস তো খাওয়া যাবে। ঝড়ের বেগে টাঙ্গিটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বাগিয়ে নেয় ধর্মা। কিন্তু সন্তর্পণে পা টিপে টিপে জন্তুগুলোর দিকে এগুবার আগেই বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে একটা তীর ছুটে এসে একটা চলন্ত খরগোসকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। নিরীহ, শান্ত, তুলোর মতো নরম প্রাণীটা বার ছুই ছটফট করেই স্থির হয়ে যায়।

ধর্মা চমকে ওঠে। তীরটা কে মারতে পারে? এটুকু ভাবতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই দেখতে পায় বাকী খরগোস কটা বিজরী চমকের মতো ছুটে চলে যাচ্ছে। সে দৌড়ুবার জন্য পা বাড়ায় কিন্তু য'পা যাবার আগেই এবারও আরেকটা তীর ছুটন্ত একটা খরগোসকে বিঁধে ফেলে। অন্য খরগোসগুলোকে আর দেখা যায় না।

এমন অব্যর্থ নিশানা আগে আর চোখে পড়ে নি ধর্মার। ছুটন্ত জানবরকে বিঁধতে পারে, কে এই তীরন্দাজ? এদিকে-সেদিকে তাকাতেই সে দেখতে পায়। একটা বিরাট সাগুয়ান গাছের পেছন থেকে লোকটা বেরিয়ে আসছে। খইওড়া চামড়া, ফাটা পা, খাড়া খাড়া চুল, হলদেটে চোখ, পরনে নোংরা একটা টেনি। বয়স চল্লিশ হতে পারে, পঞ্চাশ হতে পারে, পঞ্চান্নও হতে পারে। দেখেই টের পাওয়া যায়, সে আদিবাসী মুণ্ডা। মুণ্ডাটার সারা গায়ে ছুভিক্ষের ছাপ মারা।

এই মুণ্ডাটাকে আগে আর কখনও দেখে নি ধর্মা। এমন কি ছুপুরের আগে আগে যে আদিবাসীদের জঙ্গলের মুখে সে রেখে এসেছে তাদের মধ্যেও এই লোকটা ছিল না। তা হলে এ এল কোত্থেকে?

মুণ্ডাটা তীরবেঁধা তার ছুই রক্তাক্ত শিকারের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ধর্মাকে দেখে থেমে যায়। এই জঙ্গলে ছ'নম্বর শিকারীকে সে খুব

সম্ভব আশা করে নি।

ধর্মাই পায়ে পায়ে মুণ্ডাটার দিকে এগিয়ে যায়। এই জঙ্গলে আর কেউ আসুক, সেটা সে চায় না। ভুরু কুঁচকে বেজায় বিরক্ত গলায় সে শুধোয়, 'কে তুই?'

লোকটা বলে, 'রুখিয়া মুণ্ডা।'

'তোকে তো আগে দেখি নি।'

'আমি এখানকার লোক না।'

'কোথাকার?'

রুখিয়া মুণ্ডা পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে ছায়, 'ঐখানে, দশ মিল (মাইল) পছিমে।'

ধর্মা বলে, 'এখানে এসেছিস কী করতে?'

খরগোস ছুটোকে দেখিয়ে রুখিয়া বলে, 'কী করতে এসেছি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস।'

'খেরাহা ছুটো মারলি কেন?'

'কী করি। তিন রোজ বালবাচ্চা ভুখা রয়েছে। আমাদের ওদিকে পেটে দেবার মতো দানা নেই। কামের খোঁজে বেরুলাম, কাম নেই। ভিখ মাংতে বেরুলাম, ভিখ নেই। একজনের কাছে শুনলাম, এখানকার জঙ্গলে জানবর আছে, সুথনি আছে, মিট্টি আলু আছে। রাত থাকতে থাকতে তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

দক্ষিণ থেকে এসেছে সকালের সেই আদিবাসীরা, পশ্চিম থেকে এসেছে রুখিয়া। হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে আরো অনেকে এসে পড়বে। দেখা যাচ্ছে এই জঙ্গলের অনেক দাবীদার।

প্রাণে বাঁচবার জন্য উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে। এতকাল এই গভীর জঙ্গল ছিল ধর্মার একান্ত নিজস্ব। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে একে নিয়ে কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি শুরু হয়ে যাবে, এটা জানা সত্ত্বেও রুখিয়ার ওপর তেমন ক্ষেপে উঠতে পারে না সে। উল্টে কিছুটা সহানুভূতিই বোধ করে। আহা ভুখা নাঙ্গা আদমী! সে বলে, 'ঐ খেরাহা ছুটোকে মারবার জন্যে আমি তাক করেছিলাম। তার আগেই তুই তীর বেঁধালি।'

রুখিয়া কী ভেবে বলে, 'ঠিক ছায়। তুই একটা খেরোহা নে, আমি একটা নিই।'

এই ভাগ বাটোয়ারা খারাপ লাগে না ধর্মার। কিছু না বলে সে

ঘাড় হেলিয়ে দেয়। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় তার পুরোপুরি সায় আছে।

রুখিয়া মরা খরগোসদুটোর গা থেকে ধারালো তীরের ফলা বার করে ফেলে। একটু পর দেখা যায় দু'জনে দুটো মৃত জানবর হাতে ঝুলিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে কোয়েলের শুকনো খাতে ধু-ধু বালির চড়ায় এসে দাঁড়ায়।

জায়গাটা এখন একেবারে ফাঁকা, জনশূন্য। দোসাদটোলার খারিজ· লোকজন আর দক্ষিণ থেকে আসা সেই আদিবাসীরা কেউ নেই। জঙ্গলের সামনের দিক থেকে কচু, কন্দ, মহুয়ার গোটা জোগাড় করে কখন চলে গেছে, কে জানে।

সূর্যটা এখন আরো হেলে গেছে। পশ্চিমের আকাশ গনগনে লাল ; ফিনকি দিয়ে সেখানে রক্ত ছুটছে। বেলা পড়ে এলেও রোদের তাত কিন্তু এখনও কমে নি। বালি যেন মাইলের পর মাইল জুড়ে আগুনের দানা হয়ে আছে। পা ফেললেই মনে হচ্ছে ফোস্কা পড়ে যাবে। তবে হাওয়া আছে প্রচুর ; সেটুকুই যা বাঁচোয়া।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ধর্মা বলে, 'তুহারকা নিশানা বহোত আচ্ছা। ছুটন্ত খেরাহার গায়ে তীর বেঁধালি ! এরকম বেঁধাতে আমি আগে আর কাউকে দেখিনি।'

রুখিয়া বলে, 'উড়াল পঞ্ছীকেও আমি তীর মেরে আকাশ থেকে নামাতে পারি।'

ধর্মা অবাক হয়ে যায়, 'হুঁ !'

'হুঁ রে। নিজের আঁখে দেখতে চাস ?'

ধর্মা কী উত্তর দেবে, বুঝতে পারে না।

রুখিয়া এবার জানায়, এখন থেকে প্রায় রোজই সে এই জঙ্গলে আসবে। ধর্মাও যদি আসে তীর বিঁধিয়ে আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখি নামিয়ে দেখাবে।

ধর্মা এবারও কিছু বলে না। রুখিয়ার পাশাপাশি বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে সে। রুখিয়ার তীরন্দাজি এতক্ষণ তাকে যেন যাদু করে রেখেছিল। ওদিকে টিরকে এসেছে কিনা কে জানে। সূরয ডোবার আগেই ক্ষেতিতে পৌঁছে যাওয়া চাই তার। সে লম্বা লম্বা পা ফেলতে শুরু করে। দেখাদেখি রুখিয়াও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। একসময় সে বলে, 'তোদের এদিকে আজই পয়লা এলাম।'

অন্যমনস্কর মতো উত্তর দেয় ধর্মা, 'হুঁ।'

'ঐ জঙ্গলটায় অনেক জানবর আর পঞ্ছী আছে—না?'

'হুঁ।'

'বরা?'

'হুঁ।'

'হীরণ?'

'হুঁ।'

'কোটরা?'

'হুঁ।'

'তেতর?'

'ও ভী—'

'হরমদেওর কিরপা। বালবাচ্চা তা হলে ভুখা মরবে না।'

ধর্মা উত্তর দেয় না।

রুখিয়া থামে নি। সে বলতে থাকে, 'কাল থেকে রোজ তোদের এই জঙ্গলে আসব।'

এই কথাটা আগেও একবার জানিয়েছে রুখিয়া। ধর্মা এবারও জবাব দেয় না। হাঁটার গতিটা শুধু আরো বাড়িয়ে দেয়।

সেই সাবুই ঘাসের ঝাড়গুলো পেরিয়ে রশি খানেক যাবার পর রুখিয়া বলে, 'আমি এবার বাঁয়ে যাব।'

ধর্মা মাথা কাত করে, 'ঠিক হ্যায়।'

'জঙ্গলে তুই রোজ আসিস?'

'নায়; কভী কভী।'

'এলে দেখা হবে।'

রুখিয়া মুণ্ডা হাতে খরগোস ঝুলিয়ে কোয়েলের মরা খাতের বালি পেরিয়ে বাঁ দিকের উঁচু পাড়ে ওঠে। তারপর বড় বড় পা ফেলে খাড়া পশ্চিমে হাঁটতে থাকে। তার কাঁধে তীরের শানানো ফলাগুলো শেষবেলার রোদে অনবরত ঝলকাতে থাকে। একসময় গাছপালা এবং একটা মাঝারি টিলার আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আকাশে যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সূর্যটা একসময় সেখানে আধাআধি ডুবে যায়। বাকি অর্ধেক ওপরে মাথা তুলে থাকে। ঠিক সেই সময় ধর্মা এসে পাক্কীতে ওঠে। দ্যাখে বাস

'ইস্ট্যাণ্ডে' পীপর গাছের তলায় টিরকে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মাকে দেখে সে কাছে এগিয়ে আসে এবং তার হাতে ঝুলন্ত খরগোসটা দেখে বলে, 'কা বাত! তোকে জ্যান্ত কোটরার বাচ্চার 'অডার' দিলাম। আর তুই নিয়ে এলি কিনা মুর্দা খেরাহা!'

ধর্মা বলে, 'খেরাহা তোর জন্যে না।' একটু থেমে শুধোয়, রাঁচী থেকে কখন এসেছিস?'

'তুফারে (তুপুরে)। এখন সূরয ডুবতে চলল। ক্ষেতিতে যেতে কুশী বলল, তুই জঙ্গলে গেছিস। জঙ্গল থেকে এখান দিয়ে তো লোটতে হবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি। সোচলাম, কোটরা জরুর পেয়ে যাব। তার বদলে নিয়ে এলি মরা খেরাহা।'

'বহোত চেষ্টা কিয়া; কোটরা নায় মিলল। কা করে—'

একটু ভেবে টিরকে বলে, 'আমরিকী সাব আজ রাতে চলে যাবে। ফির আসবে এক মাহিনা বাদ। তখন কোটরা জুটিয়ে দিতে পারবি?'

ধর্মা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'হঁ, জরুর।'

তার উৎসাহকে উস্‌কে দেবার জন্য হাফ প্যান্টের পকেট থেকে তুটো দশ টাকার নোট বের করে দিতে দিতে টিরকে বলে, 'এই নে। পুরাটাই 'ইডভান্স' করে দিলাম।'

টিরকের কথা শেষ হতে না হতেই রাঁচীর বাস এসে যায়। লাফিয়ে উঠতে উঠতে সে বলে, 'আমি আজ চলি। কোটরার কথা ভুলে যাস না।'

'নায় নায়।' হাতে একমাস সময় পেয়ে ধর্মা খুশীই হয়েছে। কোটরার বাবদে বিশটা টাকার আশা সে ছেড়েই দিয়েছিল। আচমকা অপ্রত্যাশিত সেই টাকাটা পেয়ে তার উৎসাহ উদ্যম দশগুণ বেড়ে গেছে। এর ভিতর কোটরার বাচ্চা সে যোগাড় করে ফেলবেই।

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই রাঁচীর বাস ছেড়ে দেয়। টাকাটা প্যান্টের কোমরে যেখানে দড়ি ঢোকানো থাকে সেই ফোকরে পুরতে পুরতে সোজা হাইওয়ে বরাবর পুব দিকে হাঁটতে থাকে ধর্মা। খানিকটা যাবার পর তার চোখে পড়ে, সকালবেলার সেই আদিবাসীগুলো সড়কের ধারের পড়তি জমিতে চুল্‌হা ধরিয়ে রান্না চড়িয়েছে। জঙ্গল থেকে শাকপাতা মহুয়ার ফল যা যোগাড় করেছিল, খুব সম্ভব সে সব সেদ্ধ করে নিচ্ছে। তাদের মধ্যে সেই বুড়ো ওরাঁওটাকেও দেখা যায়। ধর্মা চেঁচিয়ে বলে, 'তোরা এখানেই থেকে যাবি নাকি?'

বুড়ো ওরাঁও বলে, 'যদ্দিন মৌয়ার দানা আর শাকপাতা মিলবে তদ্দিন থেকে যাব।'

ধর্মা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চিৎকার শোনা গেল।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

সেই চেনা জীপ গাড়িটা হাইওয়েতে লাল ধুলো উড়িয়ে রঘুনাথ সিংয়ের বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। অর্থাৎ চুনাওর পরব সমানে চলছে।

সামনের বাঁকে জীপটা অদৃশ্য হবার পর কোণাকুণি শস্যের ক্ষেতগুলোর দিক তাকায় ধর্মা। না, কেউ নেই ওখানে। ফসলের বিশাল মাঠ এখন একেবারেই জনশূন্য। সারাদিন কাজের পর দোসাদটোলার খরিদী কিষাণরা হাল-বয়েল নিয়ে ফিরে গেছে।

ধর্মা আর দাঁড়ায় না; হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

ষোল

আকাশের কোথাও সূর্যটাকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন মুহ্ আন্ধেরা অর্থাৎ সন্ধ্যে নেমে এসেছে।

ধর্মা ডাইনে-বাঁয়ে কোনদিকে না গিয়ে সিধা দোসাদটোলায় ফিরে এল। এর মধ্যে জমির কাজ চুকিয়ে হাল-বয়েল রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে জমা দিয়ে ভূমিদাসেরা ফিরে এসেছে। ঘরে ঘরে মিট্টি তেলের ডিবিয়া জ্বলে উঠেছে।

নিজেদের ঘরে এসে ধর্মা খরগোসটা বারান্দায় রাখতেই তার মায়ের চোখ চকচকিয়ে উঠল। খুশিতে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে সে, 'খেরাহা মেরে এনেছিস!'

'হুঁ। জঙ্গলমে মিলল।' বলে ঘাড় গুঁজে সুড়ঙ্গের মতো ছোট দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল ধর্মা। টাঙ্গিটা জায়গা মতো রেখে আবার বারান্দায় ফিরে এল। লক্ষ্য করল, বাপ শিউলাল কোথাও নেই। এমনটা কচিৎ কখনও হয় কিনা সন্দেহ। সারাক্ষণ মা আর বাপ

কাছাকাছিই থাকে। যখন খাদ্য আর জলের জন্য যায়, একসঙ্গেই যায়। ঘরে এসে চুল্‌হা ধরিয়ে মা রসুই করতে বসলে বাপ বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে থাকে। আজই শুধু ব্যতিক্রম। ধর্মা শুধোয়, 'বাপ কঁহা ?'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় ধর্মার মায়ের। সে ব্যস্তভাবে জানায় গণেরির ঘরের সামনে দোসাদটোলার পুরুষেরা গিয়ে জমা হয়েছে। গণেরি বলে গেছে, ধর্মা এলেই যেন তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ধর্মা শুধোয়, 'কায় ?'

তার মা বলে, 'মালুম নহী। যা, তুরন্ত চলা যা—'

ধর্মার গলার আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে কুশী বেরিয়ে আসে। খরগোস দেখে সে-ও রীতিমত উত্তেজিত এবং খুশী হয়। কেননা মাংসের ভাগ তারাও পাবে। দু ঘরে যারই ভাল রান্নাবান্না হয় আরেক ঘর তার ভাগ পায়।

খরগোসটা কী করে পেল, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে কুশী বলে, 'টিরকে এসেছিল।'

ধর্মা জানায়, 'দেখা হয়েছে।'

'কোটরার বাচ্চা দিয়েছিস ?'

'মিলল নায়।'

কথা বলতে বলতে ঘরের দাওয়া থেকে নীচে নামে ধর্মা।

কুশী বলে, 'জঙ্গলে বেফায়দাই গেলি।'

'হুঁ। একটা রোজ বরবাদ।' বলে গণেরির ঘরের দিকে পা বাড়ায় ধর্মা।

পেছন থেকে কুশী বলে, 'বগুলা ভকত ক্ষেতিতে গিয়েছিল; তুহারকা বাত পুছল।'

'কী বলেছিস তাকে ?'

'তুহারকে বুখার ভৈল।'

'বগুলা ভকত কী বলল ?'

'কুছ নায়।'

ধর্মা চলার গতি বাড়িয়ে দেয় এবং দোসাদটোলার মাঝামাঝি গণেরির ঘরের কাছে এসে পড়ে।

গণেরির ঘরের সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে গোল

হয়ে বসে আছে দোসাদটোলার তাবত মরদেরা। মধ্যিখানে একটা কেরোসিনের মশাল জ্বলছে। তাদের মধ্যে রঘুনাথ সিংয়ের খরিদী ভূমিদাসরা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে খারিজ হয়ে যাওয়া মানুষগুলো। তা ছাড়া মাঙ্গীলাল ফাগুরামের মতো স্বাধীন মানুষও রয়েছে। জটলার একধারে রুক্ষ এবড়ো-খেবড়ো পাথরে-কাটা মূর্তির মতো বসে আছে গণেরি। সে এই দোসাদ সমাজের মাতব্বর। হাওয়ায় মশালটা অল্প অল্প কাঁপছিল। তার আলো সবার মুখের ওপর দুলে দুলে যাচ্ছে।

গণেরিই প্রথম ধর্মাকে দেখতে পায়। সে ডাকে, 'আয় ধর্মা, বৈঠ হিঁয়া—' নিজের পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সে।

বসতে বসতে ধর্মা শুধোয়, 'কা হুয়া? ডেকেছ কেন গণেরিচাচা?'

'জরুরী কথা আছে।'

'কী?'

কেশে গলাটা সাফ করে নেয় গণেরি। তারপর গম্ভীর মুখে শুরু করে, 'এই সাল বহোত খতারনাক খরা চলছে। এমন খরা বিশ-পঁচাশ সালের মধ্যে কেউ কখনও দ্যাখে নি। রওদের তেজে ক্ষেতি জমি ফেটে গেছে, নদী শুকিয়ে সিরেফ বালি। নায় পীনেকো পানি, নায় খানেকো দানা। আমাদের দোসাদটোলায় যারা বড়ে সরকারের ক্ষেতিতে মিট্টি চষতে যায় না, এই শুখায় এক দোঠো মাহিনা তাদের ভরসা হল জঙ্গলের মৌয়া ফল। লেকেন এহী সাল পাইসাবালা বড়ে আদমীদের লোকেরা এসে গা‥ বকরাদের খিলাবার জন্যে সেই ফল নিয়ে যাচ্ছে। এমন কি বড়ে ‥ারের গাই বকরি চরানিরাও এদের মধ্যে আছে। রোজ যদি এভা‥ ‥য়া নিয়ে যায় আমাদের মতো গরীব বাঁচবে না।' একদমে কথাগুলো বলে একটু থামে গণেরি।

ধর্মা বুঝতে পারে দোসাদটোলার খারিজ মানুষগুলো গণেরির কাছে গাইবকরি চরানীদের মহুয়া নিয়ে যাবার কথা বলেছে। সেই কারণেই আজ এই জরুরী 'মীটিন'। 'মীটিন' শব্দটা চুনাওর দৌলতে এ অঞ্চলের ছেলেবুড়ো, মেয়ে পুরুষ, জলচল, অচ্ছুৎ, সবারই জানা। ভোটের বাবুরা দো-চার সাল বাদে বাদে এখানে 'মীটিন' বসায়। যাই হোক, ধর্মা বলে, 'হামনি আজ নিজের আঁখে দেখেছি গাইবকরি চরানিরা মৌয়া নিয়ে যাচ্ছে। লেকেন এ 'মীটিন' কীসের জন্যে?'

গণেরি বলে, 'তুই আসার আগে আমরা ঠিক করেছি সবাই বড়ে

সরকারের কাছে যাব।'

'কায়?'

'জানবরদের জন্যে মৌয়া নেওয়াটা রুখতেই হবে। বড়ে সরকারের পা ধরে বলব, গরীবে মা-বাপ, আপনি আমাদের বাঁচান।'

ভিড়ের ভেতর থেকে নাথু বলে ওঠে, 'মালিক কি শুনবে? তারও তো কত ভায়েস, গৈয়া, বকরি—'

গণেরি বলে, 'শুনবে রে নাথুয়া, জরুর শুনবে। এহী সাল আমাদের কথা বড়ে সরকারকে শুনতেই হবে।'

ধর্মা অবাক হয়ে যায়, 'কায়?'

'এহী সাল চুনাও। আমাদের বোট পেতে হবে না মালিককে?'

ধর্মা এবং জটলার প্রতিটি মানুষ অভিজ্ঞ বহুদর্শী গণেরির কথায় চমৎকৃত হয়ে যায়। ঠিকই বলেছে গণেরি। এই ভোটের সময়টা রঘুনাথ সিং নিশ্চয়ই তাদের খুশী রাখবেন। নিজের হাতে তাদের মতো অচ্ছুৎ জনমদাসদের দামী উৎকৃষ্ট ভয়সা ঘিয়ের লাড্ডু যখন বেঁটে দিয়েছেন তখন মহুয়া ফলের আর্জিটাও মঞ্জুর করে দেবেন। আর তিনি বললে গারুদিয়া-বিজুরির অন্য পয়সাওলা আদমীরাও মহুয়ার ফলের জন্য জঙ্গলে লোক পাঠাবে না। চারদিকে এত নজর আছে বলেই না গণেরি তাদের মাতব্বর।

গণেরি ফের বলে, 'আজ এখনই আমরা বড়ে সরকারের কোঠিতে যাব। তা হলে কাল থেকে গাই-বকরি চরানিদের জঙ্গলে যাওয়া রোখা যাবে।'

গণেরির কথায় কেউ কখনও 'না' বলে না। তা ছাড়া মহুয়া-ফলের সঙ্গে দোসাদদের বাঁচা মরার ব্যাপার জড়িয়ে আছে। সবাই যখন উঠতে যাবে সেই সময় দূর থেকে রামলছমনের গলা শোনা গেল, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। হা রে ফাগুয়া—ফাগুরাম হো, টোলাতে আছিস?'

কখনও কোন কারণেই রঘুনাথ সিং বা তাঁর পা-চাটা কুত্তারা ফাগুরামের খোঁজ করে না। তার বাপ ভিগুরাম ছিল এক পুরুষের বেগার দেওয়া কিষাণ। ভিগুরাম মরল, সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেরও মুক্তি ঘটে গেল। বিশ তিরিশ সালের ভেতর রঘুনাথ সিংদের তরফ থেকে কেউ তাকে ডাকে নি। ফাগুরাম নামে যে একটা আদমী দোসাদটোলায় আছে, ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে, রঘুনাথ সিংরা

সে খবরও রাখেন না। কিন্তু হঠাৎ এই রাত্রিবেলায় উচ্চবর্ণের বামহন রামলছমনকে তারই খোঁজে অচ্ছুৎদের পাড়ায় ঢুকতে দেখে সবাই হতবাক হয়ে যায়। শুধু ফাগুরামই ভয়ে ভয়ে সাড়া দেয়, 'হাঁ হুজৌর—' বলেই উঠে দাঁড়ায়। তার ভয়ের কারণটা এইরকম। নিজের অজান্তে সে কোন অপরাধ করে ফেলেছে কিনা, কে জানে। হয়ত সেই জন্যই এই তলব।

এর মধ্যে জটলাটার কাছে এসে পড়ে রামলছমন। ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে ফাগুয়া —

'কঁহা হুজৌর ?' দম-আটকানো গলায় জানতে চায় ফাগুরাম।

'বড়ে সরকারকে হাভেলিমে। মালিক তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন। চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। চল্, জলদি কর—'

বড় সরকারের নাম শুনেই ফাগুরামের দুই পা বেজায় কাঁপতে শুরু করে। দাঁতে দাঁত লেগে যায় কেন। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে প্রাণপণে ; গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

গণেরি এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ভীত মুখে শুধোয়, 'কুছ কসুর হুয়া ফাগুয়াকে হুজৌর ?'

রামলছমন বলে, 'কুছ নায়। চলে রামসীয়া জানকীয়া। বড়ে সরকার যানে বোলা, ব্যস। এর বেশি আমি কিছু জানি না। চল্ 'ফাগোয়া, চল্—'

রঘুনাথ সিংয়ের নামে দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল ফাগুরামের। এবারে শরীরের হাড্ডি আলগা হয়ে যাবার উপক্রম। সে গণেরির একটা হাত ধরে চাপা ভয়ার্ত গলায় বলে, 'ভেইয়া, তোমরাও হামনিকো সাথ চল—' অর্থাৎ একা একা যেতে তার সাহস হচ্ছে না।

গণেরি বলে, 'আমাদের তো মৌয়া ফলের জন্যে বড়ে সরকারের কাছে যেতেই হবে।' জটলাটার দিকে চোখ বুলিয়ে তাড়া লাগায়, 'উঠে পড় সবাই—'

রামলছমন বলে, 'কা রে, পুরা দোসাদটোলা ফাগোয়ার সাথ যাবি নাকি ?'

গণেরি জানায়, তারা আগে থেকেই বড়ে সরকারের হাভেলিতে যাওয়া ঠিক করে রেখেছে।

রামলছমন শুধোয়, 'কী মতলব তোদের ?'

'বড়ে সরকারের কাছে জরুরী কাম আছে।'

রামলছমন আর কোন প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। আর দেরি করিস না,' বলেই পা বাড়িয়ে দেয়।

রামলছমনের পেছন পেছন হেঁটে দোসাদটোলার অচ্ছুতেরা যখন রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে পৌছয় তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

বাড়ির বিশাল কমপাউণ্ডে চার পাঁচটা বিজলী বাতি জ্বলছে। বাতিগুলোর এত তেজ যে একটা 'সুই' পর্যন্ত কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

রঘুনাথ সিং চৌকো চৌকো পাথর-বসানো বারান্দায় তাঁর নির্দিষ্ট ইজি চেয়ারটিতে আধশোয়ার মতো করে পড়ে আছেন। তাঁর তিন পা-চাটা কুত্তা— ডাগদরসাব, ভকিলসাব আর মুনশী আজীবচাঁদ কাছাকাছিই রয়েছে।

আচমকা রামলছমনের সঙ্গে দোসাদটোলার এতগুলো লোককে দেখে একটু অবাকই হন রঘুনাথ সিং। ভুরু টান করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসে রামলছমনকে বলেন, 'তোমাকে বললাম ফাগুরামকে ডেকে আনতে। আর তুমি পুরা দোসাদটোলাটাকেই তুলে আনলে! বুদ্ধু, নালায়েক।'

রামলছমন ভয়ে ভয়ে বলে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। আমি তো একা ফাগোয়াকে নিয়েই আসছিলাম। লেকেন ওরাও চলে এল। আপনার সাথ কী জরুরী বাত আছে।'

রঘুনাথ সিং গণেরিদের দিকে তাকিয়ে শুধোন, 'কা বাত রে গণেরি?'

দোসাদটোলার তাবত মানুষ হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রঘুনাথ সিংকে সম্মান জানায়। তারপর সবার প্রতিনিধি হিসেবে গণেরিই খানিকটা এগিয়ে যায় এবং জোড়হাতেই মহুয়াফল সম্পর্কে তার আর্জি পেশ করে।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন রঘুনাথ সিং। কী ভেবে অন্যমনস্কের মতো বলেন, 'ঠিক ছায়। গাই-বকরি চরানিরা মহুয়া আনতে যাবে না।'

দোসাদরা চমৎকৃত হয়ে যায়। গণেরি ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের ভয় এবং সংশয় ছিল, মহুয়ার ব্যাপারে তাদের আর্জি বিলকুল না-মঞ্জুর হবে। কিন্তু উল্টোটাই ঘটল। সত্যিই দূরদর্শী মানুষ

গণেরি ; জগৎ জীবন এবং মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান অঢেল। এই না হলে মাতব্বর! তার সম্বন্ধে গোটা দোসাদটোলার শ্রদ্ধা হঠাৎ দশগুণ বেড়ে যায়।

এই সময় গণেরির আরেকটা কথা মনে পড়ে যায়। সুযোগ বুঝে সে বলে, 'হুজৌর আউর একগো বাত—'

'কী?'

'আমাদের কুয়াটা বিশ সাল কাটাই হয় নি; বালিতে বুজে এসেছে। পানিকা বহোত তখলিফ। হুজৌরের যদি ওটা কাটাবার হুকুম হয়—'

'ঠিক হ্যায়। হিমগিরিকে আমি বলে দেব।'

মহুয়ার ব্যাপারে গণেরির ওপর দোসাদদের যে শ্রদ্ধা দশগুণ বেড়েছিল, এক লাফে সেটা আরো বিশ পঁচিশ গুণ বেড়ে যায়।

চুনাওর সময় কাউকে চটাবেন না রঘুনাথ সিং; যে যা চাইবে কল্পতরু হয়ে তা বিতরণ করবেন। এটা বুঝে সুযোগটাকে পুরো কাজে লাগিয়েছে গণেরি। দোসাদটোলার কীসে হিত কীসে সুখ, সর্বক্ষণ এই সবই চিন্তা করে সে। এই জন্যই তো দোসাদরা তাকে মাথায় করে রাখে।

ওদিকে রঘুনাথ সিংয়ের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মুনশী আজীবচাঁদ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে এক কাণ্ডই বাধিয়ে দেয়, 'এ দোসাদিয়া, মালিককো কিরপাসে মৌয়া পেলি, বালুকাটাই মঞ্জুর হল। রামরাজ আ গিয়া রে, রামরাজ আ গিয়া—'

কানের কাছে অনবরত এ জাতীয় ফেনানো চাটুকারিতা ভালই লাগে। তবু চোখেমুখে নকল বিরক্তি ফুটিয়ে রঘুনাথ সিং বলেন, 'আ আজীবচাঁদ, চুপ হো বাবা—।'

মালিকের কোন কথায় থামতে হয়, কোন কথা এক কানে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বার করে দিতে হয়, সে তালিম পুরোপুরিই পেয়ে গেছে আজীবচাঁদ। গলার স্বর আরো তিন পর্দা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে যায়, 'রামরাজ আ গিয়া রে, আ গিয়া রামরাজ—'

নিতান্তই হাল ছেড়ে দেবার মতো ভাব করে রঘুনাথ সিং বলেন, 'হারামজাদটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।' বলেই গণেরির দিকে ফেরেন, 'সব মঞ্জুর করে দিলাম। এবার তোরা যা। শুধু ফাগোয়া থাক। ওর সঙ্গে দরকার আছে।'

জোড়হাতে হুয়ে পড়তে পড়তে গণেরি বলে, 'হুজুরের হুকুম হো যায় তো—'

'কী?'

'আমরা থেকে যাই। ফাগোয়ার কাম হয়ে গেলে একসাথ টোলায় লৌটব। অব হুজৌরকা কিরপা—'

'ঠিক আছে। তোরা ওখানে গিয়ে বোস। ফাগোয়া খালি এখানে থাক।' রঘুনাথ সিং কমপাউণ্ডের শেষ মাথায় ওয়েলার ঘোড়ার আস্তাবলের সামনেটা গণেরিদের দেখিয়ে দেন।

ফাগুরাম বারান্দার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর গণেরিরা দূরে গিয়ে ঘাসের জমিতে বসে পড়ে।

রঘুনাথ সিং এবার ফাগুরামের দিকে তাকান। স্নেহের আরকে গলা ভিজিয়ে বলেন, 'তোর কথা সবার কাছে শুনি। আগে নৌটঙ্কীর দলে ছিলি?'

রামলছমন দোসাদটোলায় গিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের এত্তেলা দেবার পর থেকে সেই যে হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছিল ফাগুরামের, এখানে আসার পরও সেটা থামে নি। তবে রঘুনাথ সিংয়ের গলার নরম স্বর তাকে খানিকটা সাহস দেয় যেন। ফাগুরাম বলে, 'হুঁ হুজৌর।'

'সবাই বলে তোর গলা নাকি বহোত মিঠি, যাত্ব-ভরি! তোর গান শুনলে লোকে ভুলতে পারে না। লেকেন—'

বড়ে সরকারের প্রশংসার কথায় ঘাড় হুয়ে যায় ফাগুরামের। সে কিছু বলে না।

রঘুনাথ সিং ফের বলেন, 'নৌটঙ্কীর দলে থাকতে তোর নাম হয়েছিল গারুদিয়াকা কোয়েল—না রে?'

মুখ না তুলেই মাথা নাড়ে ফাগুরাম। আবছা গলায় বলে, 'জী হুজৌর। মানুষজন পেয়ার করে ঐ নাম দিয়েছিল।'

'নৌটঙ্কীর দলে এখন তো আর তুই নেই?'

'নায় হুজৌর। তিন সাল দল ছেড়ে দিয়েছি।'

'বুকের দোষ হয়েছিল বলে?'

'জী হুজৌর।'

'এখন টিসনের কাছে বসে গান গেয়ে পাইসা কামাই করিস?'

ফাগুরাম অবাক হয়ে যায়। তার মতো নগণ্য, পোকার চাইতেও অধম একটা লোক সম্পর্কে রঘুনাথ সিংয়ের মতো বড়া

আদমী কী করে এত খবর যোগাড় করেছেন, তিনিই জানেন। সে বলে, 'জী হুজৌর।'

একটু চুপচাপ। তারপর রঘুনাথ সিং বলেন, 'শুনেছি তুই নাকি গান বাঁধতে পারিস।'

লাজুক মুখে ফাগুরাম বলে, 'হুজৌরকা কিরপা। নৌটঙ্কীর দলে থাকতে গান বাঁধতে হত।'

'বহোত আচ্ছা। শোন, কাল থেকে তোকে আর টিসনে গান গেয়ে ভিখ মাংতে হবে না।'

মুখ তুলে দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকায় ফাগুরাম, 'হুজৌর ভিখ না মাংলে খাব কী? ভুখা মর যায়েগা বড়ে সরকার।'

'ভুখা তোকে মরতে হবে না। এখন থেকে তোর পেটের ভার আমার।'

'হুজৌরকা কিরপা।'

রঘুনাথ সিং একটু ভেবে বলেন, 'তোকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।'

বিনা কাজে নিতান্ত দয়াপরবশ এত সাল বাদে খোঁজখবর করে তার যাবতীয় দায় দায়িত্ব কাঁধে নেবেন, এতটা মহানুভব নিশ্চয়ই রঘুনাথ সিং নন। ফাগুরাম তাঁর আদেশের জন্য দম-আটকানো মানুষের মতো অপেক্ষা করতে থাকে।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'চুনাও হচ্ছে, সে খবর জানিস?'

'জানি হুজৌর।' ফাগুরাম ঘাড় হেলিয়ে দেয়।

'আমি এবার পয়লা চুনাওতে নেমেছি। আমি ছাড়া আছে আরো পাঁচজন। পাঁচজনের মধ্যে রয়েছে সুখন রবিদাস, প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা আর আবু মালেক। পাঁচ নম্বর যে আছে তাকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।' রঘুনাথ না থেমে সমানে বলে যেতে থাকেন, 'ঐ চারজন আমার আঁখ থেকে নিদ ছুটিয়ে দিয়েছে। সুখন রবিদাস অচ্ছুৎ চামার। ও বিজুরি আর গারুদিয়া তালুকের জল-অচলদের ভোট টানতে চেষ্টা করবে। প্রতিভা সহায় পাটনাবালী, বহোত বড় ঘরকা বহু। ঝরিয়ার দিকে বিশটা কয়লাখাদান আর রাঁচীতে দশ পন্দরটা কারখানার মালিক ওরা। প্রতিভাজী কায়াথদের ভোট টানবে। গারুদিয়া তালুকের নেকীরাম শর্মা বামহনদের ভোট কব্জা করতে চাইবে। বিজুরী তালুকের মাস্টার আবু মালেক টানবে

সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান ভোট। কা রে ফাগোয়া, সমঝা ?'

ফাগুরাম নৌটঙ্কীর দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বহু ঘাটের জল খেয়েছে। মানুষ সম্পর্কে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা। কেউ হাঁ করলে তার পেটের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। ফাগুরাম বলে, 'সমঝ গিয়া হুজৌর—'

'কা সমঝা ?'

'বামহন, কায়াথ, মুসলমান আর অচ্ছুতিয়াদের বোট যদি ওরা টানতে পারে চুনাওতে আপনি জিততে পারবেন না। বিলকুল সব চৌপট হয়ে যাবে।'

রঘুনাথ সিং খুশী হলেন। তারিফের গলায় বললেন, 'বুঝেছিস তা হলে। বহোত তেজ (চৌকশ) আদমী তুই। তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে।'

ফাগুরাম বলে, 'আমাকে কী করতে হবে মালিক ?'

রঘুনাথ সিং এবার যা বলেন তা এইরকম। তিনি নেকীরাম শর্মা, প্রতিভা সহায়, আবু মালেক আর সুখন রবিদাসের নানা গুপ্ত কেচ্ছা যোগাড় করে দেবেন। সেই সব মালমশলা দিয়ে ফাগুরামকে রসালো মজাদার গান বাঁধতে হবে এবং রঘুনাথ সিংয়ের লোকেরা যেখানে যেখানে তাঁর জন্য 'ক্যামপিন' (ক্যামপেন) করতে যাবে বা যেখানে যেখানে তাঁর 'ভোটকা মীটিং' হবে সেই সেই জায়গায় ফাগুরামকে ঐ গানগুলো গাইতে হবে।

করণীয় ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়ে রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করেন, 'পারবি তো ?'

'আপনিকো কিরপায় (কৃপায়) পারব হুজৌর।'

'তবে কাল থেকে লেগে যা—'

'আপনিকো যো হুকুম। লেকেন বড়ে সরকার—'

'কী ?'

'আমার হরমুনিয়াটা (হারমোনিয়াম) বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। বড়ে সরকারকা ইজ্জতকা সওয়াল। ওটা নিয়ে চুনাওর গানা গাইতে বেরুলে লোকে আমার গায়ে থুক দেবে। বলবে মালিকের চুনাওতে এই হরমুনিয়া বার করেছিস! মালিকের ইজ্জত চৌপট করে দিলি। তোর—'

রঘুনাথ সিং হাত তুলে ফাগুরামকে থামিয়ে দিলেন। তিনি ওর মতলবটা টের পেয়ে গেছেন। চুনাওর মওকায় একটা ভালো

হারমোনিয়াম বাগিয়ে নিতে চাইছে। অতিশয় ঝানু এবং তুখোড় লোক ফাগুরাম। চুনাওর মতো রাজসূয় ব্যাপারে একটা হারমোনিয়াম অতি তুচ্ছ জিনিস। ফাগুরামকে ডাকিয়ে পাঠাবার আগেই তিনি ওটার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বললেন, 'ঠিক হ্যায়। কালই হারমোনিয়াম পেয়ে যাবি।'

খুশিতে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল ফাগুরাম, 'হরমুনিয়া হো গৈল রে, মালিককা কিরপাসে হরমুনিয়া হো গৈল—'

রঘুনাথ সিং একটু হাসলেন শুধু। তাঁর ঠিক পাশেই বসে ছিলেন বদ্রীবিলাস চৌবে। তিনি বলে উঠলেন, 'হারমোনিয়াম পেয়ে যাবি। গানা কিন্তু আচ্ছা হওয়া চাই —'

ফাগুরাম বলে, 'চিন্তা নায় করনা। এমন গানা বানাব যে পুরে গারুদিয়া আর বিজরীর সব আদমী মাতোয়ারা বন যায়েগা। ওহী চার আদমীর চুনাও যদি কাঁচাতে না পারি আমার নাম ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালা নহী।' বলে রঘুনাথ সিংয়ের দিকে তাকায়, 'বহোত রাত হয়ে গেল। হুজৌরকো কিরপা হো যায় তো হামনিলোগ ঘর লোটে—' বড়ে সরকারের মুখের ওপর ঘরে ফেরার কথা বলার সাহস অন্য দোসাদদের হতো না। রঘুনাথ সিং যতক্ষণ মুখ ফুটে যাবার কথা না বলতেন ওরা চুপচাপ বসেই থাকত। কিন্তু ফাগুরামের আদতই আলাদা। সে পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষ বলেই হয়ত বলতে পারল।

রঘুনাথ সিং বললেন, 'হাঁ, চলে যা।'

খানিকক্ষণ পর বড়ে সরকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোসাদটোলায় ফিরতে ফিরতে গণেরি ফাগুরামকে বলে, 'আমার বড় চিন্তা হচ্ছে রে ফাগোয়া—'

একটা নতুন হারমোনিয়াম পাওয়ার খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে ছিল ফাগুরাম। মুখ ফিরিয়ে সে বলে, 'কা চিন্তা গণেরিচাচা ?'

'প্রতিভাজী বড়ে ঘরকা বহু। বহোত রুপাইয়া ওদের, বহোত পহেলবানও ওদের পোষা। সুখন আমাদের মতোই অচ্ছুৎ। তুই তালুকের সব অচ্ছুৎই ওকে মানে। নেকীরামজী আবু মালেক সাবের হাতেও রয়েছে অনেক লোক। বুঝে সমঝে গানা বাঁধবি, গাইবি।'

'ডরো মাত গণেরিচাচা। সব দিক আমি সামহাল দিয়ে নেব।'

'সামহাল দিতে পারলেই ভালো। তবু বার বার বলে দিচ্ছি, বহোত হোঁশিয়ার।'

'তোমার হোঁশিয়ারি আমার মনে থাকবে গণেরিচাচা—'

একসময় সবাই দোসাদটোলায় পৌঁছে যায়।

সতের

মহল্লায় ঢুকবার মুখে একটা ঝাঁকড়ামাথা কড়াইয়া গাছ। দূর থেকেই ধর্মাদের চোখে পড়েছিল গাছটার তলায় একটা ছইওলা বয়েলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটার পাটাতনের নিচে একটা লণ্ঠন ঝুলছে বলেই অনেক তফাত থেকে গাড়িটা নজরে পড়েছিল।

অবশ্য দোসাদটোলার যে কেউ চোখ বুজেও বলে দিতে পারত সন্ধ্যের পর ওখানে একটা বয়েল গাড়ি ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। কেননা ক'বছর ধরে রাত একটু গাঢ় হলে গাড়িটা ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ বরং একটু দেরিই হয়ে গেছে।

বয়েলগাড়িটা পাঠায় হিমগিরিনন্দন। দোসাদটোলার সবাই জানে সূরয ডুবে যাবার পর চান্দা উঠতে না উঠতেই সাজতে বসে নওরঙ্গী। তারপর রাত একটু গাঢ় হলে কড়াইয়া গাছের তলায় হিমগিরির বয়েল গাড়ি এসে দাঁড়ালেই সে সেটায় গিয়ে ওঠে। আর ওঠামাত্র গাড়িটা ক্যাঁচোর কোঁচর আওয়াজ তুলে খামারবাড়ির দিকে চলতে শুরু করে।

বড়ে সরকারের একজন উৎকৃষ্ট পা-চাটা কুকুরের রাখনি বলে দোসাদটোলার কেউ নওরঙ্গীর মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস করে না। কিন্তু সবাই তাকে ঘেন্না করে; আড়ালে যা-তা বলে।

বয়েল গাড়িটার ছায়া মাড়ানোও যেন পাপ, এভাবে খানিকটা তফাত দিয়ে দোসাদটোলায় ঢুকতে থাকে ধর্মারা। যেতে যেতে চাপা হিংস্র গলায় কে যেন বলে ওঠে, 'রাণ্ডী ঔরত—'

বুধেরি বলে, 'সন্ধ্যেবেলা গণাটাকে কী মারই না খাওয়ালো! হারামী ছমকী কুত্তী—'

রঘুনাথ সিং আচমকা ফাগুরামকে ডেকে পাঠানোর জন্য দোসাদ-পাড়ায় যে ভয় এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তার তলায় গণার বেধড়ক মারধোরের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বুধেরির কথায় আবার সেটা সবার মনে পড়ে যায়। গণেরি থুতু ফেলে বলে, 'সব ঐ

শাঁখরেলটার (শাঁকচুন্নী) জন্যে।'

চাঁদের আলোয় দেখা যায়, দোসাদদের চোখগুলো জ্বলছে। নওরঙ্গী সম্পর্কে তাদের মনের গুহায়িত ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আচমকা বহুগুণ বেড়ে যায়।

কেউ আর কোন কথা বলে না; দাঁতে দাঁত চেপে একে একে দোসাদটোলায় ঢুকে পড়তে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে গোটা মহল্লাটার খাওয়া দাওয়া চুকে যায়। ঘরে ঘরে মিট্টিতেলের ডিবিয়াগুলো আর দেখা যায় না। সারাদিন 'গতর চূরণ' খাটুনির পর দোসাদরা বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে।

ধর্মা কিন্তু শুয়ে পড়েনি। দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ওপর দিয়ে তিন মাইল পথ ভেঙে সে জঙ্গলে গেছে, সারাদিন নিঝুম বন-ভূমিতে ঘুরে কোটরা হরিণের খোঁজ করেছে। তারপর আবার তিন মাইল ভেঙে ফিরে আসা, ফাগুরামের সঙ্গে বড়ে সরকারের কোঠিতে যাতায়াত—সব মিলিয়ে তার শরীরেও কিছু আর নেই। তবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে সে। পহেলবানদের হাতে বেদম মার খাবার পর গণার কী হাল হয়েছে দেখা দরকার। তার বচপনের দোস্ত গণা। গণার জন্য খুবই কষ্ট অনুভব করতে থাকে ধর্মা।

সে যে বসে বসে বিড়ি ফুঁকে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ একটাই। ধর্মা নজর রেখেছে এখনও নওরঙ্গী বয়েল গাড়িটায় গিয়ে ওঠেনি। রাণ্ডীটা কেন-যে আজ এত দেরি করছে রামজী জানে। সে না যাওয়া পর্যন্ত গণাদের ঘরে যেতে সাহস হয় না ধর্মার। কেননা, ঔরতটা যদি তাকে গণার কাছে যেতে দেখে, বলা যায় না এই নিয়ে হিমগিরির কাছে কী লাগিয়ে বসবে। মাঝখান থেকে তার জানটি চৌপট হয়ে যাবে। যতক্ষণ না নওরঙ্গী দোসাদটোলা ছেড়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা বিড়ি ফুঁকে যাবে ধর্মা।

হাতের বিড়ির আগুন যখন সুতোর কাছাকাছি চলে এসেছে সেইসময় ঠুন ঠুন করে চাঁদির পৈড়ীর (মল) আওয়াজ কানে আসে ধর্মার। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে কুয়োর ওধার থেকে নওরঙ্গী আসছে। বুকের ভেতর অফুরন্ত ঘৃণা এবং বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও চাঁদের আলোয় মাঝবয়সী ডাঁটো চেহারার রাখনি ঔরতটাকে পরীর মতো মনে হয় ধর্মার। সেজেছেও সে মারাত্মক।

কাছাকাছি এসে নওরঙ্গী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'এখনও ঘুমোস নি?'

'নায়—' ধর্মা মাথা নাড়ে।

'জেগে আছিস কেন?'

'নিন্দ্ আসছে না।'

'শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।' বলে আর দাঁড়ায় না নওরঙ্গী। রুপোর পৈড়ীতে ফের ঠুন ঠুন মিঠা আওয়াজ তুলে কড়াইয়া গাছের তলায় সেই বয়েলগাড়িটায় গিয়ে ওঠে।

একটু পর গাড়িটা ক্যাঁচর কোঁচর শব্দ করে চলতে থাকে। আর ধর্মা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তারপর এই নিশুতি রাতে দোসাদটোলার শেষ মাথায় গণাদের ঘরে এসে সে অবাক হয়ে যায়। একটা ডিবিয়া জ্বেলে সৌখী এবং গণা তাদের মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। মালপত্র আর কি, কলাই-করা দু-চারটে বাটি, অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো দুটো থালা, পেতলের লোটা, কিছু হাঁড়িকুড়ি, সৌখীন দু-তিনটি ছেঁড়া ময়লা চিটচিটে কাপড়, ইত্যাদি।

এত রাতে ধর্মাকে দেখে গণারা চমকে যায়। তারপর গণাই তাকে, 'আয়, ভেতরে আয়—'

ধর্মা শুধোয়, 'কা হৈল? জিনিসপত্র বাঁধছিস যে?'

'চলা যায়েগা।'

'তোকে না বড়ে সরকারের পহেলবানেরা এত মারল!'

সৌখী ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমিও তো গণাকে কেত্তে বার বুঝিয়েছি। ওরা একবার তোকে মেরে গেছে। আবার যদি করজ না শুধে ভাগিস, খতম করে দেবে।'

গণা রেগে যায়, 'এত সোজা না!' একটু থেমে বলে, 'তিন পুরুখ ধরে ওহী রাজপুতের ক্ষেতিতে আমরা বেগার দিয়ে গেছি। তাতেও কি করজের পানশো (পাঁচ শো) রুপাইয়া শোধ হয় নি? জান গেলেও আমি আর বেগার দেব না। কভী নেহী।'

ধর্মা হঠাৎ নিরানন্দ বোধ করে। সে যদি গণার মতো ওভাবে বলতে পারত! কিন্তু তার যে হাজারটা পিছুটান। বুড়ো মা-বাপ তো রয়েছেই, তার ওপর আছে কুশী এবং তার মা-বাপ। গণা অবশ্য বলেছে, তার জন্য ওদের কারখানায় একটা নৌকরি জুটিয়ে দেবে। কিন্তু ধর্মা ভীরু, দুর্বল। গণার মতো অত সাহস তার সিনায় নেই। পাঁচ-

পাঁচটা মানুষের দায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপ দিতে তার বুক কাঁপে।

গণা ফের বলে, 'তোরাও আর বেগার দিস না ধর্মা। আগেও তোকে বলেছি, এখনও ফের বলছি নৌকরি তোকে একটা জুটিয়ে দেবই। ঐ হারামী রঘুনাথ রাজপুত আর তার পোষা কুত্তাদের মুখে তিন লাথ মেরে এখান থেকে ভেগে যা।'

এ জাতীয় কথা গণার মতো মুক্ত মানুষের মুখেই মানায়। ধর্মা বুঝতে পারে, যে একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে. তাকে আর কোন ভাবেই দোসাদটোলার এই ঘৃণ্য পরাধীন জীবনের সুড়ঙ্গে ঢোকানো যাবে না। ধর্মা বলে, 'তোর কথা আমার মনে থাকবে গণা।'

বাঁধাছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। গণা শুধোয়, 'তুই তো ওদিক থেকে এলি। ওই রাণ্ডীটাকে দেখলি? জানবর আওরতটা এতক্ষণ ওর ঘরে বসে আমার ওপর নজর রাখছিল। এখন আর ওটার সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

জানবর আওরত আর রাণ্ডী যে কে, বুঝতে অসুবিধা হয় না ধর্মার। কেন যে নওরঙ্গী আজ এত দেরি করে হিমগিরির কাছে গেল তাও টের পাওয়া যায়। ধর্মা বলে, 'নওরঙ্গী রাণ্ডীটা এইমাত্র হিমগিরির বয়েল গাড়িতে উঠে চলে গেল।'

গণা বলে, 'আমারও মনে হল ছমকী আওরতটা ঘরে নেই। তখন ডিবিয়া ধরিয়ে মায়ের বর্তন-উর্তন কাপড়া-উপড়া বাঁধতে বসেছি। ওটাকে একবার যদি ধানবাদ বাজারে পাই—' একটা মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়ে সে থেমে যায়।

ধর্মা চুপ করে থাকে।

গণা ভারী ভারী মালগুলো ঘাড়ে এবং হাতে ঝুলিয়ে নেয়। সৌখীকেও ছোটখাটো হাল্কা পুঁটলি-পাঁটলা নিতে বলে। তারপর ফুঁ দিয়ে ডিবিয়াটা নিভিয়ে সেটা একটা ঝোলায় পুরতে পুরতে বলে, 'চলি রে ধম্মা—'

কাল বেধড়ক মারের জের এখনও কাটে নি। গণা ভাল করে হাঁটতে পারছিল না। কোন রকমে পা টেনে টেনে সে এগিয়ে যেতে থাকে। তার পাশাপাশি ধর্মাও হাঁটে, পেছনে সৌখী।

একটু পর ধর্মাদের ঘর ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামে গণা আর সৌখী। ধর্মা আর এগোয় না। ঘাড় ফিরিয়ে গণা আরেক বার

বলে, 'যাই রে গণা—'

ধর্মা ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'হুঁ—'

বুড়ী মাকে নিয়ে জ্যোৎস্না-ধোয়া কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে স্বাধীন জীবনেব দিকে এগিয়ে যায় গণা। আর দোসাদটোলার সুড়ঙ্গের মুখে এক পরাধীন জনমদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতরে হঠাৎ একটা অসহ্য কষ্ট টের পায় সে।

আঠার

হিমগিরির সঙ্গে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে ফিরে এসে প্রথমেই গণার খোঁজ নেয় নওরঙ্গী। গণা এবং তার মাকে না পেয়ে একাই গলা ফাটিয়ে শোর তুলতে তুলতে দোসাদটোলা মাথায় তুলে ফেলে।

একটু পর গণার উধাও হবার খবরটা কীভাবে যেন রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়ি পর্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ হিমগিরি, রামলছমন এবং তাদের পহেলবানেরা দৌড়ে আসে। গোটা দোসাদটোলা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়।

কিন্তু যার জন্য এত হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসা তাকে কোথায় পাবে হিমগিরিরা? গণা এতক্ষণে রঘুনাথ সিংয়ের তালুকের মধ্যে যে ভারতবর্ষ তার সীমানা ছাড়িয়ে খাস ধানবাদ না হলেও মাকে নিয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

জনমদাসটাকে ধরেও আটকে রাখা গেল না। এ আপসোস হিমগিরিদের মরলেও যাবে না। ধরার পর গণাকে বেদম মার দেওয়া গেছে; এটুকুই যা সান্ত্বনা। কিন্তু আমৃত্যু যার বড়ে সরকারের জমি চষার কথা তাকে ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করলে কতটুকু ক্ষতিপূরণ হয়?

প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরও গণার এভাবে ভেগে যাবার দৃষ্টান্ত খুবই মারাত্মক। একটা লোক না থাকলে মালিকের স্বনাম এবং বেনামের হাজার হাজার একর জমি চষার ব্যাপারে কিছুই অসুবিধা হবে না। কিন্তু গণার দৃষ্টান্ত দোসাদটোলার অচ্ছুৎগুলোকে যদি সাহস আর উৎসাহ যোগায় তার ফলাফল হবে ভয়াবহ।

সরু গলার স্বর সাত পর্দা চড়ায় তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে হিমগিরি বলে, 'বল্ ভৈসের ছৌয়ারা, গণা কী করে এখান থেকে ভাগল? তার

সিনায় এত সাহস হল কোত্থেকে ?'

ভীরু কাঁপা গলায় গোটা দোসাদটোলাটা জানায়, 'আমরা কিছু জানি না হুজৌর—'

'একটা হারামজাদ একটা বুড়হীকে নিয়ে তো হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি। তোদের টোলার ভেতর দিয়েই হেঁটে হেঁটে গেছে। তোরা এতগুলো আদমী রয়েছিস এখানে ; কেউ টের পেলি না ! এ আমাকে বিশোয়াস করতে হবে ?'

দোসাদটোলার বাসিন্দাদের তরফ থেকে আধবুড়ো গণেরি জানায়, সারাদিন তারা গতর চূরণ খাটে। সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে বিস্তারায় লেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মুর্দা বনে যায়। দুনিয়ায় তখন কে কী করছে, বিলকুল হুঁশ থাকে না হুজৌর। তাদের নিদের ভেতর কখন গণা আর সৌখী পালিয়ে গেছে, কেউ টের পায় নি।

গলা আরো তিন পর্দা চড়িয়ে সবার কানে তুরপুন চালিয়ে দেয় হিমগিরি, 'জানবরের দল।'

গণেরি কিছু বলার জন্য হাঁ করতে যাচ্ছিল, আচমকা ওধার থেকে নওরঙ্গী ডাকে, 'অ্যাই ধম্মা—'

চমকে ধর্মা নওরঙ্গীর মুখের দিকে তাকায়, 'কা ?'

'কাল তুই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে ছিলি। কা রে, থা নহী ?'

ধর্মার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়। নওরঙ্গী যে কোন দিকে যাচ্ছে, সে আগে থেকেই তার গন্ধ পায় যেন। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না।

সাপিনীর মতো স্থির চোখে ধর্মাকে দেখতে দেখতে নওরঙ্গী ধারালো গলায় ফের বলে, 'কা রে, গুংগা (বোবা) বন্ গৈল ?'

অতি কষ্টে গলার ভেতরটা এবার সাফ করে নেয় ধর্মা, দুর্বল স্বরে কোনরকমে বলতে পারে, 'তুমি কাল রাত্তিরে বয়েলগাড়িতে ওঠার পর আমি আর বসি নি। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।' ধর্মা টের পায়, এই সামান্য মিথ্যেটুকু বলতে তার বুকের ভেতর ভূমিকম্পের মতো কিছু একটা অনবরত যেন ঘটে চলেছে।

রাত্তিরে নওরঙ্গীর বয়েল গাড়িতে ওঠার কথাটা ভেল্‌কী দেখিয়ে ছাড়ে। একেবারে যাদুকা খেল যেন। বয়েল গাড়িতে চেপে রোজ রাত্তিরে এই ছমকী আওরতটা যে হিমগিরির কাছে যায়, এটা কোন

গোপন ব্যাপার না। গারুদিয়া তালুকের তাবত আদমী তো বটেই, কুকুর-বেড়াল-ছুঁচো আর রাতচরা গিধেরাও তা জানে। এ একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু যে যত পারে জানুক, এমন কি স্বচক্ষে এক বামহন আর তার অচ্ছুৎ রাখনির কুকীর্তি দেখুক কিন্তু এই নিয়ে তাদের সামনে কথাবার্তা ঘাঁটাঘাঁটি চলবে না। এতে নাকি হিমগিরির সামাজিক মানমর্যাদা জাহান্নামে যায়। লোকটার মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত।

হিমগিরি দ্রুত বলে ওঠে, 'একটা জরুরী বাত তোরা শুনে রাখ; গণা কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, ওর গলায় রশি দিয়ে ধরে নিয়ে আসব। এবার ওকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না; জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে। গণার দেখাদেখি কেউ যদি বদ মতলব করে থাকিস তা হলে তোদের কপালে কী আছে আন্দাজ করে নে। হামনিকো বাতঠো কানমে ঘুষল?'

গোটা দোসাদটোলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় হেলিয়ে জানিয়ে দিল—ঘুষেছে।

এবার হিমগিরি আকাশের দিকে আঙুল বাড়ায়। বলে, 'দেখেছিস?'

অন্য দিন আলো ফুটতে না ফুটতেই রঘুনাথ সিংয়ের খামার-বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ে ভূমিদাসেরা। আজ গণা এবং সৌখী ভেগে পড়ায় এবং হিমগিরিরা দৌড়ে আসায় সময়ের দিকে কারো হুঁশ ছিল না। এদিকে কখন যেন রোদ উঠে গেছে। জষ্টি মাসের সকাল। রোদ উঠতে না উঠতেই ভাপ ছড়াতে শুরু করে।

আকাশের দিকে এক নজর তাকিয়েই হিমগিরির ইঙ্গিতটা বুঝে নেয় গণেরিরা। অর্থাৎ সূরয চড়ে গেছে, সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে এখনই জমিনে যাও। হুড়মুড় করে জনমদাসেরা দোসাদটোলার দিকে দৌড়ে যায়। নাকেমুখে মাড়ভাত্তা কিংবা বাসি পানিভাত্তা গুঁজে, পিঠে কালোয়া বেঁধে একটু পরেই তারা খামারবাড়িতে চলে আসে। সেখান থেকে হাল বয়েল নিয়ে ক্ষেতির দিকে ছোটে।

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার খামারের পেছন দিকে তাকায় ধর্মা। সেখানে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো যে ঘরগুলো গা জড়াজড়ি করে রয়েছে সেগুলো এখন ফাঁকা। তার মানে রামলছমন আর সে যে মরসুমী ওরাঁও আর মুণ্ডা কিষাণদের চাহাঢ়ের হাট থেকে নিয়ে এসেছিল

তারা ক্ষেতিতে চলে গেছে। এখানে আসার পর থেকে রোজই ধর্মাদের সঙ্গে সকালে ওরা বড়ে সরকারের জমিতে চলে যায়, সারা দিন কাজের পর ফেরেও একই সঙ্গে। আজ বেলা চড়তে দেখে তারা আর বসে থাকেনি।

ক্ষেতিতে আসার পর কারো নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। হাল বয়েল নিয়ে যে যার জমিতে নেমে পড়ে। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠতে থাকে, 'উর্‌রা, উর্‌রা, হট্‌ হট্‌—'। আওয়াজের সঙ্গে লাঙলের শীষ রুক্ষ পাথুরে মাটির পেট চিরে চিরে ছুটতে থাকে।

একটানা অনেকক্ষণ লাঙল চালাবার পর ঘাড় তুলে একবার চার পাশে তাকায় ধর্মা। বাঁ দিকে যতদূর নজর যায়, আদিবাসী কিষাণরা মাটি চষে চলেছে।

ওদিকটায় কাল পর্যন্ত লাঙল পড়ে নি। খুব সম্ভব কাল রাতে হিমগিরি মরসুমী কিষাণদের না-চষা জমিতে লাঙল চালাতে বলে দিয়েছিল। হয়ত আজ ভোরে ক্ষেত চিনিয়ে দেবার জন্য কাউকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়েও থাকবে। ওরাঁও মুণ্ডাদের ঘামে-ভেজা পিছল চামড়ায় জ্যৈষ্ঠের রোদ ঠিকরোতে থাকে।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মা জানে, পাহাড় বা জঙ্গলের আদিবাসীদের কাজে কোন ফাঁকি নেই। এই যে মাটি চষা আর বীজ রোয়ার দায়িত্ব নিয়ে তারা এসেছে, এরপর আর ওদের পেছনে লেগে থাকতে হবে না, তাড়া লাগাবারও দরকার নেই। ঝড় উঠুক, বাঁড় (বন্যা) আসুক, রোদে পুড়ে সব ছারখার হয়ে যাক, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আর কোনদিকে ওরা তাকাবে না।

হাইওয়ের ওপাশে সেই চিরকালের চেনা ছবি। দক্ষিণ-কোয়েলের শুকনো মরা খাতের গা ঘেঁষে মিশিরলালজীর জমিতে অন্য দিনের মতো আজও ট্রাক্টর চলছে। ভট ভট আওয়াজ জষ্ঠি মাসের লু বাতাসে ভেসে ভেসে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁক ঝাঁক পরদেশী শুগা। বড় সড়কের পাশে টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে ক্ষুদে ক্ষুদে চোটারা। তবে আজ একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ছে। তা হল পছিমা মেঘ। খুব একটা জমকালো নয়। টুকরা টুকরা, পেঁজা পেঁজা মেঘগুলো কোথাও দানা বাঁধছে না; আলস্যে গা ঢেলে দিয়ে পশ্চিম আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটু থেমে ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে মেঘের গতিবিধি লক্ষ্য করে ধর্মা। লাঙল থামতে কুশীও থেমে গিয়েছিল। পেছন থেকে সে এবার ধর্মার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'ঘটা (মেঘ)—'

ধর্মা ঘাড়টা সামান্য হেলায়, 'হুঁ—'

পাশের ক্ষেত থেকে গণেরিও মেঘ দেখছিল। সে বলে, 'এই সালের পয়লা মেঘ। তবে 'বারিষ' নামতে দেরি আছে।'

'কত দেরি গণেরিচাচা?'

'আট দশ রোজ জরুর।'

'এত্তে দের (দেরি)?'

গণেরি বুঝিয়ে দেয়। এ বছর মেঘের আনাগোনা সবে আজ থেকে শুরু হল। এত অল্প মেঘে তো বৃষ্টি হয় না। অঢেল মেঘ জমে জমে পছিমা আকাশ 'কালা পাথর' বনে যাবে, তবে না 'বারিষ' নামবে। কিন্তু সে সব একদিনে হয় না। গণেরি বলতে থাকে, বারিষ না হলে কেউ আর বাঁচবে না। নদী-নহর, মানুষ-জানবর, পাহাড়-জঙ্গল সব জ্বলে খতম হয়ে যাচ্ছে।

ধর্মা বলে, 'বারিষ দো-দশ রোজ বাদ শুরু হোক। মাথার ওপর মেঘটা থাকলেও আরাম। জেঠ মাহিনার রওদে জান যায়।'

গণেরি কি বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় হাইওয়ে থেকে চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'প্রতিভাজীকো—'

'বোট দো—'

'কৌন জিতেগী?'

'প্রতিভা সহায়, আউর কৌন?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ধর্মারা হাইওয়ের দিকে তাকাল। লাল ধুলো উড়িয়ে একটা খোলা জীপ বিজুরি তালুকের দিকে চলেছে। দশ বারোটা জোয়ান ছোকরা গাদাগাদি করে সেটার ওপর দাঁড়িয়ে গলায় রক্ত তুলে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। জীপটার সামনের দিকে একটা লাল শালুর কাপড়ে একটা ঘোড়া আঁকা। তার তলায় কী সব যেন লেখা রয়েছে। অক্ষরপরিচয়হীন আনপড় জনমদাসেরা তা পড়তে পারে না। পারলে জানতো, সামনের চুনাওতে প্রতিভা সহায়কে জেতাবার জন্য ঘোড়ার চিহ্নে মোহর মারতে বলা হয়েছে।

দেখতে দেখতে জীপটা অনেক দূরে, লাল ধুলোয় আকাশ যেখানে ঝাপসা হয়ে আছে, একটা ফুটকির মতো মিলিয়ে যায়।

জোরে শ্বাস টেনে জ্যৈষ্ঠের খানিকটা তাতানো বাতাস ফুসফুসে ভরে নেয় গণেরি। বলে, 'চুনাওর লড়াইতে তা হলে এবার আওরত নামল?' এতদিন পর্যন্ত গারুদিয়া তালুকে যে নির্বাচনী যুদ্ধ হয়ে গেছে তা পুরুষে পুরুষে। একজন মহিলাকে এবার নামতে দেখে গণেরি অবাকই হয়েছে।

ধর্মা বলে, 'পরতিভাজী কৌন চাচা?'

গণেরি বলে, 'বড় ঘরকা বহু।' তারপর সে যা জানায় তা এই-রকম। বিজুরি তালুকে দিয়ারা মনপথল গাঁয়ে তার সসুরাল। শ্বশুর বাড়ি শুধু নামেই, ওখানে কেউ থাকে না। পুরনো আমলের বাড়িঘর ভেঙেচুরে ধসে যাচ্ছে। আগাছায় ঢেকে গেছে সব কিছু। পরতি-ভাজীদের কয়লা খাদান রয়েছে ঝরিয়াতে, কারখানা আছে রাঁচীতে। ওরা আজ যদি থাকে পাটনায়, কাল কলকাত্তায়, পরশু দিল্লীতে, নরশু বোম্বাইতে। বহোত বহোত পাইসা ওদের ঘরে।

হাঁ করে শুনতে থাকে ধর্মারা। শুধু ওরা দুজনই নয়, গণেরিদের কথা বলতে দেখে চারদিকের ক্ষেতগুলো থেকে আরো অনেকে উঠে এসে কখন তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, কারো খেয়াল হয় নি। এবার গণেরি সবাইকে তাড়া লাগায়, 'যা যা, আপনা আপনা ক্ষেতিমে চলা যা—'

সবাই ফের ক্ষেতিতে নেমে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছাড়া-ছাড়া আলগা আলগা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যটা যখন খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে সেই সময় কালোয়া খাওয়ার সময় হয়ে যায়। সবাই বয়েলগুলোর গলার রশি খুলে দিয়ে ঝোপঝাড় কি কোমরবাঁকা ত্রিভঙ্গ চেহারার সীসম গাছের ছায়া খুঁজে বসে পড়ে। খানিকক্ষণ জিরিয়ে গামছা কি ন্যাকড়ার গিঁঠ খুলে ভাত-সবজি-ডাল-নিমক-মিরচা বার করে খেতে শুরু করে।

একটা বাজেপোড়া তালগাছের গোড়ায় খেতে বসেছিল ধর্মা আর কুশী। আজ তাদের খাওয়ার আয়োজন সামান্যই। বাজরার রুটি, খানিকটা কালো কালো আস্ত কলাই সেদ্ধ, ভেরোয়া (ঢেড়স) ভাজা, নিমক, হরা মিরচি এবং খানিকটা করে তেঁতুল গোলা।

খেতে খেতে হঠাৎ কুশীর চোখে পড়ে, বাঁ দিক থেকে হাইওয়ের ওপর দিয়ে সাইকেলে করে মাস্টারজী আসছেন। তাজ্জব বনবার মতো কোন দৃশ্য নয়। কয়েক সাল ধরে মাস্টারজীকে এভাবেই

সাইকেলে করে রওদ-বারিষ মাথায় নিয়ে গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। পাঁচ সাত 'মিল' জায়গা জুড়ে ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর স্কুলের জন্য ছেলেমেয়ে জোটান।

কোন কোন দিন মাস্টারজী সটান হাইওয়ে ধরে বিজুরি তালুকের দিকে চলে যান। আজ কিন্তু গেলেন না। বাস-ইস্ট্যাণ্ডের কাছে ঝাঁকড়া পীপর গাছটার তলায় এসে নেমে পড়লেন। তারপর ক্ষেতিতে নেমে সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

কুশী বলে, 'মাস্টারজী আসছে—'

ততক্ষণে ধর্মাও দেখতে পেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হামনিলোগ ইঁহা মাস্টারজী—আমরা এখানে—'

রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতির চারদিক থেকে নানা গলা শোনা যায়, 'মাস্টারজী আয়া, মাস্টারজী আয়া—'

মাস্টারজীকে এ অঞ্চলের গরীব ভুখা অচ্ছুৎ মানুষেরা খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখে। তাঁকে যেমন ভালোও বাসে তেমনি শ্রদ্ধাও করে। সব চাইতে বড় কথা, আপনজন বলে ভাবে।

মাস্টারজী কাছে আসতেই এধার ওধার থেকে গণেরি, বুধেরি, মাধোলালরা উঠে আসে। তাঁকে নিয়ে কী করবে, কোথায় বসাবে, ভেবে উঠতে পারে না। ভীষণ বাস্তভাবে নিজের গামছাটা দশ বার ঝেড়ে জমিতে পেতে দেয় গণেরি। বলে, 'বৈঠ মাস্টারজী, বৈঠ—'

মাস্টারজী গামছার ওপর বসেন না। সাইকেলটা সামনের সীসম গাছটার গায়ে দাঁড় করিয়ে আলের মরা ঘাসের ওপর বসে পড়েন। মোটা খদ্দরের ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে সবাইকে দেখতে দেখতে সস্নেহে হাসেন। বলেন, 'কী খবর তোদের? ভাল আছিস?'

ধর্মারা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, 'হঁ, রামজীকো কিরপা।'

'কালোয়া খাওয়া হয়ে গেল?'

'হঁ।'

গণেরিদের শরীর-স্বাস্থ্য ঘর-সংসার সম্পর্কে আরো কিছুটা খোঁজ খবর নিয়ে আসল কথায় আসেন মাস্টারজী, 'তোদের মতলবটা কী, খোলসা করে বল্ তো।'

মাস্টারজীর কথায় যে ইঙ্গিতটা আছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে

পারে গণেরি। ফিকে হেসে ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কীসের মতলব?'

'ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছিস না কেন?' সোজাসুজি প্রশ্নটা করে সেই পুরনো কথাটা আরেক বার নতুন করে মনে করিয়ে দেন মাস্টারজী। জমানা বদলে গেছে। গণেরিদের যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কামিয়া হয়ে পরের জমিতে বেগার দিতে দিতেই এই জনমটা বরবাদ করে ফেললি। ছেলেপুলেদের পেটে দু-চারটে কালির হরফ ঢোকাবার বন্দোবস্ত কর। তাদের আঁখ ফুটুক; নইলে তোদের মতোই তারাও পরের জমিনে হাল-বয়েল ঠেলে ঠেলেই খতম হয়ে যাবে। নিজেদের হক কোনদিনই বুঝে নিতে পারবে না।

গণেরি নিরুপায় হতাশ মুখে বলে, 'কা করে মাস্টারজি! তুই আমাদের সবই জানিস। এই গরমের সময়টা ছেলেমেয়েগুলোকে পড়তে পাঠাই কী করে? দশ সাল আমাদের কুয়ো কাটানো হয় নি। টোলাতে এক বুঁদ পীনেকা পানি নেই। সূরয দেও উঠতে না উঠতে বালবাচ্চাদের পানি আনতে পাঠিয়ে দিই। শুখা নদী থেকে বালি খুঁড়ে পানি না আনলে সবাই ছাতি ফেটে মরবে। বারিষ নামুক, তখন ওদের পাঠাব।'

'বারিষ শুরু হলে তো ধান রোয়ার জন্যে ওদের ক্ষেতিতে নিয়ে আসবি।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন মাস্টারজী। আস্তে আস্তে খুবই দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে গণেরি।

ক'সাল ধরেই মাস্টারজী দেখছেন গরমের সময় লাঙল দিয়ে ক্ষেতি তৈরি হয়ে যাবার পর যেই আকাশ থেকে বৃষ্টির দানা নামতে শুরু করে, ধান বোনাও চালু হয়ে যায়। ছোট ফালি জমিতে বীজ রুয়ে প্রথমে ধানচারা করে নেওয়া হয়। চারাগুলো বিঘৎ খানেক বড় হবার পর শেকড় সুদ্ধু তুলে এনে জমিতে লাইন ধরে ফাঁক ফাঁক করে লাগাবার পালা। এই সময়টা প্রচুর লোকজন দরকার। আদিবাসী মরসুমী কিষাণরা থাকা সত্ত্বেও সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠে। অগত্যা মা-বাপেরা হাতে হাতে সাহায্যের জন্য ছেলেমেয়েদের ক্ষেতিতে টেনে আনে। না এনে উপায়ই বা কী? তারপর ধান রোয়া শেষ হতে না হতেই জোর বর্ষা নেমে যায়। দিনরাত তখন জল ঝরছে তো ঝরছেই। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রাস্তাঘাটের হাল বেজায় খারাপ হয়ে যায়। এই গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে পাক্কী আর ক'টা? পাটনা আর

রাঁচিতে যাবার ঐ হাইওয়েটা বাদ দিলে সবই কাঁচা সড়ক। বর্ষার মরসুমে সেখানে হাঁটুভর থকথকে কাদা জমে থাকে। তখন কোশ দু-কোশ কাদা ঠেলে ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে কোন মা-বাপই রাজী না।

বর্ষার পর দুটো মাস অবশ্য ভূমিদাসদের হাড়ে কিছুটা বাতাস লাগে। তখন ক্ষেতির কাজ পুরা বন্ধ। মাঠে মাঠে তখন ধানের শীষ লকলকিয়ে বাড়তে থাকে। সবুজ আবরণের ভেতর দুধ দ্রুত ঘন হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত্রের রঙ একেবারে বদলে যাবে। যতদূর নজর চলবে, মাঠ জুড়ে শুধু অফুরন্ত সোনালী ধান। যতদিন না ধান পাকছে, রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে গিয়ে গত সালের ধান-কলাই মুগ-মুসুর ইত্যাদি হরেক শস্য ঝেড়ে বেছে রোদে শুকিয়ে রাখতে হয় জনমদাসদের। এই সময়টা মাস্টারজীর ইস্কুলের কথা আচমকা মনে পড়ে যায় তাদের। সকাল হতে না হতেই দোসাদটোলার মা-বাপেরা ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙিয়ে মাড়ভাত্তা খাইয়ে তাড়া দিয়ে দিয়ে 'পাক্কী'র ওধারের কাঁচা সড়কে পৌঁছে দেয়। এখান থেকে বাচ্চাগুলো গারুদিয়া বাজারের পাশে মাস্টারজীর ইস্কুলে ঠিকই চলে যেতে পারবে। ছুটির পর মাস্টারজী নিজে সঙ্গে করে তাদের এই 'পাক্কী' পার করে দিয়ে যান। হাইওয়েতে দিনরাত উজানে ভাটিতে বাস-ট্রাক বেপরোয়া দৌড়োয়। বাচ্চাগুলোকে পার না করে দিলে গাড়ির তলায় চলে যাবার ভয়।

কিন্তু যাদের জন্ম ভূমিদাসদের ঘরে তাদের পক্ষে বছরের ক'টা দিনই বা পড়াশোনা সম্ভব? ধান যেই পাকলো, মাস্টারজীর ইস্কুল ফাঁকা করে ছেলেমেয়েরা মা-বাপের পিছু পিছু মাঠে গিয়ে নামল। ধান ওঠার পরও কাজের কি কামাই আছে? আবার লাঙলের ফলায় জমি তৈরি করে কলাই তিল তিসি মুগ মুসুর লাগাতে হবে। লাগাতে হবে আখ ভুট্টা বাজরা জনার। তখনও মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা ক্ষেতিতে আসবে। রবিশস্যের মরসুম ফুরোতে না ফুরোতেই ফের গরম শুরু হয়ে যাবে। এই ভাবেই ওদের জীবনে ঋতুর চাকায় বছর ঘুরে যায়। কাজেই ছেলেপুলের পেটে দু-চারটে কালির হরফ ঢোকাবার ফুরসত কোথায় ওদের?

মাস্টারজী বলেন, 'বারিষ থামলে দো-চার রোজের জন্যে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠাবি। তারপর বাকী সাল ওরা আর ইস্কুলের

মুখ দেখবে না। এভাবে কি পড়াশোনা হয়?'

কাচুমাচু মুখে হাত কচলাতে কচলাতে গণেরি বলে, 'কা করে মাস্টারজী, কাম তো ওঠাতে হবে। কাম না ওঠালে বড়ে সরকার কি ছেড়ে দেবে?' তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের শুরু করে, 'জনমভর আমরা খরিদীই হয়ে রইলাম।

মাস্টারজী কোন কারণেই হতাশ হন না। মানুষ এবং জীবন সম্বন্ধে তিনি বড়ই আশাবাদী। বলেন, 'এর মধ্যেই সময় করে নিতে হবে গণেরি। ছেলেমেয়েগুলাকে আনপড় মূরখ করে রাখা কোন কাজের কথা নয়।'

'হুঁ।'

কথায় কথায় বেলা হেলতে শুরু করে। খানিক আগে যে পাতলা পাতলা মেঘ পছিমা বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল, দিগন্তের ওপারে কখন যেন সেগুলো উধাও হয়ে গেছে। জষ্ঠি মাসের সূরয খাড়া মাথার ওপর থেকে পশ্চিমের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে।

মাস্টারজী কী বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা হাইওয়ের দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসে।

'নেকীরাম শর্মাকো—'

'বোট দো, বোট দো—'

'উটকা পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো—'

ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই বড় সড়কের দিকে তাকায়। একটা টেম্পো বিজুরি তালুক থেকে গারুদিয়া বাজারের দিকে চলেছে। গাড়িটার সামনে উট আঁকা একটা লাল শালুর টুকরো আটকানো। বোঝা যায়, এবারের নির্বাচনে নেকীরামের প্রতীক হলো উট। টেম্পোটার পেছন দিকে আট দশটা ছোকরা নেকীরামকে ভোট দেবার জন্য অনবরত গলায় রক্ত তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

গাড়িটা লাল ধুলো উড়িয়ে ডান দিকের একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যতক্ষণ নেকীরাম শর্মার ভোটের গাড়িটা দেখা যায়, তাকিয়ে ছিলেন মাস্টারজী। হাইওয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার তিনি গণেরিকে শুধোন, 'কৌন নেকীরাম রে? বড় ইস্কুলের পণ্ডিতজী?'

গণেরি বলে, 'অয়সাই শুনা?'

'বামহন বলে বড় দেমাক না? ছুয়াছুত খুব মানে?'
'শুনা অয়সা।'
'পণ্ডিতজীও তা হলে চুনাওতে নেমে গেল?'
কী ভেবে গণেরি বলে, 'জেনানাও চুনাওতে নেমেছে।'
একটু অবাক হয়ে মাস্টারজী জিজ্ঞেস করেন, 'কৌন জেনানা?'
'বড়ে ঘরকা বহু—পরতিভা সহায়। কয়লা খাদান আছে ওদের, কারখান্না ভি আছে। বহোত পাইসাবালী।'
মাস্টারজীর চমক লাগে। বলেন, 'আচ্ছা—'
গণেরি বলে, 'থোড়া আগে পরতিভাজীকো ভোটের গাড়ি বিজুরি তালুকের দিকে গেল।'
মাস্টারজী আপন মনে এবার বলেন, 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট প্রতিভা সহায়, জমিমালিক রঘুনাথ সিং, বামহন নেকীরাম শর্মা—সবার ভোট চাই। গারুদিয়া-বিজুরিতে এবার চুনাওর পরব জমবে মনে হচ্ছে।'
গণেরি স্থির চোখে মাস্টারজীর দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর কথাগুলোর গভীর মানে সে বুঝতে পারে না। শুধোয়, 'কা বোলা মাস্টারজী?'
'ও কিছু না।' প্রসঙ্গটা বদলে মাস্টারজী জিজ্ঞেস করেন, 'আর কে কে ভোটে নামল জানিস?'
'সুখন রবিদাস—'
'বহোত তেজ ছোকরা। আউর?'
'শুনেছি বিজুরির এক মুসলমান আদমীও নেমেছে।'
মাস্টারজী আবছা গলায় বিড় বিড় করতে থাকেন, 'হিন্দু মুসলমান, জাতপাত, ইণ্ডাস্ট্রি, ল্যাণ্ড ওনারশিপ সব কুছ চুনাওকা ছত্রির তলায় এসে গেল। বহোত আচ্ছা—'
এই সময় দূর থেকে খ্যাসখেসে গলার চিৎকার শোনা যায়, 'আরে উল্লু, গাধধে, পাঠঠে, হারামজাদকা ছৌয়ারা—'
গলার স্বরটা খুবই চেনা। চমকে সবাই দেখল, পুরনো লঝঝড় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ক্ষেতির পর ক্ষেতি পেরিয়ে রামলছমন আসছে। তার মুখের কামাই নেই। সমানে সে চেল্লাচ্ছে, 'আসতে একটু দেরি করেছি, অমনি কাজে ফাঁকি! আসমানে আজ মেঘ দেখা দিয়েছে। দশ-পন্দর রোজের মধ্যে বারিষ নেমে যাবে। আভিতক

ক্ষেতি চষা পুরা হলো না। হারামজাদকো বেটোয়া বিটিয়া, দয়া করে গতর তুলে জমিনে নামো। উল্লু, পাঠ্‌ঠে, গাধ্‌ধে—'

মাস্টারজীর চারপাশে যারা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চোখের পাতা পড়তে না পড়তে হালবয়েল নিয়ে ক্ষেতিতে নেমে পড়ে। চারপাশ থেকে আওয়াজ উঠতে থাকে, 'উর্‌রা হঠ্‌ হঠ্‌, উর্‌রা হঠ্‌ হঠ্‌—'

তার ভয়ে এতগুলো হট্টাকট্টা চেহারার দোসাদ-দুসাদিন সারাক্ষণ তটস্থ। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে রামলছমন। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভূমিদাসদের মাটি চষা লক্ষ্য করে। তারপর হাতের সাইকেলটা একটা পরাস গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে মাস্টারজীর দিকে তাকায়, 'কা মাস্টারজী, কা খবর?'

রামলছমনকে একেবারেই পছন্দ করেন না মাস্টারজী। খুবই নিস্পৃহ মুখে বলেন, 'চলতা হ্যায়—'

'তোমার ইস্কুল কেমন চলছে?'

'ভাল না।'

'এখানে?'

অর্থাৎ বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে মাস্টারজী কী উদ্দেশ্যে এসেছেন, রামলছমন তা-ই জানতে চায়। মাস্টারজী এ প্রশ্নের উত্তর দেন না। কেননা আগেও অনেক বার এই ক্ষেতিতে রামলছমনের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং কম করে পঞ্চাশ বার এই একই প্রশ্ন করেছে সে। মাস্টারজীও একই উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু একই প্রশ্নের জবাব কত বার দেওয়া যায়! বিরক্ত মাস্টারজী এখন আর জবাব দেওয়াটা প্রয়োজন বোধ করেন না।

রামলছমন ট্যারা-বাঁকা পোকায় খাওয়া কালচে দাঁত বার করে বিশ্রী হাসে। বলে, 'সমঝা। ইস্কুলের জন্যে ছেলেমেয়ে পাকড়াতে এসেছ।'

কথাটা ঠিকই বলেছে বগুলা ভকত। সে তো বটেই, গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের তাবত মানুষ জানে মাস্টারজী সাইকেলে করে গাঁওয়ে গাঁওয়ে ক্ষেতিতে ক্ষেতিতে ঘুরে তাঁর স্কুলের জন্য ছাত্র ধরতে বেরোন। তিনি এবারও কিছু বলেন না।

রামলছমন মাস্টারজীর মুখের ওপর ঝুঁকে এবার শুধোয়, 'মিলা?'

ছাত্র পাওয়া গেল কিনা, রামলছমনের তা-ই জিজ্ঞাস্য। মাস্টারজী ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও বাইরে তা ফুটে উঠতে দেন না।

গম্ভীর গলায় শুধু বলেন, 'নেহী।'

উত্তরটা শুনে বেজায় খুশী রামলছমন। সবগুলো দাঁত একসঙ্গে বার করে এবার সে বলে, 'ও আমি বহোত আগে থেকেই জানি। মাস্টার, এই জায়গাটা হলো পড়তি জমি। এখানে লেখাপড়ার চাষ হয় না। ইস্কুল খুলে গরমিনের পাইসাই বরবাদ। আর তুমিও এখানে ওখানে ঘুরে ছেলে মেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছ। তার চেয়ে এক কাম কর—'

সন্দিগ্ধ চোখে মাস্টারজী তাকান, 'কী কাম?'

'ইস্কুলের ডুকান এখান চলবে না। এখান থেকে ইস্কুল উঠিয়ে ভালো জায়গায় নিয়ে বসাও। গাহেক মিলবে। না হলে পরেসানিই সার—' উৎকৃষ্ট একটি রসিকতা করা হয়েছে ভেবে রামলছমন খুশিতে ডগমগ। হিক্কার মতো শব্দ করে করে সে হাসতে থাকে।

বিনা পয়সায় এরকম একটা দামী পরামর্শ পেয়েও মাস্টারজীকে আদৌ উৎসাহিত হতে দেখা যায় না। নিরানন্দ একটু হেসে তিনি উঠে পড়েন। একটি কথাও না বলে পাশের সীসম গাছটার গা থেকে নিজের সাইকেলটা নিয়ে বড় সড়কের দিকে চলতে শুরু করেন। মনে মনে সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এই পড়তি জমিতেই লেখাপড়ার চাষ করে রামলছমনকে দেখিয়ে দেবেন।

মাস্টারজী চলে যাবার পর লম্বা লম্বা পা ফেলে বগুলা ভকত এ জমি থেকে ও জমিতে, ও জমি থেকে সে জমিতে চরকির মতো ঘুরতে থাকে। এভাবে ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ সবার কাজ লক্ষ্য করে। তারপর যুবতী মেয়েদের পেছনে লেগে যায়। প্রথমেই তার চোখ পড়ে শনিচারীর ওপর! অন্য সব দিনের মতো মাধোলালের জমিতে গত সালের মরা গাছের শেকড় বেছে বেছে রাখছিল সে।

শনিচারীর পেটে ছ সাত মাসের বাচ্চা রয়েছে। সোজাসুজি সেদিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে খ্যা খ্যা করে হাসে রামলছমন। বলে, 'কা রে শনচারী, পেটটার কী হাল করেছিস! তোর পেটের ছৌয়া কত বড় হল?' তার হাসিতে ডুনিয়ার সব বদবু মেশানো।

শনিচারী তার ছ সাত মাসের গর্ভ নিয়ে কী করবে, ভেবে পায় না। খাটো শাড়ির খুঁট টেনে সেটা ঢাকতে চেষ্টা করে কিন্তু শাড়ির বহর এতই ছোট যে কোমর আর বুক ঢাকার পর বাড়তি কিছু পাওয়া যায় না। দু হাতে পেটটা চাপা দিয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবী এই মুহূর্তে দু ভাগ হয়ে গেলে সে তার ভেতর ঢুকে যেত।

শনিচারীর এই জড়সড় সন্ত্রস্ত ভাবটা দেখতে দেখতে বেশ মজা পায় রামলছমন। চোখ নাচাতে নাচাতে সে বলে, 'তোর ছৌয়াকে পেট থেকে মাটিতে কবে ফেলবি?'

শনিচারী এবারও উত্তর দেয় না। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামলছমন আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ওধারের ক্ষেত থেকে গিধনী ডাকে, 'এ বামহনিয়া, আমার এখানে এসো। শনচারী কবে ছৌয়া মাটিতে ফেলবে, আমি তোমাকে সমঝিয়ে দিচ্ছি।'

চমকে গিধনীর দিকে তাকায় রামলছমন। দুসাদটোলার এই একজনকেই সে যমের মতো ভয় পায়। ছুকরির জিভে চাকুর ধার। কিছুই তার মুখে আটকায় না। ক'দিন আগে এই বদ আওরতটা তার হাল খারাপ করে ছেড়ে দিয়েছিল। সন্দিগ্ধ ভীতু চোখে সে গিধনীকে দেখতে থাকে।

গিধনী হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে, 'আও আও হামনিকো দুলহন। আ যাও—'

বগুলা ভকত আর দাঁড়ায় না। ছুকরির মতলব ভাল নয়। মনে হচ্ছে সেদিনের মতো আজও নিশ্চয়ই কোন ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। বজ্জাত আওরতের ত্রিসীমানায় থাকা ঠিক হবে না। বকের মতো পা ফেলে ফেলে চোখের পলকে অনেকদূরে যেখানে আদিবাসী মরসুমী কিষাণরা জমি চষছে সোজা সেখানে চলে যায় রামলছমন।

ভূমিদাসরা নিশ্চিন্ত। আজ অন্তত বগুলা ভকতটা তাদের এদিকে আসবে না।

সন্ধ্যেবেলা বড়ে সরকারের খামারবাড়িতে হাল-বয়েল জমা দেবার পর ধর্মা আর কুশী ছাড়া বাকী সবাই দোসাদটোলায় ফিরে গেল। আর ওরা দুজনে সোজা চলে এল সাবুই ঘাসের জঙ্গলে। চার দিন হয়ে গেল, বগেরি ধরার ফাঁদ পাতা হচ্ছে না। একটা দিন গেছে কোটরার পেছনে, একদিন চাহাঢ়ের হাটে কিষাণ আনতে। গণাকে যে দিন হিমগিরি পহেলবান দিয়ে পেটালো সেই দিনটাও বরবাদ হয়েছে। আরেকটা দিন শরীর খারাপ লাগছিল।

মোট চারটে দিন। চার দিনে ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে

কমসে কম দশ বারোটা টাকা কামাই তো হতো। দশ বারোটা টাকা মানে নিজেদের মুক্তির দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া বর্ষা নামলে বগেড়ি আর পাওয়া যাবে না। তল্লাট ছেড়ে ঝাঁক বেঁধে তারা উধাও হয়ে যাবে। তার মানে পুরো বারিষের সময়টা কামাই প্রায় থাকবে না বললেই চলে। বেফায়দা চারদিনের রোজগার নষ্ট হয়ে গেল।

ফাঁদ টাদ পাতা হয়ে গেলে কুশী বলল, 'এবার কী করবি ?'

ধর্মা বলল, 'কী আর করব, ঘরে ফিরব।'

'অনেকদিন সফেদ গোয়ারিনদের কাছে যাই না। যাবি ?'

গোয়ারদের চৌকাদ গাঁয়ের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে ধর্মাদের কাছে। ওখানে গেলে সময়টা ভালই কাটে। সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোয়ার, স্বামি-স্ত্রী তু'জনেই মানুষ বড় ভালো। ধর্মার একবার ইচ্ছা হলো কুশীকে সঙ্গে করে চৌকাদে চলে যায়। পরে কী ভেবে বলল, 'আজ থাক। কাল তো বগেড়ি নিয়ে ঠিকাদার বাবুদের কাছে যাব। তখন চৌকাদে যাওয়া যাবে।'

কুশী আর কিছু বলে না।

কিছুক্ষণ বাদে হাইওয়ে ঘুরে ওরা দোসাদটোলায় এসে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। মহল্লার পশ্চিম দিকে যেখানে কুয়োটা রয়েছে সেখানে পাঁচ ছ'টা হ্যাজাক জ্বলছে। ওদিকের অনেকটা জায়গা রোশনাইতে ভরে গেছে। আর পুরো দোসাদটোলাটা ওখানে ভেঙে পড়েছে।

ধর্মা আর কুশী তাদের চার মা বাপকে নিজেদের ঘরে দেখতে গেল না। কুয়োর কাছে কেন এত রোশনাই, জানার জন্য খুবই কৌতূহল হতে থাকে তু'জনের। পায়ে পায়ে তারা এগিয়ে যায়।

কাছাকাছি আসতেই ধর্মাদের চোখে পড়ে, পুরনো কুয়োতে বালিকাটার কাজ চলছে। সেই সঙ্গে ঠিক পাশেই একটা নতুন কুয়োও কাটা হচ্ছে। কুয়োতে বসাবার জন্য পোড়া মাটির বিরাট বিরাট অগুনতি চাকা একধারে ডাঁই করে রাখা হয়েছে। বারো চোদ্দটা কুয়াকাটোয়া নতুন এবং পুরনো তুটো কুয়ো কাটতে কাটতে ঘেমে নেয়ে উঠছে।

ভিড়ের ভেতর খুঁজে খুঁজে গণেরিকে বার করে ধর্মা। জিজ্ঞেস করে, 'কা বাত চাচা ? একসাথ দো কুঁয়া ?'

'হঁ—' গণেরি আস্তে মাথা নাড়ে।

'কুয়াকাটোয়ারা এল কখন ?'

'থোড়া আগে। বড়ে সরকার নিজে সঙ্গে করে দিয়ে গেছে!'

ধর্মার গলার স্বর কেঁপে যায়, 'খুদ বড়ে সরকার!' বলতে বলতে তার চোখ গোল হয়ে যায়।

'হঁ রে, হঁ। খুদ এসে পুরানা কুঁয়ার বালি তুলতে আর নয়া কুঁয়া বানাতে হুকুম দিয়ে গেল।'

কুয়া কাটানোর এই ঘটনাটা দোসাদটোলার বাসিন্দাদের খুবই উত্তেজিত করে তুলেছে। হ্যাজাকের আলোয় তাদের চকচকে উজ্জ্বল মুখগুলো দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। কারা যেন ওধার থেকে বলে উঠে, 'বড়ে সরকারকা বহোত কিরপা।'

এধার থেকে আরো কয়েকজন বলে, 'হামনিলোগনকো বহোত সৌভাগ—'

সৌভাগ্য তো নিশ্চয়ই। তাদের মতো অচ্ছুৎদের পাড়ায় বড়ে সরকারের পায়ের ধুলো পড়েছে। এমন উত্তেজক ঘটনা তার জন্মের পর থেকে বাইশ চব্বিশ সালের মধ্যে আর কখনও ঘটেছে কিনা, ধর্মা ভাবতে চেষ্টা করে। দশ বছর ধরে পুরনো কুয়োটা বালিতে বুজে এসেছিল। কতবার তারা বালি কাটাবার জন্য হিমগিরিনন্দনের কাছে আর্জি করেছে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। অথচ বড়ে সরকার আজ শুধু পুরনো কুয়োর বালি সরাবার ব্যবস্থাই করেন নি ; নিজে এসে নতুন কুয়ো কাটাবার হুকুমও দিয়ে গেছেন। এটা দোসাদদের চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য না!

ধর্মা গণেরির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসায়, 'বড়ে সরকার আচানক দুটো কুঁয়া কাটিয়ে দিচ্ছে কেন ?'

চোখ কুঁচকে চাপা গলায় গণেরি বলে, 'মুরুখ গাধ্ধে কাঁহাকা! শুনলি না সবাই বলছে, এটা বড়ে সরকারের কিরপা আর আমাদের বাপ, নানা, নানাকে বাপ, নানাকে বাপকে বাপ—সবার সৌভাগ।'

গলার স্বরটা কেমন যেন শোনায় গণেরির। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ধর্মা, 'নায় নায়—'

রুক্ষ গলায় এবার গণেরি বলে, 'কী না ?'

'তুমি যা বলছ।'

অনেকটা সময় চুপ করে থাকে গণেরি। তারপর মুখটা ধর্মার কানের ভিতর গুঁজে দিয়ে বলে, 'চুনাওকা তৌহার এসে গেল না। বোটমাঙোয়ারা এখন কত কী করে, ছাখ না।'

ধর্মা আর কিছু শুধোয় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুয়োকাটা দেখতে থাকে। চারপাশের লোকজন বড়ে সরকারের মহানুভবতা সম্পর্কে অনবরত বকে যায়। এত বড় একটা মহত্বের দৃষ্টান্ত দেখে তারা যেমন বিগলিত তেমনি কৃতার্থ।

একসময় কুয়োতলার ধার থেকে ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোসাদটোলার বেশির ভাগ মানুষ রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে হাল-বয়েল ঠেলে এসেছে। আরেক দল গিয়েছিল দক্ষিণ কোয়েলের মরা শুখা খাতে বালি খুঁড়ে জল আনতে বা জঙ্গলে সুথনি আর মহুয়ার গোটা যোগাড় করতে। ফিরেই রঘুনাথ সিং এবং কুয়োকাটোয়াদের দেখে তারা একই সঙ্গে এতই উত্তেজিত অভিভূত আর অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ভুখ-তিয়াসের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। প্রথম দিকের সেই চমক এবং উত্তেজনা এখন খানিকটা থিতিয়ে আসায় সবাই টের পাচ্ছে পেটের ভেতর খিদেটা ক্ষ্যাপা জানবরের মতো দাপাদাপি করছে। ফলে একজন দু'জন করে সবাই ঘরে ফিরতে শুরু করেছে।

ধর্মা আর কুশীও তাদের চার মা-বাপকে ভিড়ের ভেতর থেকে খুঁজে বের করে। বলে, 'বহোত ভুখ লেগেছে। ঘরে চল্—'

দোসাদটোলার পুব দিকে কুশী এবং ধর্মাদের ঘর। কুয়োর পাড় থেকে ছ জনে সেদিকে হাঁটতে থাকে।

খানিকটা যাবার পর ডান দিকে ফাগুরামের ঘর। সেখান থেকে হারমোনিয়ামের বাজনার সঙ্গে গানের সুর ভেসে আসছে। চেনা গলা। গারুদিয়া-কোয়েল ফাগুরাম গানের কথা সুরে বসাবার জন্য গলা সাধছে।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধর্মা। বছর কয়েক আগেও গানের দিকে দুর্দান্ত ঝোঁক ছিল তার। তখন ফাঁক পেলেই ফাগুরামের কাছে এসে বসত সে। ফাগুরাম তাকে নৌটঙ্কীর অনেক গান শিখিয়েছিল, পুরনো বেলো-ছেঁড়া হারমোনিয়ামে তালিম দিয়েছিল। তার খুবই আশা হয়েছিল, ধর্মাকে নিজের সাকরেদ করে তুলতে পারবে। কিন্তু ফাগুরাম আর ধর্মার জীবনের ধাঁচই আলাদা। পুরুষানুক্রমে ধর্মারা খরিদী

কিষাণ আর ফাগুরাম হলো স্বাধীন মানুষ। ফাগুরামের যা মানায় ধর্মার মতো জনমদাসের তা কি কখনও শোভা পেতে পারে? সারাদিন বড়ে সরকারের জমিতে গতরচুরণ মেহনতের পর নিজেদের মুক্তির দাম যোগাড় করতে করতে কবে গানের শখ মুছে গেছে, মনেও নেই। চর্চা না থাকলে যা হয়, ফাগুরামের কাছে গান বাজনায় যেটুকু তালিম নিয়েছিল তা কবেই ভুলে গেছে। তবু কখনও কখনও গানের সুর ভেসে এলে সে কান খাড়া করে।

ফাগুরাম তাকে দেখতে পেয়েছিল। তবে অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারেনি। গান থামিয়ে সে শুধোয়, 'কৌন রে?'

ধর্মা সাড়া দেয়, 'আমি ধম্মা ফাগ্‌গুচাচা—'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? অন্দর আ যা—'

কুশীদের পাঠিয়ে দিয়ে ধর্মা ফাগুরামের ঘরে ঢোকে। ঢুকেই তাজ্জব বনে যায়। দোসাদটোলার সবার ঘরেই লাল কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বলে কিন্তু ফাগুরামের এখানে ঝকঝকে কাচ বসানো নতুন দামী লণ্ঠন চোখে পড়ছে। যে হারমোনিয়ামটা সে বাজাচ্ছে সেটা আনকোরা নতুন। লণ্ঠনের আলোয় সেটার গা থেকে জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে। ধর্মা লক্ষ্য করে, ফাগুরামের পুরনো রঙওঠা রিডভাঙা হারমোনিয়ামটা একধারে পড়ে আছে। তার আরো নজরে পড়ে, ঘরের এককোণে রশিতে ক'টা নতুন কাপড় আর কুর্তা ঝুলছে, একজোড়া কাঁচা চামড়ার চকচকে নাগরাও আরেকটা কোণ আলো করে পড়ে আছে। তিন চার সালের ভেতর ফাগুরামকে নাঙ্গা পায়ে ছাড়া কখনও দ্যাখেনি ধর্মা। নতুন ধুতি নতুন জামা তো বেজায় তাজ্জবের কথা, সবসময় তার পরনে থাকত তালি-মারা সেলাই-করা পুরনো ময়লা জামাকাপড়। কী এক জাদুতে সব বিলকুল বদলে গেছে।

ধর্মার মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করছিল ফাগুরাম। গর্বিত হেসে সে বলতে থাকে, 'ঐ যে নয়া ধোতিয়া, জামা, নয়া লালটিন (লণ্ঠন), হারমোনি—সব বড়ে সরকার দিয়েছে। একশো রুপাইয়া ভি। তা দিয়ে নাগরা কিনেছি, সিলভারকা কড়াইয়া কিনেছি, মাথায় দেবার তেল, নয়া কাকাই (চিরুনি)—অনেক জিনিস কিনেছি।'

ফাগুরাম এক নাগাড়ে যে সব জিনিসের নাম করল সে সব ধর্মার মতো জনমদাসের কাছে একান্তভাবেই স্বপ্নের বস্তু। ফাগুরামের কথার উত্তর না দিয়ে চকচকে চোখে সে ধুতি-নাগরা-লালটিন দেখতেই

থাকে। দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে যায়, সেদিন বড়ে সরকার ফাগুরামকে একটা নতুন হারমোনিয়াম দেবার কথা বলেছিলেন। চুনাওর সময় তাতে গান বাঁধতে সুবিধা হবে। কিন্তু হারমোনিয়াম নয়া ধুতি, জামা, লালটিন ইত্যাদি দামী দামী জিনিস ছাড়াও নগদ একশো টাকা ফাগুরাম পেয়েছে জেনে এক ধরনের ঈর্ষা বোধ করতে থাকে ধর্মা।

ফাগুরাম ফের বলে, 'সব কুছ বড়ে সরকারকা কিরপা।' একটু থেমে বলে, 'চুনাওর গানের জন্যে এত সব মেলে কে জানত। বড়ে সরকারকা কিরপাসে বহোত কুছ হো গৈল।' রঘুনাথ সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে ফাগুরামের।

ধর্মা ভাবে, গানের তালিমটা বরাবর নিয়ে গেলে এই চুনাওর সময়টা কাজে লেগে যেত। ভাবে আর আপসোস হয়। পরক্ষণেই তার মনে হয়, এখন আর আক্ষেপ করে ফায়দা নেই। শুকনো গলায় সে বলে, 'চুনাওর গান বেঁধে ফেলেছ?'

ফাগুরাম বলে, 'পুরাটা হয়নি; থোড়া থোড়া হয়েছে। যা হয়েছে শুনবি নাকি?'

'শোনাও না—'

ফাগুরাম ভাবে. এক কালের পুরনো সাকরেদ ধর্মাকে হাতের কাছে পেয়ে ভালই হয়েছে। বড়ে সরকার যে জন্য তাকে এত খাতির যত্ন করছেন, টাকা-পয়সা-হারমোনিয়াম দিয়েছেন তা হল তার গান। তাকে বলা হয়েছে চুনাওর মীটিংয়ে মীটিংয়ে নতুন নতুন গান বেঁধে শোনাতে হবে। গানে এমন সব কথা থাকবে যাতে রঘুনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে চুনাওতে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের সম্বন্ধে শ্রোতাদের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। রাতের পর রাত নৌটঙ্কীর গান গেয়ে আসর মাত করে দিলেও চুনাওর গান ফাগুরামের কাছে পুরোপুরি নতুন। যেটুকু সে বেঁধেছে সেই নমুনাটুকু কাউকে শোনাতে পারলে আন্দাজ পাওয়া যেত এই কিসিমের গান মীটিংয়ের শ্রোতারা পছন্দ করবে কিনা।

ঝড়ের বেগে গাঁটওলা সরু সরু মাংসহীন আঙুলগুলো হারমোনিয়ামের রিডের ওপর চালাতে চালাতে গান শুরু করে দেয় ফাগুরাম:

আপ সিং রঘুনাথ হ্যায়
ক্ষত্রিয়কুল প্রধান

ভোট দিজিয়ে সিংকো
হোগা সব কল্যাণ
বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

যাতুভরি গলা ফাগুরামের। গান থামিয়ে সে শুধোয়, 'কেমন লাগল ধম্মা ?'

শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ধর্মা। খানিক আগের ঈর্ষার অনেকখানিই এখন আর নেই। বড়ে সরকার এমন গলার দাম দিয়ে ভালই করেছেন। ধর্মা বলে, আচ্ছা—'

'লোকের পসন্দ্ হবে ?'

ফাগুরাম খুশী হয় ; হাল্কাভাবে হারমোনিয়াম বাজাতে থাকে।

ধর্মা বলে, 'থামলে কেন ? বাকীটা গেয়ে ফেল ফাগ্‌গু চাচা।'

ফাগুরাম জানায়, গানের বাকী অংশটা এখনও বানানো হয় নি। পরক্ষণেই কী মনে পড়ে যেতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'তুই এখন ঘরে যা ধম্মা।'

এত খাতির করে গান শোনাতে শোনাতে আচমকা ফাগুরাম কেন যে তাকে চলে যেতে বলছে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ধর্মা।

ফাগুরাম ধর্মার মনোভাবটা টের পায়। এবার সে বুঝিয়ে বলে, "কাল গারুদিয়া বাজারে বড়ে সরকার চুনাওর মীটিন করবেন। সেখানে আমাকে পয়লা গাইতে হবে। রাতভর জেগে এখন বাকী গানটা বাঁধব, সুর চড়াব। তুই থাকলে গানা বানানো, সুর চড়ানো কিছুই হবে না। গুস্‌সা হোস না।'

এরপর আর গুস্‌সার প্রশ্ন ওঠে না। ধর্মা মানুষ হিসেবে যথেষ্টই বিবেচক। সে উঠে পড়ে।

ফাগুরাম বলে, 'গানটা পুরা হলে তোকে পরে শুনিয়ে দেব।'

'ঠিক ছায়।' ফাগুরামের ঘর থেকে বারান্দা পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামে ধর্মা।

উনিশ

পরের দিন সকালে খামারবাড়িতে হাল-বয়েল নেবার জন্য আসতেই হিমগিরি ধর্মাদের জানায়, 'আজ তুরন্ত ক্ষেতির কাম চুকিয়ে ফেলবি। সূরয ডুববার অনেক আগে হাল-বয়েল এখানে জমা দিয়ে বসে থাকবি। এখান থেকে মুনশীজী তোদের এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কানমে ঘুষল্—'

সবাই সমস্বরে জানায়, 'হঁ হুজৌর—'

ধর্মার আচমকা মনে পড়ে, অনেকদিন পর কাল বগেড়ির জন্য সাবুই ঘাসের জঙ্গলে ফাঁদ পেতে রেখে এসেছে। খামারবাড়িতে মুনশী আজীবচাঁদের জন্য কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানা নেই। তারপর মুনশীজী কোথায় নিয়ে আরো কতটা সময় আটকে রাখবে তারও ঠিক নেই। রাত বেশি হয়ে গেলে বগেড়ি নিয়ে ঠিকাদারদের কাছে যাওয়া যাবে না। কয়েকটা টাকার যে আশা ছিল তা পুরোপুরি বরবাদ।

ভয়ে ভয়ে ধর্মা শুধোয়, 'হুজৌর, মুনশীজী আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?'

হিমগিরিনন্দন সরু গলায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'গেলেই দেখতে পাবি। সূরয চড়ে যাচ্ছে। আভ্‌ভী ক্ষেতিতে চলে যা।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না ধর্মার। এই সকাল-বেলাতেই হঠাৎ তার মাথায় খুন চড়ে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, কভ্‌ভী নায়, কভ্‌ভী নায়। সূরয ডোবার আগে হাল-বয়েল জমা দিয়ে মুনশীজীর জন্য সে কিছুতেই বসে থাকবে না। কিন্তু যা ইচ্ছে করে তা কি আর মুখ ফুটে বলা যায়! বিরক্ত অসন্তুষ্ট ধর্মা রাগে ঘাড় গোঁজ করে রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে এসে জমি চষতে শুরু করে দেয়।

অন্য সব দিনের সঙ্গে আজকের কোন তফাত নেই। দুপুর পর্যন্ত একটানা লাঙল ঠেলা, দুপুরে কালোয়া খেয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে ফের ক্ষেতিতে নেমে পড়া—সব কিছু একই নিয়মে ঘটে যায়। এর মধ্যে হাইওয়ে দিয়ে বড়ে সরকারের ভোটের গাড়ি আর নেকীরাম শর্মার

ঘোড়ায়-টানা টাঙ্গা 'বোট দো' 'বোট দো' করতে করতে বিজুরি তালুকের দিকে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। বড়ে সরকার আর প্রতিভা সহায়ের মতো নেকীরামের জীপ নেই। অগত্যা টাঙ্গায় করেই কয়েকটা ছোকরা তার জন্য ভোট চাইতে বেরিয়েছে।

কাল তবু আকাশে অল্প স্বল্প টুকরা টাকরা মেঘ ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। আজ তার ছিটেফোঁটাও নেই। গলা কাঁসার মতো গনগনে আকাশ থেকে জেঠ মাহিনার ঝাঁ ঝাঁ রোদ নেমে আসছে।

বিকেল হতে না হতেই দেখা গেল, লঝঝড় সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে বগুলা ভকত এসে হাজির। অন্য দিন বিদঘুটে টেরাবাঁকা চেহারার সীসম বা পরাস গাছের গায়ে সাইকেলটা ঠেসান দিয়ে রেখে রামলছমন ক্ষেতিতে ক্ষেতিতে ঘুরে সবার কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর বকের মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে যুবতী দুসাদিনদের পেছন পেছন ছোঁক ছোঁক করতে থাকে। আজ কিন্তু সাইকেলটা ধরে থেকেই ভীষণ ব্যস্তভাবে চেঁচাতে লাগল, 'এ গণেরি, এ ধম্মা, এ মাধো— আজ আর কাম করতে হবে না। হাল-বয়েল নিয়ে তুরন্ত আমার সাথ চল্—'

শুধু ধর্মাদেরই না, তাড়া দিয়ে দিয়ে মরসুমী আদিবাসী কিষাণ-গুলোরও কাজ বন্ধ করে দেয় রামলছমন। তারপর সবাইকে নিয়ে সোজা খামারবাড়িতে চলে আসে।

সূরয ডোবার আগে জমি চষা থামালে বড়ে সরকারের পা-চাটা কুত্তারা যেখানে ক্ষেপে ওঠে, সেখানে আজ কী এমন হল যে কাজ বন্ধ করিয়ে বগুলা ভকত তাদের ডেকে নিয়ে এল!

বড় সড়ক দিয়ে আসতে আসতে গণেরি জিজ্ঞেস করে, 'কা দেওতা, আজ সূরয ডোবার আগেই কাম বন্ধ করে দিলে কেন?'

রামলছমন দাঁত বার করে বলে, 'তোদেরই তো দিন এখন গিদ্ধড়েরা। ভোটের পরব এসেছে। পাওকা জুত্তি এবার মাথায় চড়বে।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না। গণেরি বিমূঢ়ের মতো শুধোয়, 'কা মতলব দেওতা?'

'চল্ না, গেলেই বুঝতে পারবি।'

খামারবাড়িতে এসে ধর্মারা দেখতে পায়, শুধু তারাই না, দোসাদ-টোলার বাত্তিল বুড়োবুড়ি বাচ্চা-কাচ্চারা গাদা মেরে বসে আছে।

দোসাদরা ছাড়াও গারুদিয়া তালুকের দূর দূর গাঁ থেকেও এনে জড়ো করা হয়েছে আরো চার পাঁচ হাজার লোককে। খামারবাড়ির সামনের দিকের রাস্তায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ষাট সত্তরটা বয়েল এবং ভৈসা গাড়ি।

এত লোকজন, এত গাড়ি দেখে ধর্মারা তাজ্জব। গণেরি, বুধেরি, ধর্মা অর্থাৎ জমিন থেকে যারা যারা রামলছমনের সঙ্গে এসেছে চাপা নিচু গলায় দোসাদটোলার বাতিল বুড়োবুড়িদের শুধোয়, 'কা রে, তোরা এখানে ?'

বুড়োবুড়িরা জানায়, হিমগিরি লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকিয়ে এনেছে।

'কায় ?'

'কা জানে —'

অন্য গাঁয়ের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করেও একই উত্তর পাওয়া যায়। তাদেরও লোক পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এতগুলো লোক যোগাড় করা হয়েছে, কেউ জানে না। শুধু বলা হয়েছে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের তলব। তাতেই সুড় সুড় করে সবাই 'এক মিল' 'দো মিল' 'তিন মিল' কি তারও বেশি রাস্তা জেঠ মাহিনার তেজী সূরয মাথায় নিয়ে গৈয়া কি ভৈসা গাড়িতে চেপে চলে এসেছে।

আচমকা হিমগিরিনন্দন তুরপুন চালানো সরু গলায় ধর্মাদের উদ্দেশে চেঁচাতে থাকে, 'তুরন্ত সবাই হালবয়েল জমা দিয়ে ভৈসা আর বয়েল গাড়িতে গিয়ে ওঠ।' বলে সামনের গাড়িগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, শুধু ধর্মাদেরই না, তাড়া দিয়ে দিয়ে হিমগিরি এবং রামলছমন অন্য সবাইকেও গাড়িগুলোতে তুলে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ষাট সত্তরটা গাড়ি লাল ধুলো উড়িয়ে মিছিল করে চলতে শুরু করে।

এদিকে জ্যৈষ্ঠের সূর্য ডুবে গেছে। গারুদিয়া তালুকের ওপর আবছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। এতক্ষণ উল্টোপাল্টা বাতাস গরম ভাপ ছড়াচ্ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

একসময় গাড়িগুলো গারুদিয়া বাজারের পশ্চিম দিকের খোলা

মাঠে এসে পড়ে। এধারে ওধারে তাকিয়ে ধর্মারা বেজায় হকচকিয়ে যায়। মাঠ জুড়ে যতদূর চোখ যায় অগুনতি মানুষ আগে থেকেই এসে বসে আছে। তা দশ পনের হাজার তো নিশ্চয়ই। লোকজনের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে বিজলি বাতি আর লাউড স্পীকারের চোঙ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে শুধু রোশনি আউর রোশনি।

সামনের দিকে লাল সালুর কাপড় দিয়ে মোড়া বিরাট উঁচু মঞ্চ। সেখানে প্রচুর চেয়ার টেবল সাজানো রয়েছে। একদিকে রয়েছে সাদা ফরাস পাতা। গোটা মঞ্চটা এখন একেবারে ফাঁকা।

একটা বয়েল গাড়িতে ধর্মার পাশে বসে ছিল গণেরি। বলে, 'অব্ সমঝ গৈল—'

ধর্মা শুধোয়, 'কা গণেরিচাচা ?'

'বড়ে সরকারকা চুনাওকা 'মীটিন' হোগা ইধরি। উসি লিয়ে হামনিলোগনকো ইধরি লেকে আয়া—'

'হুঁ ?'

'হুঁ।'

সকালবেলা হিমগিরি তাড়াতাড়ি ক্ষেতির কাজ চুকিয়ে আজ ধর্মাদের চলে আসতে বলেছিল। তাতেও তর সয়নি। দুপুরের তেজ পড়তে না পড়তেই রামলছমনকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এতক্ষণে বোঝা যায়, কেন সূর্যাস্তের আগেই তাদের ক্ষেতি থেকে উঠিয়ে এত খাতির করে গাড়িতে চাপিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

গণেরি চাপা নীচু গলায় বলে, 'হামনিলোগনকো বহোত সৌভাগ—'

গণেরির গলার স্বরে এমন কিছু রয়েছে যাতে ধর্মা ঘাড় ফেরায়, 'কায় চাচা ?'

'আরে মুরুখ গাধ্ধে, গাড়িতে চড়িয়ে মীটিনে নিয়ে এল, আমাদের সৌভাগ না ?'

ধর্মা কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হয় না। এই সময় কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে মুনশী আজীবচাঁদ, ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ আর কয়েকটা ছোকরা উঠে আসে যেন। জমি চষতে চষতে এই ছোকরাগুলোকে বড়ে সরকারের ভোটের গাড়িতে করে পাক্কী দিয়ে অনেকবার বিজুরি তালুকে যাতায়াত করতে দেখেছে ধর্মারা।

মুনশী আজীবচাঁদ চিৎকার করে বলতে থাকে, 'রুখ যা, রুখ যা—'

কাতার দিয়ে বয়েল আর ভৈসা গাড়িগুলো মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে যায়। আজীবচাঁদ এবং অযোধ্যাপ্রসাদরা সবগুলো গাড়ির কাছে ছোটাছুটি করতে করতে সওয়ারীদের উদ্দেশ্যে চেঁচাতে থাকে, 'উতারকে আ, উতারকে আ—' এর মধ্যে অযোধ্যাপ্রসাদের উৎসাহই সব চাইতে বেশি। বোঝা যায়, এত সব গৈয়া ও ভৈসা গাড়ির ব্যবস্থা সে-ই করেছে।

হুড়মুড় করে গাড়িগুলো থেকে লোকজন নেমে পড়ে।

মাঠের যেখানটায় আগে থেকেই কয়েক হাজার মানুষ বসে পড়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আযোধ্যাপ্রসাদরা বলতে থাকে, 'উধার যাকে বৈঠ। ধীরেসে—ধীরেসে। বড়ে সরকার আভ্‌ভি আ যায়েগা। উসকা বাদ মীটিন চালু হোগা—'

গাড়ি থেকে নেমে ধর্মারা মাঠের ভিড়ে মিশে যায়। মীটিং কখন শুরু হবে তার ঠিকঠিকানা নেই। ধর্মা এবং তার সঙ্গী সাথীরা আগে থেকে যারা এসে বসে আছে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। কথায় কথায় জানা যায়, আজ ভোর থেকেই বড়ে সরকারের লোকেরা বয়েল আর ভৈসা গাড়ি পাঠিয়ে তাদের আনিয়ে নিয়েছে। সেরেফ মীটিনকা লিয়ে।

রাত একটু বাড়লে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং তাঁর পা-চাটা কুত্তাদের নিয়ে দামী টমটম চালিয়ে মীটিংয়ের মাঠে চলে আসেন এবং টমটম থেকে নেমে সোজা মঞ্চে গিয়ে ওঠেন। কা তাজ্জবকি বাত, বড়ে সরকারদের পেছন পেছন ফাগুরামকেও দেখা যায়। তার গলায় রঘুনাথ সিংয়ের দেওয়া সেই নতুন ঝকমকে দামী হারমোনিয়ামটা। পরনে নতুন ধুতি কুর্তা পাগড়ী, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। ভোল একেবারে পাল্টে গেছে ফাগুয়ার। সে গিয়ে ফরাসে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়ে। বোঝা যায়, চুনাওর এই মীটিংয়ে বড়ে সরকার কিছু গানবাজনার ব্যবস্থা করেছেন।

বড়ে সরকার এবং তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গীরা মঞ্চের চেয়ারগুলো দখল করে বসে। অযোধ্যাপ্রসাদ ও কয়েকটা ছোকরাও তাঁদের সঙ্গে ওপরে উঠেছিল। তারা গলা ফাটিয়ে মাইকে স্লোগান দিতে শুরু করে।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'রঘুনাথ সিং এম্লে হোনেসে কা মিলি?'

'রামরাজ রামরাজ।'

'হাঁথীমার্কা কাগজ পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

লাউডস্পীকারে এইসব কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে। সারা মাঠ গমগম করতে থাকে।

একসময় শ্লোগান শেষ হয়। মীটিং-এর পরিবেশটা মোটামুটি তৈরি হয়ে যায়। বড়ে সরকারের প্যারা দোস্ত মহকুমার বড় ভকিল গিরধরলালজী ছোকরাদের হাতের ইসারায় সরিয়ে দিয়ে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ান। বলেন, 'ভাইলোগ আউর বহিনো, আপনারা সবাই জানেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংজী এবার গারুদিয়া আউর বিজুরি তালুক থেকে চুনাওতে নেমেছেন। এ আমাদের সবার বহোত বহোত সৌভাগের কথা। ভগোয়ানের দয়ায় আউর রঘুনাথজীর কিরপায় দুই তালুকের হর আদমীর দুখ, কষ্ট, অভাব—বিলকুল সব চলে যাবে। এখানকার সব আদমীর মুখে হাসি ফুটবে। ভুখা-নাঙ্গা কাউকে থাকতে হবে না। তব্ হাঁ, এ সব চাইলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। চুনাওতে যাতে বড়ে সরকার জিততে পারেন তার ব্যওস্থা করা দরকার। ভেইয়া আউর বহিনরা, সেই ব্যওস্থা রয়েছে আপনাদের হাতে। আজাদীর পর থেকে আপনারা কতবার চুনাও দেখলেন, কত লোককে এম-এল-এ বানালেন, এম-পী বানালেন। মগর কিছু হল কী? কিচ্ছু হয় নি। চুনাও আসে, চুনাও যায়। আজাদীর আগে আপনারা যেখানে ছিলেন ঠিক সেখানেই পড়ে আছেন। আপনাদের দুখ দেখে বড়ে সরকার মনমে বহোত দুখ পান। তাঁকে অনেক বলে কয়ে হাতে-পায়ে ধরে এবার আমরা চুনাওতে নামিয়েছি। হাতীমার্কা কাগজে মোহর মেরে তাঁকে জেতান। মনে রাখবেন, বড়ে সরকার জিতলে গারুদিয়া আউর বিজুরি তালুকে জরুর রামরাজ নেমে আসবে।' বলেই হাতের ইসারায় সেই ছোকরাগুলোকে ডেকে শ্লোগান দিতে বলেন গিরধরলালজী।

মঞ্চের পেছন থেকে ছোকরাগুলো মাইকের কাছে এসে আবার শ্লোগান দিতে থাকে।

'হাঁথীমার্কা কাগজ পর—'
'মোহর মারো, মোহর মারো।'
'রঘুনাথ সিং জিতনেসে কা মিলি—'
'রামরাজ, রামরাজ।'

দ্বিতীয় প্রস্থ শ্লোগানের পর গিরধরলাল ফের বলেন, 'ভেইয়া আর বহিনরা, আপনারা সবাই শুনেছেন, এবার চুনাওতে রঘুনাথজী ছাড়া আর যারা নেমেছেন তারা হল প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, সুখন রবিদাস আউর আবু মালেক। মনে রাখবেন দুখ-কষ্ট-অভাব, এ সবের হাত থেকে বাঁচতে হলে রঘুনাথজীকে ভোট দিতেই হবে। মনে রাখবেন হাতীমার্কা কাগজে মোহর মারতে হবে।' বলেই আকাশের দিকে হাত তুলে গিরধরলাল চেঁচিয়ে ওঠেন, 'রঘুনাথ সিং—'

সেই ছোকরাগুলোকে আগে থেকেই শেখানো ছিল। তারা একসঙ্গে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যুগ যুগ জীও—'

'রঘুনাথ সিং—'
'যুগ যুগ জীও।'
'বাঁচনা ছায় তো—'
'হাঁথীমে মোহর।'
'বঁচনা ছায় তো—'
'হাঁথীমে মোহর।'

মীটিং সরগরম করে বড় উকিল গিরধরলাল বলেন, 'ভেইয়া আউর বহিনরা, এবার বড়ে সরকারের মুখ থেকে আপনারা কিছু শুনুন—' বলেই নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়ে বসে পড়েন।

রঘুনাথ সিং তাঁর বিপুল শরীর নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁর চেহারার যা বহর তাতে 'হাতী'র প্রতীকটি বড়ই মানানসই হয়েছে। মাইকের ডাঁটিটা ধরে তিনি বলেন, 'ভাইরা আর বহিনরা, আমি আগে কিছু বলব না। আমার বলার আগে থোড়াকুছ গানাবাজনা হবে। গারুদিয়ার কোয়েল ফাগুরামকে তো আপনারা চেনেন।'

কয়েক হাজার শ্রোতা সমস্বরে চিৎকার করে জানাল, 'হঁ-হঁ, সরকার। ও নৌটঙ্কীবালা—'

'হাঁ—নৌটঙ্কীবালা। ওর গলার আওয়াজ বড়ী মিঠি। ফাগুরাম ক'টা গান বেঁধেছে। আগে সেই গানগুলো শুনে নিন।' বলে

ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে দু হাতের দশ আঙুল চালিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে শুরু করে ফাগুরাম। তার সামনেও একটা মাইক রয়েছে।

ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালার নাম জানে না, বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন লোক নেই। নেহাত কয়েক সাল ফাগুরামের খারাপ সময় যাচ্ছে। বুকের দোষ হওয়াতে এখন আর নৌটঙ্কীর আসরে গাইতে পারে না। তবে আগে যারা একবার তার গান শুনেছে, এখনও ভুলতে পারেনি। গারুদিয়া বাজারের গায়ে এই চুনাওর মীটিংয়ের কয়েক হাজার শ্রোতা চনমনিয়ে উঠে পিঠ খাড়া করে বসে।

একসময় বাজনা থামিয়ে ফাগুরাম বলে, 'বড়ে ভকীলজীর মুহ্‌মে আপনারা শুনেছেন, এহী সাল চুনাওতে নেকীরাম শর্মা, পরতিভা সহায়, সুখন রবিদাস, আবু মালেক নেমেছে। আমি এদের নিয়ে গানা বেঁধেছি। সিরিফ মালেকসাব বাদ। মালেকসাবের গানা পরে বেঁধে সবাইকে শোনাব।' বলেই ফের হারমোনিয়ামে ঝড় তুলে বাজাতে শুরু করে। 'আ আ' করে সুরটাকে গলায় বসিয়ে গানও ধরে :

বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম---
শর্মাজীকো দেখিয়ে
ভুল ধরমকা গ্যেয়ান।
চারো হাতসে সুদ মাঙতা,
সুদমেই পুরা ধেয়ান।
ভোট মাঙনে আয়ে হে
হোতে সব হয়রান।
বোল প্যারে বোল প্যারে·······

গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোকরাগুলো মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে তালে তালে দু হাতে তালি বাজাতে লাগল। তেজ্বী বিজলী আলোয় দেখা যাচ্ছে বড়ে সরকার মুখ টিপে টিপে হাসছেন। তাঁর সঙ্গীদের মুখেও হাসি। বোঝা যায়, ফাগুরামের গান শুনে তাঁরা পরিতৃপ্ত।

শ্রোতারাও খুব হাসছিল। গণেরির পাশে বসে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে ধর্মা। সে বলে, 'ফাগ্‌গুচাচা বহোত আচ্ছাই গান বেঁধেছে। কা মজাদার!'

এখানে বলে নেওয়া দরকার, নেকীরাম শর্মা স্কুলে পড়ালেও তার

গোপন সুদের ব্যবসা আছে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত সুদখোর সে। তার কাছ থেকে 'করজ' নিলে ফী মাসে টাকায় আট আনা সুদ। গারুদিয়ার কত লোকের রক্ত চুষে চুষে সে যে ছিবড়ে করে দিয়েছে তার হিসেব নেই।

ফাগুরাম এবার তার দু নম্বর গান শুরু করে।

কায়াথকুলকি পরতিভা
হ্যায় নখরোকি খান
ভোট মাঙনে আয়ী হ্যায়
হাঁসে সকল জাহান।
পরতিভাকে ভোট দেনেসে
হো যায়গা বাজরাজ (বাঁজা মেয়ে মানুষের রাজত্ব)।
বোল সখী বোল সখী
ক্যায়সে মিলে রামরাজ।

হাততালির তোড় এবার বেড়ে যায়। মঞ্চের সেই ছোকরা-গুলোই না, শ্রোতাদের মধ্যেও সংক্রামক ব্যায়রামের মতো তা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

পয়সাওলা বড়ে ঘরকা বহু আঁটকুড়ো প্রতিভা সহায়কে এবারকার চুনাওয়ে ভোট মাঙবার জন্য দু-চারটে গাঁওয়ে ঘুরতে দেখা গেছে। তাঁর সাজগোজ ঠাটঠমকই অন্যরকম। ফাগুরাম তাঁর চালচলনকে খোঁচা দিয়ে এই গান বেঁধেছে।

ভিড়ের ভেতর আর সবার সঙ্গে প্রাণভরে হেসেই যাচ্ছে ধর্মা।

ফাগুরাম এবার তিসরী নম্বর গান শুরু করে ঃ

চুনাওরাজমে দেখিয়ে
হ্যায় আচরজকে (আশ্চর্য) খান
চোরচামারকি জাত হ্যায়
সুখন দাস মহান।
বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

জাতপাতের দারুণ কড়াকড়ি এখানে। নিজে অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের বংশধর হয়েও রঘুনাথ সিংয়ের জন্য আরেক অচ্ছুৎকে নিয়ে গান বানিয়েছে ফাগুরাম। হাজার হাজার অচ্ছুৎ, ভূখানাঙ্গা জনমদাস, মরসুমী কিষাণ, নিভূম ক্ষেতমজুর এই গানের ভেতর কী আছে,

তলিয়ে বোঝে না। বুঝবার শক্তিও নেই। গানটার বাইরের দিকে যে গাঁজানো মোটা রসের মজা আছে তাতেই তারা খুশী। তারা হাসতেই থাকে।

চার নম্বর গানটা ধরার আগে হারমোনিয়াম থামিয়ে মাইকের কাছে মুখ এনে ফাগুরাম বলতে থাকে, 'শর্মাজী, পরতিভাজী আউর সুখন দাস ক্যায়সা আদমী, আপনারা জানেন। তবু আরেক বার মনে করিয়ে দিলাম। এইসব আদমী চুনাওতে জিতে এম্লে বনলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আভি শুনিয়ে—' বলে রঘুনাথ সিংয়ের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে গান ধরে ফাগুরাম:

আপ রঘুনাথ সিং হ্যায়
ছত্রিয়কুল প্রধান
ভোট দীজিয়ে সরকারকো
হোগা সব কল্যাণ
বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম।....

গান থামার পর সেই ছোকরাগুলো ফের হাতী চিহ্নে মোহর মেরে রঘুনাথ সিংকে চুনাওতে জেতাবার জন্য শ্লোগান দিতে থাকে।

শ্লোগানের পর রঘুনাথ সিং ফের মাইকের সামনে দাঁড়ান। আবার বলতে শুরু করেন, 'ভাইয়া আউর বহিনরা, আপনারা গিরধরলালজীর কথা শুনেছেন, ফাগুরামের গান শুনেছেন। শুনে প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, সুখন রবিদাস—এরা কীরকম আদমী, জরুর বুঝতে পেরেছেন। নেকীরাম বামহন হয়েও সুদখোর, যে তার কাছ থেকে করজ নেয় সে তার খুন চোষে। সুখন দাস অচ্ছুৎ, সে জন্য আমি তাকে ঘেন্না করি না, তার নামে উঁচা জাতের লোকেদের মতো তিনবার 'থুক' দিই না। তবে ও জানে কী? বোঝে কী? এম-এল-এ হওয়া কি সোজা ব্যাপার? ছেঁড়া জুত্তি কি রামচন্দরজীর সিংহাসনে উঠতে পারে? আর ঐ প্রতিভা সহায়? বড়ে ঘরকা বহু। মোটরিয়া ছাড়া এক কদম ফেলতে পারে না। হাজার রুপাইয়ার কমে শাড়ি পরে না। শহরবালী পাইসাবালী ঔরতের শখ হয়েছে চুনাওতে নামবে। লেকেন ও ভুখানাঙ্গা গরীব গাঁওবালা ভারতবাসীর দুঃখকষ্ট কী জানে! এর আগে ক'রোজ ও গাঁওমে এসে থেকেছে! কোনটা ধানগাছ, কোনটা গেঁহু গাছ, ও ফারাক করতে পারবে? ও ঔরত কভ্‌ভী সড়কের চায়

দুকানে বসে কিষাণদের সঙ্গে চায় খেয়েছে ; কভী গাঁওকা ক্ষেতিসে নহরকা বগলমে টাট্টী কী ? ও আপনাদের কেউ নয়, ওর সঙ্গে আপনাদের কোঈ সম্পর্ক নেহী। একটা কথা শুধু বলে রাখি, আমিই একমাত্র আপনাদের লোক – আপনা আদমী। জনম থেকে আপনাদের পাশাপাশি এই গাঁওমেই আছি। আপনাদের ছেড়ে কোনদিন শহরে চলে যাই নি। আমি জানি আপনা-পরায় চিনে নিতে ভুল করবেন না আপনারা। আমার কথা খতম। ভাইরা আউর বহিনরা, সবাইকে পরণাম। কেউ পায়দল চলে যাবেন না। আপনাদের জন্যে গাড়ি মজুদ রয়েছে। আপনাদের সবাইকে ঘরে পৌঁছে দেবে। পরণাম, পরণাম—'

রঘুনাথ সিং মাইকের কাছ থেকে সরে যান। সেই ছোকরারা আরেক বার গলার শিরা ছিঁড়ে শ্লোগান দিতে থাকে।

রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'হাঁতী মার্কামে—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

মধ্যরাতের কিছু আগে আগে গৈয়াগাড়িতে ফিরে আসছিল ধর্মা। তার পাশাপাশি বসে আছে আধবুড়ো গণেরি। সামনে পেছনে আরো শ'খানেক গাড়ি চলেছে। দিগন্ত জুড়ে এক শো গাড়ির দু'শো চাকায় অনবরত ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হতে থাকে।

গোটা রাস্তাটা এখন সরগরম। চাকার আওয়াজ তো আছেই। তা ছাড়া প্রতিটি গাড়িতেই রঘুনাথ সিংয়ের এই 'চুনাওকা মীটিন' নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

ক'দিন আগেই পূর্ণিমা গেছে। আকাশের মাঝখানে রুপোর প্রকাণ্ড কটোরার মতো গোল চাঁদ তখন চোখে পড়ত। এখন চাঁদটার বারো আনা ক্ষয়ে ক্ষয়ে সিকিভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তার দু'ধারে অবারিত শস্যক্ষেত্র। দূরে দূরে ঝাপসা দু-একটা দেহাত ঘুমে অসাড় হয়ে আছে। চারপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে লক্ষ কোটি জোনাকি উড়ছে।

ধর্মা হঠাৎ ডেকে ওঠে, 'চাচা—'

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে বসে ছিল গণেরি। মুখ তুলে সে

বলে, 'কা?'

'ফাগ্‌গু চাচা বহোত আচ্ছা গাইল আজ। গানগুলোও আচ্ছাই বেঁধেছে। না গণেরি চাচা?'

গম্ভীর গলায় গণেরি বলে, 'তা বেঁধেছে। লেকেন আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কী?'

'ফাগ্‌গুটার জান চৌপট না হয়ে যায়।'

ধর্মাকে এবার চিন্তিত দেখায়। ভীতু গলায় সে শুধোয়, 'কায় চাচা?'

গণেরি এবার যা বলে তা এই রকম। যাদের খোঁচা দিয়ে ফাগুরাম এই সব গান বেঁধেছে তারাও পাইসাওলা বড়া আদমী। এই গান শুনে নিশ্চয়ই তারা খুশী হবে না। ফাগুরাম বাড়াবাড়ি করলে তার বিপদ ঘটে যেতে পারে।

ধর্মার আচমকা মনে পড়ে যায়, খানিকক্ষণ আগে চুনাওর মীটিংয়ে ফাগুরামের গান শুনে সবাই যখন হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, গণেরি তখন থমথমে মুখে চুপচাপ বসে ছিল। তা ছাড়া সেদিন বড়ে সরকার যখন ফাগুরামকে ডাকিয়ে প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মাদের নামে গান লেখার দায়িত্ব দেন তখনও তার দুশ্চিন্তার কথা বলেছে গণেরি।

চুনাওর এই সব গানের মধ্যে শুধু হাসি আর মজাই নেই, মারাত্মক বিপদও রয়েছে। ফাগুরামের ভবিষ্যতের কথা ভেবে হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে ধর্মা।

একসময় কয়েকটা গৈয়াগাড়ি দোসাদটোলায় পৌঁছে যায়। বাকীগুলো গারুদিয়া তালুকের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কুড়ি

রঘুনাথ সেই যে কুয়োকাটাইদের পাঠিয়েছিলেন, তারা পুরনো কুয়োর বালি তো সাফ করেছেই, নতুন একটা কুয়োও কাটিয়ে দিয়ে গেছে। ফলে দোসাদটোলায় জলের কষ্টটা আর নেই। আগে কুয়ো ছেঁচে ময়লা শ্যাওলা-ভাসা জল দু-এক লোটা তুলে মাথায় ঢালতে হতো।

মোটরে চড়ার লোভটা দোসাদদের ওপর কী প্রতিক্রিয়া করছে, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তা লক্ষ্য করতে থাকে।

এই জনমদাসেরা চোদ্দ পুরুষে দু-একবার বাসে চড়া ছাড়া কখনও মোটরে চড়ে নি। হাওয়াই গাড়িতে তাদের চুনাওর মীটিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নিজেদের কানে শুনেও এত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপারটা তারা যেন পুরা বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকার পর একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'সচমুচ মোটরিয়া চড়ে?'

অবোধনারায়ণ হাসে, 'সচমুচ না তো কী, ঝুটফুস?'

'নায়! অ্যায়সাই পুছল।'

অবোধনারায়ণ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কুয়োর পশ্চিম ধারের একটা বারান্দা থেকে ধনপতের বাপ বুড়ো গৈরুনাথ চিলের গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামনি মোঠরিয়া চড়েগা, হামনি মোটরিয়া চড়কে মীটিন যায়েগা।'

গৈরুনাথের বয়েস হয়েছে শ'য়ের কাছাকাছি। পন্দর বিশ সাল আগে তার কোমর পড়ে গেছে, পায়ে, শোথ ধরেছে চামড়া ফেটে এখন কষ বেরোয়। চোখের রোশনি কবেই মরে গেছে। কিন্তু যম তাকে এখন পর্যন্ত ছোঁয় নি। বোধ হয় বিনাশ নেই গৈরুনাথের। অকেজো পঙ্গু বাতিল এই মানুষটা দিনরাত বারান্দায় দড়ির চৌপায়ায় শুয়ে থাকে। ছেলে ধনপত, পুতাহী লখিয়া এবং নাতি-নাতনীরা সর্বক্ষণ তার মৃত্যু কামনা করে, কেননা তার পাকস্থলীটা এত বয়সেও মারাত্মক রকমের তেজী। একটা টগবগে জোয়ান মরদের পুরো খাদ্য সে হজম করে ফেলতে পারে। যে একটা পয়সা কামায় না, এক কণা খাবার জুটিয়ে আনার ক্ষমতা যার নেই তাকে শুইয়ে শুইয়ে খাওয়াতে কে আর চায়? কিন্তু কী আশ্চর্য, গৈরুনাথ বছরের পর বছর বেঁচেই থাকে। চোখে তেজ না থাকলেও কানদুটো তার অত্যন্ত প্রখর। এই একশো বছর বয়সে মোটর গাড়ি চড়ার দুর্মর লোভ হঠাৎ তাকে পেয়ে বসে।

গৈরুনাথের পুতাহী অর্থাৎ ধনপতের বউ লখিয়া বারান্দায় বুড়োর কাছাকাছি বসে লম্বা ঘোমটা টেনে অবোধনারায়ণদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ঘোমটার তলা থেকে চাঁছাছোলা খনখনে গলায় চেঁচাতে থাকে, 'বুড়হা শিয়ারের মোটরিয়ায় চড়ার শখ গজিয়েছে। গিধ কাঁহাকা! মোটরিয়ায় তুলে তোকে চিতায় দিয়ে আসব। মর,

মর, মর—' মেয়েমানুষটার গলায় বিষ, জিভে ছুরির ধার।

ধনপত স্বামীর অধিকারে গর্জে ওঠে, 'চুপ হো যা মন্নুয়াকি মাঈ, চুপ হো যা—' নিজেরা অকর্মণ্য বাপের সঙ্গে ঘরে যে ব্যবহারই করুক, সেটা নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু এত লোকের, বিশেষ করে অবোধনারায়ণের মতো মান্যগণ্য বড়া আদমীর সামনে বউ তার বাপকে এভাবে অসম্মান করবে সেটা ছেলে হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।

দোসাদটোলার মাতব্বর হবার অধিকারে গণেরিও চাপা গলায় ধমকায়, 'চুপ হো যা ধনপতকি বহু—'

লখিয়ার গলার স্বর খানিকটা নামে ঠিকই কিন্তু ঘোমটার তলায় সে গজ গজ করতেই থাকে।

নিজের সংসারে গৈরুনাথের দাম একটা ফুটো কড়িও নয়। ছেলে, পুতাহী, নাতিনাতনী—সবার কাছে বিলকুল বাতিল হয়ে গেলেও চুনাওর চোখে সে একটি অত্যন্ত মূল্যবান মানুষ। একটা মানুষ মানে একটা ভোট।

অবোধনারায়ণ মুরখ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক নয়। সে চটপট বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, জরুর মোটরিয়ায় চড়ে তুমি মীটিনে যাবে।' বলে জমায়েতের দিকে ফেরে, 'সাত আট রোজ বাদে সন্ধ্যেবেলায় সুরয ডোবার পর গাড়ি পাঠিয়ে দেব, মনে রাখিস। ঐ সময়টা সবাই মহল্লাতেই থাকিস। কবে মীটিন তার আগের দিন এসে জানিয়ে যাব।'

ভিড়ের ভেতর মোটরে চড়ে মীটিংয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে চাপা উত্তেজনা এবং গুঞ্জন চলতে থাকে।

অবোধনারায়ণ ফের বলে, 'একটা কথা ভেবে দেখিস, পরতিভাজীকে ভোট দিলে তোদের ভালাই হবে। বহোত বড় ঘরকা লেড়কী পরতিভাজী, বড়ে ঘরকা বহু। উনি যা বলবেন গরমিণ্ট তা করবে। পরতিভাজীকে যদি এম্লে বানিয়ে দিতে পারিস, গারুদিয়া আউর বিজুরির হাল ফিরে যাবে। এখানে অসপাতাল বসবে, ডর্জন ডর্জন পাক্কী সড়ক হবে, গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্কুল চালু হবে, কারখান্না ভি বসে যাবে। পরের জমিনে হাল ঠেলে জান বরবাদ করতে হবে না; কারখান্নায় মোটা তলবে তোরা নৌকরি পেয়ে যাবি।'

জনমদাসেরা কেউ কোন কথা বলে না। তারা একবার অবোধনারায়ণকে, আরেক বার নিজেদের মাতব্বর গণেরিকে দেখতে

থাকে। গারুদিয়া-বিজুরিতে কারখানা বসবে, নৌকরি মিলবে, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে গতর চূরণ করে লাঙল ঠেলতে হবে না—এ সব নতুন কথা বটে এবং খুবই লোভনীয়।

অবোধনারায়ণ পাণ্ডে আরো বলে, গণেরিদের সে একটু আধটু আভাস দিল মাত্র। তারা আরো কী সুবিধা পাবে, এ অঞ্চলের আর কী কী উন্নতি হবে, প্রতিভা সহায় ভালো করে বিস্তারিতভাবে তাদের বুঝিয়ে দেবেন। শুধু তাই না, যারা তাঁর চুনাওর মীটিনে যাবে তাদের নগদ নগদ কিছু লাভও আছে।

গণেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী লাভ?'

অবোধনারায়ণ অল্প একটু হাসে। জানায়, মোটরিয়াতে চড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে তিনগো করে রুপাইয়া পাবে।

মীটিংয়ে গেলে এতগুলো করে টাকা! সবার চোখ বিস্ময় এবং আশায় ঝকমক করতে থাকে।

অবোধনারায়ণ আর বসে না। ভুখানাঙ্গা অচ্ছুৎদের বুকের ভেতরকার নিদ্রিত লোভকে উসকে দিয়ে একসময় উঠে পড়ে। বলে, 'রাত অনেক হল, এখন যাই রে।' চেয়ারের তুব্‌লা হাতলে আস্তে ভর দিয়ে বিপুল চর্বিওলা শরীর টেনে তোলে সে।

এই সময় ধনপতদের বারান্দা থেকে বুড়ো গৈরুনাথ জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'তিনগো রুপাইয়া মিলেগা। হামনি মীটিন যায়েগা—'

এবার আর ঘোমটার তলায় লখিয়া খনখনে গলায় খেঁকিয়ে ওঠে না। তিনটে টাকা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে মোটরিয়াতে চড়ে শ্বশুরের মীটিংয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার পুরা সায় আছে। একশো বছরের এই পঙ্গু অথর্ব লোকটা যে একেবারে অপদার্থ গলগ্রহ না, নেহাতই পরমায়ু থাকার জোরে সেও যে দুটো পয়সা কামাই করতে পারে, এবারকার চুনাও তা টের পাইয়ে দেয়।

অবোধনারায়ণ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গণেরিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাইরের রাস্তা পর্যন্ত তারা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। এটা সম্মান দেখাবার ব্যাপার। অবোধনারায়ণ বলেছে, সারাদিন সবাই খেটে-খুটে এসেছে। কষ্ট করে তাদের আর সঙ্গে যেতে হবে না। এক-রকম জোর করেই তাদের এখানে রেখে সে চলে যায়।

অবোধনারায়ণ গেল বটে কিন্তু মোটরিয়া এবং মাথাপিছু নগদ

তিনটে করে টাকার প্রতিশ্রুতি গোটা দোসাদটোলার শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে থাকে। সবাই গণেরির দিকে তাকিয়ে বলে, 'অব হামনিলোগ কা করে?'

'শোচনা পড়ে—' গণেরি গম্ভীর মুখে বলে।

'শোচবার কী হলো?' গোটা দোসাদটোলা ভয়ানক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'পরতিভাজী আমাদের মোটরিয়া চড়াবে, নগদ রুপাইয়া দেবে। তিনগো রুপাইয়া কৌন দেতা হ্যায়? এর ভেতর শোচবার কিছু নেই।'

'জরুর আছে।'

'কা?'

গণেরি যা উত্তর দেয় তা এইরকম। প্রতিভা সহায় বড়ে সরকারের বিরুদ্ধে এবার চুনাওতে নেমেছে। এদিকে তারা দোসাদরা রঘুনাথ সিংয়ের খরিদী কিষাণ, তাঁর ক্ষেতিতে পুরুষানুক্রমে খাটছে, তাঁর জমিতে ঘরবাড়ি তুলে থাকছে। এখন মোটরিয়া চড়া আউর তিনগো করে রুপাইয়ার লালচে তারা যদি প্রতিভা সহায়ের চুনাওর মীটিনে যায় তাতে বড়ে সরকার কি খুশী হবেন? বিলকুল না। গণেরি বলতে থাকে, 'আমার এই কথাটা ভেবে ছাখ।'

সবাই চমকে ওঠে। এদিকটা কেউ চিন্তা করে ছাখেনি। চুনাওতে তাঁরই ক্রীতদাসেরা লোভে বশে তাঁরই শত্রুপক্ষকে মদত দিতে যাবে আর এটা তিনি বরদাস্ত করবেন, এতখানি মহানুভবতা রঘুনাথ সিংয়ের কাছে আশা করা অন্যায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এই কথাটা তারা বুঝতে পারে। তবু নগদ নগদ তিনটে করে টাকার লোভ একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তারা শুধোয়, 'তা হলে কী করা দরকার?'

এতগুলো মানুষকে হতাশ করতে ইচ্ছা হয় না গণেরির। সে বলে, 'মীটিনের তো দেরি আছে। বীচমে পুরা সাত আট রোজ। ভেবে দেখি কী করা যায়। রাত হল, আর তেল পুড়িয়ে বসে থেকে কা ফায়দা? সব ঘরে যা—'

ঘরে ফিরে আরেকবার তাজ্জব বনে যায় ধর্মারা। শুধু সে-ই না, তার মা-বাপ, কুশী এবং কুশীর মা-বাপ পর্যন্ত। অবোধনারায়ণ আসার পর কেউ আর ঘরে ছিল না। এ পাড়ার সব দোসাদ আর

দোসাদিন তার কথা শোনার জন্য কুয়োর পাড়ের ফাঁকা জায়গায় চলে গিয়েছিল।

অন্ধকারে বারান্দায় একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে টিরকে। রাঁচী থেকে কখন সে এসেছে, টের পাওয়া যায় নি।

ভীষণ ব্যস্তভাবে ধর্মা বলে, 'আরে তুম টিরকে ভেইয়া!'

'ইয়াস, আমিই।' টিরকে হাসে।

'কতক্ষণ এসেছ?'

'পাক্কা ওয়ান আওয়ার—এক ঘণ্টা।'

'ডাকো নি কেন?'

টিরকে জানায়, এতক্ষণ চুনাওর ব্যাপারে জমায়েত বসেছে বলে সে তাদের ডাকাডাকি করে নি।

টিরকে আগেও বারকয়েক দোসাদটোলায় ধর্মাদের ঘরে এসেছে। তাকে ধর্মা এবং কুশীর মা-বাপেরা চেনে; যথেষ্ট খাতিরও করে। তারা জানে, টিরকের দৌলতে ধর্মা আর কুশী তু-চারটে বাড়তি পয়সা কামাই করতে পারে।

টিরকেকে এত রাত্তিরে দেখে চার বুড়োবুড়ি কী করবে, ভেবে পায় না। ধর্মার মা দৌড়ে ঘরে ঢুকে ডিবিয়া এনে ধরিয়ে ফেলে, চুলহায় আগুন দেয়। তারপর ঘর থেকে বাজরার আটা বার করে জল ঢেলে ছানতে ছানতে বলে, 'লিট্টি বানাচ্ছি। রাত্তিরে খেয়ে যাবে।'

টিরকে মাথা ঝাঁকিয়ে সমানে না না করতে থাকে। জানায় এত রাত্তিরে তার জন্য হুজ্জুত করতে হবে না। পরে দিনের বেলা এসে একদিন পেট পুরে ভোজন করে যাবে। ধর্মার মা কিছুতেই শুনতে চায় না। অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত তার লিট্টি বানানো বন্ধ করে টিরকে।

ওদিকে কুশীর মা চা করে কলাই-করা গেলাসে বোঝাই করে এনে টিরকের সামনে রাখে। ধর্মাদেরও দেয়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ধর্মা শুধোয়, 'এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলে?'

টিরকে জানায়, 'সিধা রাঁচী থেকে।'

'জরুরত কিছু আছে?'

'হঁ। না হলে এটা কি আসার সময়। বহোত আরজিন

(আর্জেণ্ট) কাম আছে তোর সাথ।'

'বল।'

'আগে চা তো শেষ কর।'

চা খেয়ে আচমকা উঠে পড়ে টিরকে। ধর্মাকে বলে, 'আমার সাথ বাইরে চল—'

তু'জনে দোসাদটোলার বাইরে কাঁকুরে জমিটায় চলে আসে। টিরকের চালচলন কথাবার্তা আজ কেমন যেন রহস্যজনক মনে হতে থাকে ধর্মার। এক ধরনের তুর্জ্ঞেয় কৌতূহলও সে বোধ করতে থাকে। আবছা অন্ধকারে টিরকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুরু করে, 'এবার বল—'

টিরকে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করে একটা ধরিয়ে নেয়। ধর্মাকেও একটা দেয়। টিরকের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে ধর্মা।

টিরকে বলে, 'কোটরার বাচ্চার কী হল ?'

ধর্মা বলে, 'আর জঙ্গলে যাই নি। টেইন (টাইম) নায় মিলি।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুমি তো এক মাহিনা টেইন দিয়ে গেলে সেদিন। তার ভেতর কোটরা ধরে আনব জরুর।'

একটু চুপ করে থেকে টিরকে বলে, 'গোলি মার দো কোটরাকা ছৌয়াকো।'

'মতলব !' রীতিমত অবাক হয়ে যায় ধর্মা।

গলা নামিয়ে টিরকে শুধোয়, 'বহোত রুপাইয়া কামাই করতে চাস ?'

টাকা কামাতে কে আর না চায় ? ধর্মা বলে, 'চাই তো। লেকেন ত্যায় কে ?'

'আমি দেব।'

ধর্মা মজাদার একটা ভঙ্গি করে হাত পাতে, 'দাও

টিরকে বলে, 'মাজাক না ; কাজের কথা শোন। যে আমরিকী সাহাব কোটরার বাচ্চা চেয়েছিল সে আবার রাঁচী ফিরে এসেছে।'

ধর্মা উত্তর না দিয়ে টিরকের মুখের দিকে তাকায়।

টিরকে বলতে থাকে, 'কাটরার বাচ্চা তার চাই না। সাহাবের শখ হয়েছে চিতার বাচ্চা পুষবে। একজোড়া ইণ্ডিয়ান চিতার বাচ্চা চাই তার। দেশে ফেরার সময় নিয়ে যাবে।'

ধর্মা এবার বলে, 'জঙ্গল থেকে জিন্দা চিতিয়ার বাচ্চা ধরে আনা বহোত খতরার কাজ।'

টিরকে এবার ধর্মার লোভটা উসকে দেয়, 'মেনি রুপীজ মিলেগা। তুই তো রঘুনাথ সিংয়ের 'করজ' শোধ করার জন্যে রুপাইয়া জমাচ্ছিস। এই টাকাটা পেলে ফ্রী ম্যান হয়ে যেতে পারবি।' ধর্মা যে ভূমিদাস, বাপ-নানার করজের দায়ে সে যে রাজপুত ক্ষত্রিয় রঘুনাথ সিংয়ের 'খরিদী' হয়ে আছে, টিরকে তা ভাল করেই জানে।

ধর্মার আচমকা মনে পড়ে যায়, স্বাধীন জীবন কেনার জন্য তাদের অনেক পয়সা দরকার। দু-আড়াই বছরে বগেড়ি টগেড়ি বেচে দুশো টাকার ওপর আর সামান্য কিছু তারা জমাতে পেরেছে। তাদের প্রয়োজন নগদ দুটি হাজার টাকার। এখনও কত জমাতে হবে সেই জটিল অঙ্কের হিসাব ধর্মারা জানে না। তবে মাস্টারজী জানিয়েছেন, এখনও প্রায় কিছুই জমেনি, ঋণশোধের জন্য আরো বহোত বহোত পয়সা চাই। টিরকে যে সুযোগ নিয়ে এসেছে তা ছাড়া ঠিক নয়।

ধর্মা জিজ্ঞেস করে, 'কিতনা রুপাইয়া দেওগে?'

'বহোত—' ধর্মাকে লুব্ধ করার একটা ভঙ্গি করে টিরকে, 'ডোণ্ট ওরি।'

হরিণের বাচ্চা, মোষের শিং ইত্যাদি জুটিয়ে দেবার টাকা পয়সা বা দরদাম নিয়ে কোনদিন কথা বলে না ধর্মা কিন্তু আজ বলল, 'বহোত তো ঠিক ছ্যায়। লেকেন কেত্তে?'

টিরকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই কত চাস?'

আর কত হলে দু হাজার পূর্ণ হয়, ধর্মাব স্পষ্ট ধারণা নেই। খানিকক্ষণ ভেবে মনে মনে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী হিসেবপত্তর কষে সে বলে, 'দেড় হাজার।'

'দেড় হাজার! থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ফাইভ হানড্রিড! নায়, নায়। বহোত জেয়াদা মাংতা হো ধম্মা ভেইয়া। হাই প্রাইস!'

'এর থেকে এক পাইসা ভি কমতি নেব না। চিতিয়ার বচ্চে আনতে গিয়ে আমার জান চলে যেতে পারে। কা, হামনিকা জানকা দাম দেড় হাজারসে কমী?'

দামটা কমাবার জন্য অনেকক্ষণ টানা হ্যাঁচড়া করল টিরকে কিন্তু ধর্মাকে টলানো গেল না। সে দেড় হাজারেই অনড় হয়ে রইল। অগত্যা ঐ টাকাতেই রাজী হতে হল টিরকেকে। তাতে টিরকের

অবশ্য লোকসান নেই। আমরিকী সাহেবের কাছে সে একজোড়া চিতার বাচ্চার দর হেঁকেছে আড়াই হাজার টাকা। তার মতলব ছিল, টিরকেকে আধাআধি ঠেকিয়ে বাকীটা নিজেই নিয়ে নেবে। কিন্তু এবার দোসাদদের এই নিরীহ মুখচোরা ছোকরাটা কেন যে বেঁকে বসল, কে জানে। যাক গে, একরকম ফোকটেই আড়াই হাজার থেকে এক হাজার তার পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। রাঁচী থেকে বাসে বার দু-তিনেক গারুদিয়ায় ধর্মার কাছে ছোটাছুটি করেই যদি একরকম মুফতে অতগুলো টাকা এসে যায়, মন্দ কী। সে তো আর নিজে চিতার বাচ্চা ধরতে যাচ্ছে না। তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগছে না, অথচ টাকাটা দিব্যি এসে যাবে।

টিরকে বলে, 'ঠিক আছে, দেড় হাজারই পাবি ; বাচ্চা দুটো কবে 'ডিলভারি' দিবি ?'

'ডিলভারি' অর্থাৎ ডেলিভারি। টিরকের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে করতে দু-চারটে আংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছে ধর্মা। সে বলে, 'থোড়েসে টেইন (টাইম) লাগবে। চিতিয়ার মুহ্ (মুখ) থেকে তার ছৌয়া কেড়ে আনা তো সোজা না। মুহ্ থেকে কথা খসালেই ঐসা খতারনাক জানবরের বাচ্চা মেলে না।'

টিরকে বলে, 'আমরিকী সাহাব এখন পন্দর রোজ রাঁচী থাকবে। তারপর টু উইকের জন্যে কলকাতায় গিয়ে ফির রাঁচী লৌটবে।' মনে মনে হিসেব কষে বলল, 'এক মাহিনার ভেতর বাচ্চাদুটো দিতে পারবি ?'

ধর্মা একটু ভেবে বলল, 'পারব।'

টিরকে এবার পকেট থেকে এক গোছা টাকা বার করে তার ভেতর থেকে একশো টাকার একটা নোট ধর্মাকে দিতে দিতে বলে, 'ইডভান্স (অ্যাডভান্স) রুপাইয়া দিয়ে গেলাম। তুরন্ত কামে লেগে যা।'

আগে আর কখনও একসঙ্গে এতটাকা আগাম দেয় নি টিরকে। চিতার একজোড়া বাচ্চার ব্যাপারে তার গরজ কতখানি সেটা টের পায় ধর্মা।

টিরকে ফের বলে, 'বাত ফাইনিল (ফাইনাল) হয়ে গেল। আমি এখন যাই।'

ধর্মা একশো টাকার নোটটা পাকিয়ে হাফ প্যান্টের কোমরের সেলাই খুলে পটির ভেতর পুরতে পুরতে ঘাড় কাত করে, 'ঠিক হ্যায়।'

কালই সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে নোটটা পয়সার কৌটোর ভেতর রেখে আসবে সে।

টিরকে আর দাঁড়ায় না। কাঁকুরে মাঠ পেরিয়ে দূরে হাইওয়ের দিকে চলে যায়।

আর ধর্মা ভাবতে থাকে, দু-চার রোজের মধ্যেই চিতার বাচ্চার খোঁজে তাকে জঙ্গলে যেতে হবে। অন্যমনস্কর মতো দোসাদটোলার দিকে সে পা বাড়ায়।

একুশ

গারুদিয়া-কোয়েল ফাগুরামের এখন নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। নাওয়া-খাওয়া ঘুম-বিশ্রাম কোন কিছুই তার ঠিক থাকছে না। সকালবেলা গলায় নতুন হারমোনিয়ামটা ঝুলিয়ে দোসাদটোলা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। রাতে কখন ফেরে কেউ টের পায় না। কেননা এ পাড়ার ভূমিদাসেরা তখন গভীর ঘুমে ডুবে থাকে।

ইদানীং ফাগুরাম সারাক্ষণই ব্যস্ত। না হয়ে উপায়ই বা কী। চুনাওর তারিখ যত এগিয়ে আসছে ততই বড়ে সরকার বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের এ গাঁ সে গাঁ করে বেড়াচ্ছেন। প্রায় রোজই কোন না কোন হাটে বা গঞ্জে বা বাজারে মীটিং করছেন। মীটিং হলে ফাগুরামকে হাজির থাকতেই হয়। রঘুনাথ সিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নামে নিত্য নতুন রকমারি গান বাঁধছে সে আর মীটিংয়ে সেইসব গান গেয়ে আসছে।

সেই কতকাল আগে, বুকে তখনও তার দোষ হয় নি, রাতের পর রাত জেগে নৌটঙ্কীর আসরে গাইত ফাগুরাম। কিন্তু সে সব আসরের সঙ্গে মীটিংয়ের মঞ্চের রাতদিন ফারাক। ছেঁড়া বস্তা কি খড় বিছিয়ে নৌটঙ্কীর আসর বসত, মাথার ওপর জ্বলত টিমটিমে লণ্ঠন। ম্যাড়মেড়ে আলোয় লাখ লাখ মশা আর বারিষের সময় রানীপোকার কামড় খেতে খেতে গান ধরত ফাগুরাম। কিন্তু বড়ে সরকারের মীটিংয়ের ব্যাপারই আলাদা। এখানে থাকে লাল নীল শালু দিয়ে চমৎকার করে সাজানো মঞ্চ। ফাগুরাম গাইবে বলে আলাদা ফরাস বিছিয়ে দেওয়া হয়। গণ্ডা গণ্ডা ডে-লাইট, হ্যাজাক বা বিজলী বাতির ঝকমকানো

আলোয় মাইকের সামনে বসে নতুন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে গাইতে নেশা ধরে যায় তার। হোক না চুনাওর গান, হাজার হাজার শ্রোতা যখন শুনতে শুনতে মজা পেয়ে হাসতে থাকে বা তালিয়া বাজায় তখন বুকে রক্ত ছলকাতে থাকে ফাগুরামের। নৌটঙ্কীর দল থেকে খারিজ হয়ে যাবার পর তার একসময় মনে হয়েছিল জনমটাই পুরা বরবাদ। সে গাইয়ে, সে নাটুয়া। নাচাগানা তার জীবন থেকে বাদ চলে গেলে রইলটা কী? বড়ে সরকার যে তাকে হারমোনিয়াম দিয়েছেন, সুসজ্জিত মঞ্চে বসে হাজারো শ্রোতার সামনে গাইবার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ জন্য সে কৃতজ্ঞ। ফাগুরাম মরে যায় নি। এই বয়সে বুকের দোষ হওয়া সত্ত্বেও তার গলায় যে যাদু রয়েছে, এখনও সে যে হাজার লাখ আদমীকে মাতিয়ে দিতে পারে, সেটা জানতে পেরে নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। মনে মনে ফাগুরামের একটা ধারণা হয়েছে, তারই গানের জোরে এবার বড়ে সরকার চুনাওতে জিতে যাবেন। এই ধারণার কারণও রয়েছে। আজকাল যখনই কোথাও মীটিং বসে, তার আগে রঘুনাথ সিংয়ের লোকেরা সাইকেল রিকশা কি বয়েল গাড়িতে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দেয়, বক্তৃতার আগে গারুদিয়া-কোয়েল নৌটঙ্কীবালা ফাগুরাম 'চুনাওকা গীত' গাইবে। সে নামী আদমী। কয়েক বছর আগেও নৌটঙ্কীর দৌলতে আশেপাশের পঞ্চাশ কি শও মাইলের মধ্যে সবাই তার নাম জানত। মাঝখানে কিছুদিন নৌটঙ্কীর আসরে না দেখলেও তাকে কেউ বিলকুল ভুলে যায়নি। তার টানেই যে গাঁওবালা দেহাতী মানুষেরা ঝাঁকে ঝাঁকে চুনাওর মীটিংয়ে হাজির হচ্ছে, ফাগুরাম তা বোঝে।

যেসব দিন মীটিং থাকে না, বড়ে সরকার তাকে হাটে গঞ্জে বা কোন গাঁয়ে পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে লোক জড়ো করে ফাগুরাম নিজের বাঁধা গানগুলো গাইতে থাকে। রঘুনাথ সিংয়ের এ-ও এক বড় চাল। চুনাওর লড়াইতে জেতার জন্য অনবরত যে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে হয়, এই কৌশলটা ভালই জানেন তিনি।

রঘুনাথ সিংয়ের উৎসাহ আর চুনাওর মীটিংয়ে শ্রোতাদের অনবরত তালিয়া বাজানো, এই দুটো ব্যাপার এই বয়েসে ফাগুরামকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে যেন। সারাক্ষণ সে একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। পলকে পলকে তার বুকের ভেতর থেকে স্রোতের মতো তোড়ে নতুন

নতুন গান এবং সুর বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই সব গান ইদানীং বিজুরি আর গারুদিয়া তালুকের গাঁয়ে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ছোটবড় কাচ্চাবাচ্চা বুড়াবুড়ির মুখে মুখে ফেরে।

আজ সকালে উঠে মনপথল বাজারে চলে গিয়েছিল ফাগুরাম। গারুদিয়া থেকে পাক্কী ধরে 'কোশভর' গেলেই বিজুরি তালুকের সীমানা। বিজুরিতে ঢুকে নাক বরাবর খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে মাঠে নামলেই কাচ্চী। কাচ্চী দিয়ে রশিভর হাঁটলেই মনপথল বাজার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাজারটা।

ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে জেঠ মাহিনার রওদ চড়ে গিয়েছিল। এতটা আসার ধকলে এবং রোদের তেজে হাঁপিয়ে গেছে ফাগুরাম। চেনাজানা এক চায়ের দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয় সে।

তাকে দেখে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে দোকানদারটা। খাতির করে নতুন চা-পাত্তি দিয়ে চা বানিয়ে তাকে খাওয়ায়, সঙ্গে নিমকিন বিস্কুট। দাম দিতে গেলে জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে দোকানদার বলে, 'নায় নায়। তোমার মতো বড়া আদমী আমার দুকানে চায় খেতে এসেছ; সেটা আমার সৌভাগ।'

ফাগুরাম জোরজার করে তার হাতে দাম গুঁজে দেয়। বড়ে সরকারের কিরপায় তার পকেট আজকাল দশ বিশ টাকার নোট আর রেজগিতে বোঝাই থাকে। যাই হোক, এ অঞ্চলের তিরিশ বত্রিশটা গাঁও জুড়ে সে এখন সব চাইতে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত মানুষ। সে যেখানে যায় সেখানেই তার জন্য প্রচুর খাতির, প্রচুর যত্ন।

ফাগুরামকে দেখে একজন দু'জন করে লোক আসতে শুরু করে। ক্রমশ রীতিমত একটা ভিড়ই জমে যায়।

চারদিক থেকে সবাই বলতে থাকে, 'কা, ফাগ্গু ভাইয়া, গানা হবে তো?'

ফাগুরাম হাসে, 'জরুর। তোমাদের গান শোনাব বলেই তো এসেছি।'

'মজাদার গানা?'

'শুনে তোমরাই বলো।'

এমনি কথায় কথায় বেলা বাড়তে থাকে। একসময় হারমোনিয়াম

গলায় ঝুলিয়ে উঠে পড়ে ফাগুরাম। তারপর মনপখল বাজারের মাঝখানে একটা ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড কড়াইয়া গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার পেছন পেছন চায়ের দোকানের ভিড়টাও চলে এসেছে। শুধু তাই না, বাজারের নানা দিক থেকে আরো মানুষজন দৌড়ে আসতে থাকে।

ঘুরে ফিরে, নেচে নেচে, সরু সরু আঙুলে অনেকক্ষণ হারমোনিয়াম বাজায় ফাগুরাম। আসরটা তৈরি হয়ে গেলে সে বলে, 'শুন ভাইয়ালোগ, পয়লা সুখন রবিদাস পর যো গানা বনায়া ও গাতা হ্যায়--' বলেই সুর ধরে ঃ

ইয়ে কলযুগিয়া
রাজ ভাইয়া
ইয়ে কলযুগিয়া রাজ।
ভোট লড়ানকো সুখন আয়া
চোর চামার বাটমার ভাইয়া
চোর চামার বাটমার।
তাড়ি-দারু চোরচামারি ভোটনকে হাতিয়ার।
সুখনকো ঘর ছৌরি নাচে
মহিমা অপরাম পার ভাইয়া
মহিমা অপরাম—

সুখন রবিদাস সম্পর্কে গানে গানে যে কথাগুলো ফাগুরাম বলতে থাকে তার কোনটাই সত্যি না। কিন্তু মানুষ যেমনই হোক—গরীব-ভুখা, পয়সাওলা-অভাবী, জমিদার-ক্ষেতমজুর—অন্যের কুৎসা বা কেচ্ছা শুনতে ভালবাসে। ফাগুরামের মনপসন্দ মজাদার গান শুনতে শুনতে তারা হেসে হেসে ঢলে পড়তে থাকে।

সুখনকে নিয়ে বাঁধা গানটা শেষ করেই আবু মালেককে নিয়ে পড়ে ফাগুরাম।

গলি গলি শোর হ্যায়
আবুল মালেক চোর হ্যায়
রঘুনাথ সিংকো ভোট দো
আবুল মালেককো ফোঁক দো—

এইভাবে এক এক করে রঘুনাথ সিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সবার সম্পর্কেই পর পর গেয়ে যেতে থাকে ফাগুরাম। গান শেষ হতে হতে

সুরয খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে।

চারপাশে মনপত্থল বাজারের যে মানুষজন ভিড় করে আছে তারা বলাবলি করতে থাকে, 'শুনা ছ্যায় তো, ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালা গানামে কা বোলা! সব কোঈ চোর-চোট্টা-বদমাস। সিরেফ রঘুনাথ সিং বাদ। চোর-চোট্টাদের বোট দিয়ে ফায়দা নেই।'

যে উদ্দেশ্যে এই সব মজার গান বাঁধানো বা গাওয়ানো তা রীতিমত সফল। মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে তার আঁচ পাওয়া যায়। ফাগুরাম আর দাঁড়ায় না। ভিড় ঠেলে বাইরে এসে একটা সাইকেল রিকশায় ওঠে। আজ সে গারুদিয়ায় ফিরে সোজা দোসাদটোলায় চলে যাবে। বড়ে সরকারের চুনাওর গান যেদিন থেকে সে গাইতে শুরু করেছে সেদিন থেকে দুপুরে আর ঘরে ফেরা হয় না। হাটে বাজারে কি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে চায়-রোটি বা চায়-বিস্কুট বা ভাতের দুকানে গিয়ে ডাল-ভাত-সবজি আর শিকার খেয়ে নেয়। আজ দোসাদটোলায় গিয়ে নিজের হাতে রসুই চড়িয়ে দেবে। বয়েস তো কম হয়নি গানের নেশায় যতই বুদ হয়ে থাক, কিছুদিন ধরে অনবরত ঘোরাঘুরির ফলে শরীরে আর দিচ্ছে না। আজ খাওয়া-দাওয়ার পর সন্ধ্যে পর্যন্ত টানা ঘুম লাগাবে ফাগুরাম।

সাইকেল রিকশাটা মনপত্থল বাজার পেছনে ফেলে কাঁচা রাস্তা ধরে হাইওয়ের দিকে যখন সিকি রশির মতো এগিয়ে গেছে সেই সময় পেছন থেকে চিৎকার শোনা যায়, 'সাইকেল রিকশ রুখ যা, রুখ যা—'

রিকশাওলা গাড়ি থামিয়ে দেয়। অবাক হয়েই ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকায় ফাগুরাম। পাঁচ ছ'টা গাট্টাগোট্টা চেহারার—পহেলবান য্যায়সা, 'চৌগাফাওলা লোক, হাতে পেতলের গুল বসানো লাঠি—হাঁই হাঁই করতে করতে ঝড় তুলে কাছে এসে পড়ে।

ফাগুরাম শুধোয়, 'কা বাত?'

লোকগুলো অচেনা। পাথরের মতো শক্ত মুখ তাদের। ছোট ছোট গোল চোখ থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে যেন। একজন বলে, 'মরণে মাংতা চুহা কাঁহিকা—'

লোকগুলোর চেহারা, চাউনি এবং রকমসকম দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায় ফাগুরাম। সে হাসতে চেষ্টা করে, 'কা হুয়া ভাইয়ালোগ?'

'কা হুয়া!' সেই লোকটা লাঠি ঠুকে গর্জে ওঠে, 'শালে

গারুদিয়া কোয়েল হয়েছে! অ্যায়সা মারেগা, বিলকুল কৌয়া বন যাওগে।'

ফাগুরাম বলে, 'ভাইয়া, হামনিকো কা কসুর? থোড়াকুছ সমঝা তো দো—'

'এতক্ষণ মনপখল বাজারে হারমুনিয়া বাজিয়ে বড়ে বড়ে আদমীদের নামে কী বলে এলি? সব কোই চোর, চামার, বাটমার, ঘড়িয়াল—নায়?'

এবার চমকে ওঠে ফাগুরাম। তার গানগুলো তো গঙ্গাপানিতে ধোয়া নির্দোষ ব্যাপার না। রঘুনাথ সিংয়ের বিপক্ষে যারা চুনাওতে নেমেছে তাদের সবাইকে এইসব গানে হুল ফোটানো হয়েছে। বোঝা যায় এই হট্টাকাট্টা ডাকুমার্কা চেহারার লোকগুলো তাতে ক্ষেপে গেছে। ঢোক গিলে ফাগুরাম ফিকে মতো হাসে, 'ও তো গানা ভাইয়া।'

'গানা!'

'মতলব তামাসা।'

'ফির অ্যায়সা তামাসা করলে গলেকা নালিয়া ফেঁড়ে ফেলব। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া ভাইয়া, সমঝ গিয়া।'

'যা ভাগ। লেকেন হোঁশিয়ার।'

'হঁ হঁ, হোঁশিয়ার জরুর থাকব।'

সামনে থেকে সরে গিয়ে রাস্তা সাফ করে দেয় লোকগুলো. সাইকেল রিকশা ফের চলতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঠো রাস্তা থেকে পাক্কীতে এসে ওঠে।

জষ্টির গনগনে লু-বাতাস চিরে বিজুরি তালুকের দিকে যেতে যেতে আগাগোড়া গোটা ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ফাগুরাম। মজাদার তামাসার গান শুনে ঐ লোকগুলো এত ক্ষেপে গেল কেন? গানের মধ্যে অবশ্যই রঘুনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে যারা চুনাওতে নামছে তাদের সবাইকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। তবে কি তাদেরই কেউ মনপখল বাজারের ডাকু-য্যায়সা লোকগুলোকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে? কে লেলাতে পারে? নেকীরাম শর্মা, আবুল মালেক, প্রতিভা সহায় না সুখন রবিদাস?

আচমকা গণেরির হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায় ফাগুরামের। সে

বলেছিল, বড়ে সরকারের বিপক্ষের লোকেরাও ঐরু-গৈরু-ভৈরু বা নাথুর দল না। তাদেরও পয়সা আছে, জনবল আছে। বহুদর্শী গণেরি ঠিকই বলেছে দেখা যাচ্ছে।

ফাগুরাম ঠিক করে ফেলে, এখন আর দোসাদটোলায় গিয়ে রসুই চড়াবে না; সিধা গারুদিয়ায় ফিরে রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে চলে যাবে। বড়ে সরকারকে খবরটা জানানো অত্যন্ত জরুরী। সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে।

রঘুনাথ সিংকে তাঁর বাড়িতেই পাওয়া যায়। চুনাওর জন্য বিরাট কমপাউণ্ডের ভেতর তেরপল খাটিয়ে তিন চারটে ক্যাম্প বসানো হয়েছে। তাঁকে নির্বাচনে তরিয়ে দিতে যে সব ছোকরা হাটে-বাজারে আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে 'রঘুনাথ সিংকো বোট দো, বোট দো—' করে গলায় খুন তোলে, তুপুরে ফিরে তারা ওখানে খায়, জিরোয়, খবরের কাগজে ইস্তাহার লেখে, ভোটারদের লিস্টি ঠিক করে। চুনাও তো কথার কথা না, একসঙ্গে হাজারটা তৌহারের মতো ব্যাপার।

এই মুহূর্ত চুনাও কর্মীরা কাতার দিয়ে খেতে বসে গেছে। বড়ে সরকার নিজে সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়া তদারক করছেন। ফাগুরাম দৌড়ুতে দৌড়ুতে তাঁর কাছে চলে আসে।

অনেকটা রাস্তা গনগনে রোদের ভেতর দিয়ে এসেছে ফাগুরাম। তার গায়ের চামড়া ঝলসে গেছে যেন। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে যে উত্তেজনা এবং ভয়ের ব্যাপারটা চলছিল, মুখেচোখে সেটা ফুটে উঠেছে।

এক পলক ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ সিং শুধোন, 'কী রে, কোত্থেকে এলি?'

শ্বাস টেনে ফাগুরাম বলে, 'মনপত্থল বাজার হুজৌর। চুনাওর গানা গাইতে গিয়েছিলাম।'

'গানা কেমন হল?'

'আপকি কিরপায় বহোত আচ্ছা। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'একটা বুরা খবর আছে।'

ভাল করে ফাগুরামকে লক্ষ্য করতে করতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'কী বুরা খবর?'

এক নিঃশ্বাসে সেই লোকগুলোর শাসানির কথা জানায় ফাগুরাম। শুনতে শুনতে চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে রঘুনাথ সিংয়ের। চোখের তারা থেকে আগুন ঠিকরোতে থাকে। তিনি বলেন, 'জানবরের বাচ্চাগুলো কারা? নাম বল? কোন গাঁওয়ের আদমী?'

ফাগুরাম বলে, 'জানি না হুজৌর।'

'আগে আর কখনও দেখেছিস?'

'নেহী সরকার।'

চোখ কুঁচকে একটু চিন্তা করেন রঘুনাথ সিং। তারপর আস্তে করে বলেন, 'এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।' বলেই চুনাওর যে কর্মীরা খেতে বসেছে তাদের দিকে ঘাড় ফেরান, 'মহেশ্বর, রামরতন, মুকলাল, বজরঙ্গী—তোমাদের চারজনকে এখনই একবার মনপত্থল বাজারে যেতে হবে। সেখান থেকে সিধা মিশিরলালজীর সাথ গিয়ে দেখা করবে।'

রঘুনাথ সিংয়ের মুখ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে চারজন তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। হাত নেড়ে তাদের ফের বসিয়ে দেন রঘুনাথ। বলেন, 'আগে খেয়ে নাও। খেতে খেতে শোন, ওখানে গিয়ে কী করতে হবে।'

ফাগুরামের বর্ণনা অনুযায়ী চার হট্টাকাট্টা ডাকুমার্কা হারামজাদের কথা বলে রঘুনাথ নির্দেশ দেন, মনপত্থল বাজারে গিয়ে তাদের পাত্তা লাগাতে হবে। যদি তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায় ভালই। পাওয়া যাক বা নাই যাক, সোজা বিজুরিতে নিয়ে মিশিরলালজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কেননা ঐ এলাকাটা তাঁরই। মিশিরলালজীকে জানাতে হবে, তাঁরই খাস তালুকে বড়ে সরকারের চুনাও কর্মী ফাগুরামকে শাসানো হয়েছে। তিনি যেন এর বিহিত করেন।

নাকেমুখে তুরন্ত ভাত-চাপাটি ডাল-সবজি গুঁজে রঘুনাথ সিংয়ের চার চুনাও কর্মী জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যতক্ষণ না বিকেল হয় আর ওরা মনপত্থল এবং বিজুরি থেকে ফিরে আসে ততক্ষণ বড়ে সরকার ফাগুরামকে আটকে রাখেন।

বিকেলে ওরা জীপ থেকে নামতেই রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করেন, 'হারামজাদ কুত্তাকা ছৌয়াগুলোর পাত্তা মিলল?'

'নায়—' চুনাও কর্মীরা একসঙ্গে মাথা নাড়ে।

'মনপথল বাজারে ভাল করে খোঁজ নিয়েছিলে ?'

'জী। সবাইকে পুছেছি, লেকেন কেউ কিছু বলতে পারল না।'

কপালে ভাঁজ পড়তে থাকে রঘুনাথ সিংয়ের। ভুরু কুঁচকে তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে, বাইরে থেকে কেউ গুণ্ডা আনিয়েছে।'

চার চুনাও কর্মী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রঘুনাথ সিং এবার জিজ্ঞেস করেন, 'বিজুরিতে গিয়েছিলে ?'

'জী।'

'মিশিরলালজীর সাথ দেখা হল ?'

'হয়েছে।'

'তাঁকে সব জানিয়েছ ?'

'জী।'

'কী বললেন মিশিরলালজী ?'

'আমাদের মুখে শুনে তখনই বদমাসগুলোকে তালাশ করতে লোক পাঠালেন। একবার ধরতে পারলে ওদের হাড্ডি থেকে মাংস সিরেফ আলাগ করে ফেলবেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন, বিজুরিতে ঐ হারামীরা আর যাতে ঝামেলা বাধাতে না পারে সেদিকে তাঁর পুরা নজর থাকবে।'

রঘুনাথ সিং বেজায় সন্তুষ্ট। মিশিরলালজী সেদিন কথার কথাই শুধু বলেন নি ; এই চুনাওতে সবরকমভাবে তাঁকে সাহায্য করতেও তিনি প্রস্তুত। বোঝা যাচ্ছে, তাঁর 'বচনে'র দাম আছে।

রঘুনাথ সিং তাঁর চুনাও কর্মীদের বলেন, 'ঠিক হ্যায়। তোমরা এখন জিরিয়ে নাও।' কাল সজ্জনপুরার হাটিয়ায় আমাদের চুনাওর মীটিং আছে না ?'

'জী—'

'সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে ?'

'জী।'

'যাও—'

চুনাও কর্মীরা তেরপলের ছাউনির তলায় একটা ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে। রঘুনাথ সিং এবার ফাগুরামের দিকে ফেরেন, 'যা, তুইও তোদের মহল্লায় চলে যা। মনে রাখিস, কাল সজ্জনপুরায় মীটিং আছে।' বলে সামনের দিকে দু'পা বাড়িয়ে কী ভেবে ঘাড় ফেরান।

কী আশ্চর্য, ফাগুরামের যাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; চোখেমুখে খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'কী রে, ঘরে গেলি না; কিছু বলবি?'

ভয়ে ভয়ে ফাগুরাম বলে, 'হুঁ হুজৌর।'

'কী?'

'বহোত ডর লাগতা—'

'কেন?'

'ওহী আদমীলোগন গলার নালিয়া ফেঁড়ে দেবে বলেছে।'

ফাগুরামের পিঠে সস্নেহে চাপড় মারতে মারতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'ডরের কিছু নেই। আমি তো আছি। যা এখন—'

রঘুনাথ সিং ভরসা দেন বটে, তবু যেন পুরোপুরি জোর পায় না ফাগুরাম। কিন্তু এখন আর ফেরার রাস্তা নেই। চুনাওর গান বন্ধ করলে বড়ে সরকার গুস্সা হবেন। আবার এই গান চালিয়ে গেলে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা গুস্সা হবে। রঘুনাথ সিংকে আজন্ম চেনে সে। খাতির করে তাকে ডাকিয়ে নিয়ে নয়া কাপড়া, নয়া হারমুনিয়া, টাকা পয়সা সবই দিয়েছেন বড়ে সরকার। মরুক বাঁচুক, তাঁর জন্য চুনাওর গান গেয়ে যেতেই হবে ফাগুরামকে।

বাইশ

তৃপ্ত উজ্জ্বল সুখী মানুষের পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে গারুদিয়া তালুকের এই দোসাদটোলা। এখানকার বাসিন্দারা বাপ-নানার করজের দায়ে কত কাল ধরেই তো ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে চলেছে। কিন্তু কী তাজ্জবকা বাত, গরীবের চাইতেও গরীব, ভুখার চাইতেও ভুখা, নাঙ্গার চাইতেও নাঙ্গা এই হতচ্ছাড়া জনম-দাসদের মধ্যেও মনুষ্যজাতির অনেক লক্ষণই দেখা যায়। অঢেল প্রাচুর্যে বোঝাই বহুদূরের ঝলমলে জগতের মানুষজনের মতোই এখানকার বাসিন্দাদের মৃত্যু ঘটে, মা-বাপের রক্তস্রোত থেকে সুপ্রাচীন সব আকাঙ্ক্ষা নিজের শরীরের মধ্যে পুরে যে ছোঁয়াটি জন্মায় ক্রমে সে যুবক বা যুবতী হয়ে ওঠে। বহুকালের সামাজিক নিয়মেই একদিন তাদের সাদি হয়। শক্তিমান একটি পুরুষ উর্বরা যুবতীর গর্ভে নতুন জন্মের বীজ বুনে দেয়। এইভাবে আবার মানুষ আসে

পৃথিবীতে। মানুষ না, আরেকটি জনমদাস। বাপ-নানার মতোই রঘুনাথ সিংহের জমি চষে তাদের খামারের গোলাগুলি মহার্ঘ সোনালী শস্যে বোঝাই করে একদিন দুনিয়া থেকে মুছে যায় কিন্তু তার আগেই নিজের সন্তান অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জনমদাসকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেয় সে। এইভাবে রঘুনাথ সিংদের জন্য বেগারখাটা ক্রীতদাসের অভাব কখনও ঘটে না।

আজ দোসাদটোলার টিউমলের বড় ছেলে শিউমলের সাদির কথা পাকা হবে। তিন ক্রোশ ফারাকে তিলাই গাঁওয়ের গৈবীনাথের ছোটা লড়কী রাধিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হবে আগামী ছট পরবের পর ফসল কাটা মরসুমের ঠিক আগে আগে। সেই উপলক্ষে গৈবীনাথ তার দুই ভাই, এক বেয়াই আর ভাঞ্জাকে নিয়ে দুপুরের ঢের আগেই এসে পড়বে। এই বিয়ের ব্যাপারে টিউমলের সঙ্গে গৈবীনাথদের দু-চার প্রস্থ কাঁচা কথা হয়ে গেছে। গৈবীনাথের মেয়ে রাধিয়া খুবসুরত ডাগর মেয়ে; চোদ্দ বছর উমর। দোসাদদের ঘরে এত বড় এবং এত শ্রীছাঁদওলা মেয়ে চোদ্দ সাল পর্যন্ত পড়ে থাকে না। রাধিয়ার যে এতদিন বিয়ে হয় নি তার একমাত্র কারণ গৈবীনাথ। মেয়ের পণ হিসেবে দেড় শ টাকা দর হেঁকে বসেছিল সে। তার যা মেয়ে তাতে এই দামটা এমন কিছু বেশি না। আশেপাশের বিশ পঞ্চাশটা তালুকে আর কোন দোসাদের ঘরে রাধিয়ার মতো এমন একটা মেয়ে কেউ দেখাক দেখি। সে লাখোমে এক।

বিয়ের বাজারে রাধিয়ার দেড়শ রুপাইয়া দরটা যতই ন্যায্য হোক, তা দেবার মতো ক্ষমতা বিশ-পঞ্চাশটা মৌজায় কোন দোসাদের নেই। মেয়ে দেখে যে এগিয়ে আসে, দর শুনে তখুনি ভেগে পড়ে।

পুতাহী আনার জন্য মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে রাধিয়াকে দেখে তাক লেগে যায় টিউমলের। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এই মেয়েকে যেভাবে পারে ঘরে আনবেই। আনবে তো, কিন্তু রুপাইয়া-পাইসা কঁহা? আগুপিছু না ভেবে ঝোঁকের মাথায় সে দর দেয় পঞ্চাশ টাকা। গৈবীনাথ দেড় শ'তেই অনড় থাকে। অনেক বার গারুদিয়া থেকে তিলাইতে ছোটাছুটি করে পায়ের শিরা ছিঁড়ে ফেলে টিউমল। পণের ব্যাপারটা নিয়ে এক বছর ধরে প্রচুর টানাহ্যাঁচড়া করে শেষ পর্যন্ত গৈবীনাথকে বেশ খানিকটা টলাতে পারে সে। গৈবীনাথ একটু একটু

করে দর নামাতে থাকে, টিউমলও অল্প অল্প চড়িয়ে যায় এবং একশ টাকায় একটা রফা হয়। কিন্তু একশ টাকা একজন ভূমিদাসের কাছে কোটি টাকার সমান।

এই দোসাদটোলায় যার ঘরেই যা হোক না কেন, সবাই সবার সঙ্গে পরামর্শ করে; বিশেষ করে গণেরির সঙ্গে। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে যেদিন থেকে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই গণেরিকে সব জানিয়ে গেছে। গৈবীনাথ যেদিন একশ টাকায় রাজী হল সেদিন নাচতে নাচতে দোসাদটোলায় ফিরে টিউমল সারা মুখ জেল্লাদার হাসিতে ভরিয়ে বলতে থাকে, 'গো গৈল গণেরি ভাইয়া। সওদা হো গৈল—'

গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়েছে গণেরি। বলেছে, 'সওদা তো হো গৈল। লেকেন শ রুপাইয়া কঁহা মিলি?'

'মুনশীজীর কাছ থেকে নিয়ে নেব।' সরল মুখে উত্তর দিয়েছে টিউমল। দোসাদ জাতির সেরা মেয়েটিকে পুতাহী করে ঘরে তুলবে, সেই খুশিতেই তখন সে ডগমগ।

কিন্তু গণেরি চমকে উঠেছে, 'করজ তো নিবি, শোধ করবি কী করে?'

'হো যায়েগা গণেরি ভাইয়া, জরুর হো যায়েগা।'

বিষণ্ণ হেসেছে গণেরি। সে জানে মুনশীজী আজীবচাঁদের কাছ থেকে ধার নেওয়া মানেই বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ফাঁদে পা ঢোকানো। এই ভাবেই ঝোঁকের মাথায় বিয়ে সাদিতে করজ নিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ঘটায় দোসাদরা। ভাবে কোন রকমে টাকা শোধ করে ফেলতে পারবে। কিন্তু সুদের পাহাড় জমে জমে গলায় ফাঁসটা পাকে পাকে আরো কঠিন ভাবে জড়িয়েই যায়। নিজের জীবন তো বটেই, বংশানুক্রমে কারো পক্ষেই এই ফাঁস কেটে বেরুবার রাস্তা নেই।

টিউমল এক পুরুষের খরিদী কিষাণ। তার সঙ্গে সঙ্গেই এই বংশের দাসত্ব শেষ হয়ে যেত। তার পর থেকে তার বংশের সবারই স্বাধীন মর্যাদাবান মানুষ হবার কথা। কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও নিজের ছেলের গলায় বড়ে সরকারের ফাঁস জড়িয়ে দিচ্ছে সে। গণেরি বলেছে, 'ফেঁসে যাবি টিউমলিয়া।'

করজ নিলে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে টিউমল বলেছে, 'আরে নায় নায় গণেরি ভাইয়া। রামজীর কিরপায়

কেমন পুতাহী আনছি বল। দেখনেকো আউর দেখলানেকো চীজ।'
দেখবার এবং দেখাবার মতো যে রূপসী মেয়েটিকে ঘরে আনা ঠিক করেছে, তার চিন্তাতেই তখন টিউমল ভরপুর হয়ে আছে।

কিন্তু জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা গণেরিকে ভবিষ্যতের বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সাহায্য করে। এই করজের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা চোখের সামনে দেখতে দেখতে বিমর্ষ গলায় গণেরি বলেছে, 'এই সাদিয়া ভেঙে দে টিউমল। ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে যাস না।'

টিউমল শিউরে উঠেছে, 'নায় নায় ভাইয়া, এমন কথা বলো না।

'আরে মুরুখ, সাদি না হলে মানুষ মরে না।'

'জওয়ানিকা ধরম, সাদি দিতেই হবে ভাইয়া।' বলে টিউমল দার্শনিকের মতো গভীর কিছু কথা আওড়ায়। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, এই তিনটে ব্যাপার ভগোয়ানের নির্দেশে চলছে। এই নিয়ম অমান্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

সুতরাং অদৃশ্য ভগোয়ানের আঙুলের সঙ্কেতে গারুদিয়া তালুকের ভূমিদাস টিউমলের ছেলের সঙ্গে তিলাই গাঁওয়ের গৈবীনাথ দোসাদের মেয়ে রাধিয়ার বিয়ে হতে চলেছে। ভগবানের রাজ্যে এ নিয়ম নাকি অব্যর্থ এবং অনিবার্য।

এখানে কারো ঘরে বিয়ে সাদি হলে সারা দোসাদটোলায় যেন তৌহার লেগে যায়। টিউমল এবং দোসাদটোলার বাকী সবাই সিধা রঘুনাথ সিংয়ের কাছে গিয়ে দরবার করেছিল, আজ টিউমলের বিয়ের বাত পাকা হবে, বড়ে সরকার যেন একটা বেলার জন্য ক্ষেত্রির কাজ থেকে রেহাই দেন। রঘুনাথ পরম উদারতায় একবেলা না পুরা একটা দিনই মকুব করে দিয়েছেন। দোসাদটোলার প্রতিটি, মানুষ এতে বেজায় খুশী এবং অভিভূত। তবে বহুদর্শী গণেরি সব কিছুই একটু টেড়া চোখে দেখে। সে বুঝেছে সামনে চুনাও; এখন ভোটদাতাদের চটানোটা কোন কাজের কথা নয় বরং খুবই ক্ষতিকর।

আজ ভোরে সুরয ওঠার ঢের আগে থেকেই দোসাদটোলার নানা বয়সের মেয়েরা থোকায় থোকায় বা আলাদা আলাদা হয়ে টিউমলদের ঘরের সামনে জমায়েত হয়ে সাদির গান শুরু করে দিয়েছে:

আঙ্গনমে আজ আয়া মোরী সামহাল করকে
ইঁহা হ্যায় গরীব আঙ্গন, তুম হো সপুত সাজন
ধীরেসে অপনে প্যারকো রখনা সামহাল করকে
দাদা ও তেরে আয়ে আভি বরাতী বনকে
দাদী যে তেরী আয়ী রেণ্ডিকি ভৈস বন কর
আঙ্গনমে আজ আয়া……

একদল দম নেবার জন্য গান থামাতেই আরেক দল আরম্ভ করে দেয়।

সৌগতকে গালি শুনাও, শুনাও মেরে সখিয়া
সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে শিরুহনমে টোপী
নেহী হ্যায়
বহিনিকে চটি লাগাও, লাগাও মেরে সখিয়া
সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে ধোতি নহী,
বাহিনিকে শাড়ী প্যাহনাও
সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে গঞ্জি নহী
উনকি যো বহিনিকে চোলী প্যাহনাও
সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে পাওমে জুতী নহী
ভরুয়াকে বহিনিকে সণ্ডেল প্যাহনাও
প্যাহনাও মেরে সখিয়া……

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোসাদটোলার জনকয়েক ফুর্তিবাজ মরদও ঢোলক বার করে গানের সঙ্গে বাজনা জুড়ে দেয়। সত্যি সত্যিই টিউমলের বিয়েকে ঘিরে এখানে পরব শুরু হয়ে গেছে যেন।

সুরয যত চড়তে থাকে দোসাদটোলার একটা প্রাণীও আর নিজের ঘরে থাকে না; সবাই এসে টিউমলের ঘরের সামনে জমা হয়। সবাই বেজায় খুশী। অন্তত এই বিয়ে উপলক্ষে তারা যে পুরা একটা রোজ গতরচূরণ ক্ষেতিচষার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়েছে, সেটা দোসাদদের জীবনে খুব সামান্য ঘটনা নয়।

বরের বাপ টিউমল আর মা পহেলী আনন্দে আজ যেন হাওয়ায় উড়তে থাকে। ভোরবেলাতেই কুয়োর জলে 'নাহানা' সেরে বাদরার ছাই দিয়ে কাচা পরিষ্কার জামা কাপড় পরে একবার এর কাছে যাচ্ছে, একবার ওর কাছে। সবার হাতে হাতে চা, বুনিয়া আর ভাজা চানা দিতে দিতে খুবই বিনীতভাবে বলছে, 'লো ভাইয়া, লো।

আমার লেড়কার সাদির ব্যাপারে তোমরা যে এসেছে, এ বহোত সৌভাগ—'

দোসাদটোলার প্রতিটি মানুষ আজন্মের চেনা টিউমলের। তার বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। যারা তার সমবয়সী তাদের সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে সে। যারা ছোট তাদের জন্মাতে দেখেছে। এই দোসাদ-টোলার আর সব ভূমিদাসের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বড়ে সরকারের জমি চষেছে সে, ফসল কেটেছে। কারণে-অকারণে এদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে; আবার বিপদের দিনে বুক দিয়ে পড়েছে। সীমাহীন কষ্ট, দুঃখ, অভাব ভাগাভাগি করে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গেই কতকাল ধরে পাশাপাশি এই পৃথিবীতে টিকে আছে টিউমল। দোসাদটোলার প্রতিটি মানুষের হাড় পর্যন্ত তার চেনা। কিন্তু আজকের দিনটা একেবারেই আলাদা।

আজ এরা সবাই তার মেহমান। দোসাদটোলাবাসী প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে তো খাতিরদারি দেখাতেই হবে। নইলে মেহমানদারির অপমান।

টিউমল যেমন দোসাদটোলার পুরুষদের কাছে গিয়ে খাতির-যত্ন করছে তেমনি তার বউ যাচ্ছে মেয়েদের কাছে।

দূরে ঘরের দাওয়ায় বসে আছে টিউমলের ছেলে শিউমল। ভোরে উঠবার পর তাকেও 'নাহান' সেরে নিতে হয়েছে। চানের আগে মাথায় প্রচুর পরিমাণে তেল ঢেলেছে। ফলে চুলগুলো এখনও জবজবে; কানের ধার এবং কপাল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তেল গড়াচ্ছে। শিউমলের পরনে এখন হলুদে ছোপানো পরিষ্কার ধুতি আর চাহাড়ের হাটিয়া থেকে কিনে আনা জালিকাটা আনকোরা সৌখিন গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর রবার স্ট্যাম্পে কোম্পানির মোহর ছাপা রয়েছে। শিউমলের মুখে একটু লাজুক হাসি মাখানো। তা ছাড়া তারই জন্য যে এত আয়োজন আর এত মেহমানের আনাগোনা, সেই কারণে রীতিমত গর্বও।

শিউমলকে ঘিরে বসে রয়েছে তারই সমবয়সী দোসাদপাড়ার ছেলে-ছোকরারা। বিয়ের ব্যাপারে ইয়ার-বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করছে বা মজাক ওঠাচ্ছে। হেসে হেসে শিউমল তার উপযুক্ত জবাবও দিচ্ছে। এদের মধ্যে ধর্মাকেও দেখা যায়।

জমায়েতের এক প্রান্তে একটা ঝাঁকড়ামাথা পরাসগাছের তলায়

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে বসে আছে গণেরি। চারদিকে এত লোকজন, এত গানবাজনা, এত হাসিঠাট্টা, মজাক—সব কিছুর ভেতরে থেকেও সে যেন কিছুর মধ্যেই নেই। সমস্ত কিছু থেকেই সে অনেক কারাকে। তাকে নিরানন্দ গম্ভীর দেখায়।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় বুনিয়া, চানা ভাজা, চা ইত্যাদি নিয়ে টিউমল গণেরির কাছে হাজির হয়। আপ্যায়নের সুরে বলে, 'লো গণেরি ভাইয়া, চায় পানি পীও—'

কালচে কাথের মতো চা রয়েছে কলাই-করা গেলাসে আর বুনিয়া টুনিয়া শালপাতার মোড়কে। হাত বাড়িয়ে গেলাস আর শালপাতার ঠোঙা ধরতে ধরতে গণেরি বলে, 'এত লোককে চা খাওয়াচ্ছিস, মিঠাইয়া খাওয়াচ্ছিস! পাইসা পেলি কোথায়?'

টিউমল বিব্রত বোধ করে। গণেরির চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলে, 'মিলা গৈল ভাইয়া—'

কীভাবে টিউমল এত খরচ টরচ করছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না গণেরির। তীক্ষ্ণ নজরে তাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে, 'অঙ্গুঠার ছাপ মেরে মুনশীজীর কাছ থেকে কত রুপাইয়া করজ নিয়েছিস রে?'

মুখ নামিয়ে খুব আস্তে টিউমল মাথা নাড়ে। বলে, 'থোড়া কুছ; জ্যাদা নেহী।'

গণেরিকে বড়ই বিমর্ষ দেখায়। বহুদর্শী আধবুড়ো এই দোসাদ টিউমলদের সংসারের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখতে দেখতে হতাশ গলায় বলে, 'বুরবাক কাঁহাকা। ছৌয়ার সাদি তো দিচ্ছিস না, তার মৌত ডেকে আনছিস। বিলকুল খতম হয়ে যাবি তোরা।'

তৌহারের মতো এই আনন্দের দিনে গণেরির এ জাতীয় কথা খুবই অস্বস্তিকর। সে উত্তর না দিয়ে বলতে থাকে, 'পী লেও ভাইয়া, চায়পানি ঠাণ্ডী হো যায়গা—'

টিউমলের কথা কানে ঢোকে না গণেরির। সে রুক্ষ স্বরে শুধোয়, 'গলায় কত টাকার ফাঁস চড়িয়েছিস আগে বল্?'

'বললাম তো, জ্যাদা নেহী।'

'জ্যাদা তো নেহী, তবু বাতা কত টাকার করজ নিয়েছিস—'

নতমুখে টিউমল জানায়, 'দোশো—'

'করজ নিয়ে মেহমানের খাতিরদারি করছিস! লাখেড়া

(লক্ষ্মীছাড়া) ভৈস কাঁহাকা!' ক্ষেপে গিয়ে গণেরি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় গোটা দোসাদটোলাটায় সাড়া পড়ে যায়। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আ গিয়া, আ গিয়া—'

দেখা যায়, ক্ষারে-কাচা সাফসুতরো কাপড়-জামা আর দু কে-জি ওজনের কাঁচা চামড়ার ভারী নাগরা পড়ে টিউমলের ভাবী সমধী-সমধীন (বেয়াই-বেয়ান), তাদের ভাঞ্জা, বোনাই আর ওদের এক বয়স্ক পণ্ডিতজী (খুব সম্ভব পুরুত) কুয়োপাড়ের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। সমধীন অর্থাৎ বেয়ানের আসার কথা আগে জানায় নি গৈবীনাথ। জানান না দিয়ে তার আসাটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা। তা ছাড়া কনের মা হলে কী হবে, বয়সের তুলনায় সমধীনকে যুবতী দেখায়। পতলী 'কোমরা', টান টান চটকদার চেহারা, হাত পা এবং মুখের ছিরিছাদ চমৎকার; চোখে বিজরী খেলার মতো চাউনি। হাতে আর দুই ভুরুর মাঝখানে উল্কি। পরনে বাহারে শাড়ি, হাতে রুপোর কাঙনা, কানে 'করণফুল', নাকে ঝুটা পাথর-বসানো নাকছাবি, পায়ের মাঝখানের আঙুলে রুপোর চুটকি। মাথা থেকে গন্ধতেলের ভুরভুরে খুসবু ভেসে আসছে। দোসাদদের ঘরে এমন চেহারা এমন সাজগোজ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। পুতহুর জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে মেয়ের মাকে দেখে মজে এসেছে টিউমল। এমন না হলে আর সমধীন! দোসাদদের ঘরের মেয়েমানুষদের এমনিতেই তো কড়াপড়া হাত, তামাক আর খৈনি খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো আতার দানার মতো কালো, চোখেমুখে না ছিরি না ছাঁদ। হাঁ করলে গলায় যেন দশটা কৌয়া কি কামার পাখি ডেকে ওঠে। আর এই গৈবীনাথের বউ! সে যেন স্বর্গের পরীটি। বিয়ের পর শিউমল ক'দিন সসুরালে যাবে, সেটা সে বুঝবে। তবে সমধীনের টানে টিউমল যে মাঝে মাঝেই তিলাই গাঁয়ে হানা দেবে, সেটা চাঁদ সুরয ওঠার মতো একরকম নিশ্চিত।

গৈবীনাথদের দেখে বেজায় চঞ্চল হয়ে পড়ে টিউমল। সে বলে, 'ওরা এসে গেছে, আমি যাই ভাইয়া—' গণেরির উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে একরকম দৌড়ই লাগায়।

সেই ভোর থেকে একটানা 'সাদির গানা' গেয়ে আর অনবরত ঢোল পিটিয়ে গাইয়ে-বাজিয়েরা খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। টিউ-মলের নতুন কুটুম্বদের দেখে গানবাজনা দশগুণ তুমুল হয়ে ওঠে। এর

মধ্যেই টিউমল, তার বউ এবং দোসাদটোলার অন্যান্য মেয়েপুরুষ গৈবীনাথদের যথেষ্ট সমাদর করে ঘরের বারান্দায় নিয়ে বসায়। পণ্ডিতজীর খাতিরদারির জন্য দ্রুত অন্য ব্যবস্থা করা হয়। তার হাত-পা ধোওয়ার জন্য নতুন কুয়ো থেকে টাটকা জল তোলা হয়, বসার জন্য আনা হয় দড়ির চৌপায়া। এ জাতীয় বামহনেরা যারা অচ্ছুৎদের নানা ক্রিয়াকরম সাদি-শরার্ধের কাজ করে তারা ব্রাহ্মণকুলে পতিত। উচ্চবর্ণের 'শুধ' (শুদ্ধ) বামহনের কাছে এদের হুক্কা-পানি বন্ধ।

যাই হোক, সবাইকে বসাবার পর চা আসে, বুনিয়া আসে। এটা প্রাথমিক আপ্যায়ন। তারপর নানা মজার এবং রসের কথার পর আসল কাজের কথা শুরু হয়। পণ্ডিতজী পাঁজিপুঁথি দেখে বিয়ের দিন পাকা করে দেয়। ছট পরবের পর প্রথম 'পুনমকা রাতে' টিউমলের ছেলের সঙ্গে গৈবীনাথের মেয়ের বিয়ে হবে।

ভাবী জামাইকে পাঁচটা কাঁচা টাকা আর নতুন কোরা ধুতি দিয়ে আশীর্বাদ করে গৈবীনাথ এবং তার বউ।

খুশিতে ডগমগ টিউমল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'হো গৈল, রামজীকা কিরপাসে সাদিকা বাত পাক্কা হো গৈল—'

এ সবের মধ্যে আরো একটা ব্যাপার ঘটতে থাকে। সবাই যখন বিয়ের কথা বা গান বাজনায় ব্যস্ত তখন বার বার কুশী আর ধর্মার চোখাচোখি হয়। কুশীর চোখে বিষণ্ন করুণ চাউনি। যত বার কুশীর দিকে চোখ যায়, ততবারই ধর্মা ছ্যাখে, মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বিয়ের কথা পাকা হতে হতে বেলা হেলে যায়। সূরয খাড়া মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করে। জমায়েত ভেঙে একে একে দোসাদটোলার বাসিন্দারা যে যার ঘরে ফেরে। টিউমলের ঘরে তাদের শুধু চা-পানি খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। দুপুরের খাওয়া যার যার নিজের ঘরে। তবে নতুন কুটুম্বরা টিউমলদের ওখানেই দুপুরের 'ভোজন' সারবে। সে জন্য ভাত, ডাল, সবজি, মাংস, টক দহি, বুনিয়া—রীতিমত একটা ভোজের আয়োজন করেছে টিউমল।

সবার সঙ্গে সঙ্গে কুশী ধর্মা এবং তাদের চার মা-বাপও নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছিল। এখন কুশীদের ঘরের বারান্দায় কুশীরা আর ধর্মাদের ঘরের বারান্দায় ধর্মারা খেতে বসেছে।

মোটা দানার লাল লাল ভাত কালচে বিড়ির ডাল দিয়ে মেখে বড় বড় গরাস মুখে পোরে ধর্মা আর তার বাপ। মাঝে মাঝে পেঁয়াজ আর হরা মিরচিতে কামড় দেয়।

ওদিকে ধর্মার মাও ভাত মেখে নিয়েছিল। খেতে খেতে সমানে বকতে থাকে সে, 'সবার ছেলেমেয়ের সাদি হয়ে যায়। আমাদের ঘরেই সিরিফ আন্ধেরা।'

মায়ের গলার সুরেই আন্দাজ পাওয়া যায়, তার কথাবার্তা এবার কোনদিকে বাঁক নেবে। এই দোসাদটোলায় যখনই কোন ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় তখনই বুড়ীর গজর গজর শুরু হয়। তার বড় আশা, ছেলের বিয়ে দিয়ে কুশীকে পুতহু করে ঘরে তোলে। মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে পাতে ঘাড় গুঁজে দেয় ধর্মা ; ঝড়ের বেগে নাকেমুখে ভাতডাল গুঁজতে থাকে। এভাবে খাওয়ার একমাত্র কারণ, তাড়াতাড়ি মায়ের সামনে থেকে সরে পড়া।

বুড়ী ফের বলে, 'কা রে, তোর মতলবটা কী ?'

ধর্মা বলে, 'কীসের মতলব ?'

'সাদি উদি করবি না ? নাকি বনভৈসার (বুনো মোষ) মতো সারা জীওন ঘুরে বেড়াবি ? তোর চেয়ে ছোট ছেলেদের সব সাদি হয়ে গেল !'

পাশের ঘরের বারান্দায় বসে খেতে খেতে মা আর বেটার সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল কুশীর মা। গলা তুলে সে বলে, 'বেটোয়াকে সমঝা ধর্মাকা মাঈ ; সাদিটা এবার চুকিয়ে ফেলুক।'

ধর্মার মা বলে, 'তোরাই সমঝা। সাদির কথা বলে বলে আমার মুখে খুন উঠে গেছে।'

ধর্মা বলে, 'সাদি করব না বলছি ? লেকেন—'

'লেকেন কী ?'

'রুপাইয়া পাইসা কঁহা ? বিয়ের খরচ খরচা আসবে কোত্থেকে ?'

'কেন বগেড়ি মেরে যে পাইসা জমাচ্ছিস তার থেকে সাদির খরচা দিবি।' পাখি এবং বনের নানারকম জানোয়ার মেরে সেগুলোর নখ-দাঁত-চামড়া টিরকে মারফত সাহেবদের কাছে বেচে ধর্মা আর কুশী যে টাকা জমাচ্ছে, বুড়ী সে খবর রাখে।

'ঐ পাইসা সাদির জন্যে না।'

'তবে ?'

'করজ শুধবার জন্যে।' ধর্মা যা বলতে থাকে তা এইরকম। বড়ে সরকারের পাই পয়সাটি হিসেব করে মিটিয়ে দেবার পর যখন তারা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারবে, ভূমিদাসদের গ্লানিকর কুৎসিত জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে, তখনই বিয়ের কথা ভাববে সে।

'ততদিনে যে মৌতের বয়েস হয়ে যাবে রে ভূচ্চর—'

'হয় হোক।'

পাশের ঘরের দাওয়া থেকে কুশীর মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো রামজী, তোর বেটোয়ার জন্যে আমার বেটীর সাদি রুখে রয়েছে। জানবর লাখেড়া কাঁহিকা—'

নিজের পেটের ছোয়াকে যা খুশি বলতে পারে ধর্মার মা। তাকে মারতে পারে, কাটতে পারে কিন্তু পরে কোন অধিকারে গালাগাল দেবে? সে ফোঁস করে ওঠে, 'কা রে, তুই আমার বেটোয়াকে গালি দিচ্ছিস! বুড়হী গিধ, বুড়হী শাঁখরেল কাঁহিকা। তোর মুহ্‌মে আগ ধরিয়ে দেব—'

কুশীর মা-ও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে-ও কোমর বেঁধে লেগে যায়। লাফ দিয়ে নিচে নেমে প্রবল বেগে হাত-পা নেড়ে ভেংচায়, চেঁচায়, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে। ধর্মার মা-ও বসে থাকে না। শুরু হয়ে যায় তুমুল ধুন্ধুমার। চিৎকারে গালাগালিতে দোসাদটোলা থেকে তাবত কাকচিল উধাও হয়ে যায়।

'দেবো না তোর বেটোয়ার সাথ আমার লড়কীর সাদি। বিয়ে দিলে এতদিনে আমার কুশীটার দুটো ছোয়া হয়ে যেত।'

'তুই দিবি না কী, আমিই তোর লেড়কীকে পুতহু করব না। তোদের রিস্তাদারির মুহ্‌মে দশ বার থুক, দশ বার লাথ।'

যখনই এখানে কারো ঘরে বিয়ে সাদি লাগে, কুশীর মা এবং ধর্মার মায়ের মধ্যে একপ্রস্থ লড়াই বেধে যায়। শুধু যাদের নিয়ে এই মহাসমর তারা পাশাপাশি দুই ঘরের দাওয়ায় বসে মুখ টিপে হাসে।

তেইশ

দুপুরে ভাত-ডাল-মাংস-সবজি-আচার এবং লাড্ডু-দহি দিয়ে উৎকৃষ্ট 'ভোজন' সেরে টিউমলের ভাবী সমধী-সমধীন আরো খানিকক্ষণ 'গপসপ' করেছে, হাল্কা মেজাজে ঠাট্টা-তামাসা করেছে। তারপর

জষ্ঠি মাসের সূরয পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেলে তারা তিলাই গাঁওয়ে রওনা হয়ে গেছে।

অন্যদিন দোসাদটোলাটা ভোর থেকে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত ফাঁকা পড়ে থাকে। এটা যে একটা মানুষের বসতি তখন তা একেবারেই মনে হয় না। অন্য দিন এখানে কারো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, চারদিক নিঝুম হয়ে থাকে। আজ দোসাদটোলা একেবারে সরগরম। শিউমলের বিয়ে উপলক্ষে আচানক এক রোজ ছুটি পেয়ে যাওয়ায় এখানকার বাসিন্দারা বেজায় খুশী। এমন কি দোসাদটোলার যারা স্থবির মানুষ বা কমজোরি দুব্‌লা বুড়ো-বুড়ী, তারা পর্যন্ত আজ আর খাবারের খোঁজে বেরোয় নি। এখন এই পড়তি বেলায় ফাঁকা জায়গাগুলোতে দড়ির চৌপায়া পেতে থোকায় থোকায় পুরুষ এবং মেয়েরা গপসপ করছে। কেউ কেউ আবার গানের আসর বসিয়ে দিয়েছে। গোটা দোসাদটোলা জুড়ে ঢিলেঢালা আলস্যের ভাব।

আচমকা দূর থেকে বহু গলার চিৎকার ভেসে আসে। আওয়াজটাই শুধু শোনা যায় কিন্তু লোকগুলো কী বলছে পরিষ্কার বোঝা যায় না। তবে দোসাদটোলার মানুষরা কথাবার্তা এবং গান-বাজনা থামিয়ে কান খাড়া করে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টের পাওয়া যায়, চিৎকারটা এদিকেই আসছে। গলার স্বরগুলোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সুখন রবিদাসকো—'
'বোট দো।'
'সুখন রবিদাসকো—'
'বোট দো, বোট দো।'
'উটকা পর—'
'মোহর মারো, মোহর মারো।'

একসময় দোসাদটোলার তাবত মেয়েপুরুষ বাইরের ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙায় বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে হাইওয়ের দিক থেকে শ'খানেক মানুষের একটা দলও চিৎকার করতে করতে কাছে চলে এসেছে। সবার আগে আগে রয়েছে স্বয়ং সুখন রবিদাস।

বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের, শুধু এই দুটো জায়গারই বা কেন, পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে যত গাঁ-গঞ্জ হাট-বাজার রয়েছে, সব জায়গার তাবত মানুষ সুখনকে চেনে। বিশেষ করে জল-অচল

অচ্ছুতেরা। তারা শুধু সুখনকে চেনেই না, মনে মনে তার নামে পূজোও চড়ায়। চামারদের এই ছেলেটা বহুত তেজী। বামহন-কায়াথ-রাজপুত, সরকারী অফসর, থানার দারোগা কি মাজিস্টার, কাউকেই সে রেয়াত করে না। ঠাঁই ঠাঁই সবার মুখের ওপর কথা বলে। হাঁ, সিনায় সাহস আছে ছোকরার।

সুখেনকে যেমন এ তল্লাটের সবাই চেনে, সুখনও তেমনি অনেককেই চেনে। বিশেষ করে এই দোসাদটোলার গণেরি, বুধেরি, টিউমল থেকে শুরু করে মাধোলাল বৈজু পর্যন্ত অন্তত দশ বিশজন তার 'জানপয়চান আদমী'।

হাত তুলে সুখন তার সঙ্গীদের থামিয়ে সোজা গণেরির কাছে এগিয়ে এল। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ চাচা?'

গণেরির চোখমুখ দেখে বোঝা যায়, সুখনকে দেখে সে খুশী হয়েছে। সুখন এ অঞ্চলে বহু জনেরই প্রিয়। গণেরি খুব আন্তরিক গলায় বলে, 'ভালো। তুমি কেমন আছ?'

'আচ্ছা—'

এরপর ঘুরে ঘুরে দোসাদটোলার সবার কাছেই যায় সুখন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের নানা খবর নিয়ে ফের গণেরির কাছে ফিরে আসে। বলে, 'চাচা, একটা দরকারী কাজে তোমাদের কাছে এসেছিলাম।'

সুখনের কাজের ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে গণেরি। তবু শুধোয়, 'কী কাজ, বল—'

'জরুর শুনেছ, আমি এবার চুনাওতে নেমেছি।'

'শুনা হ্যায়।'

'আমি তোমাদের কাছে কী জন্যে এসেছি, এবার বুঝতে পারছ তো?'

আধবুড়ো অভিজ্ঞ গণেরিকে এবার কেমন যেন বিপন্ন দেখায়। সে অন্যমনস্কর মতো আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে সুখন এবার বলে, 'আমি এসেছি চুনাওতে তোমাদের ভোট চাইতে। বহোত আশা করে এসেছি। তোমাদের হর আদমীর ভোট আমার চাই। একটা ভোটও যেন আর কেউ না পায়।'

গণেরি চুপ করে থাকে।

সুখন বলে যায়, 'আমার মার্কা হল উট। উটের পাশে মোহর মারবে। আমি জানি তুমি দোসাদটোলার সব। তুমি বললে আমাকে ভোট না দিয়ে কেউ পারবে না। কেন আমাকে চুনাওতে জেতানো দরকার সবাইকে বুঝিয়ে দিই, না কি বল চাচা ?'

গণেরি এবারও উত্তর দেয় না।

সুখন খানিকটা পিছিয়ে ছোটখাট একটা টিলার মতো জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর গলা চড়িয়ে বলতে থাকে, 'ভাইয়া আর বহিনরা, তোমরা অচ্ছুৎ, দোসাদ। তার ওপর কমিয়া। বাপ-নানা কি নানাকা বাপের আমল থেকে পুরা জীওন পরের জমিনে বেগারি দিয়ে যাচ্ছ। আমিও অচ্ছুৎ—চামারকা বেটোয়া। আমাদের নাম শুনলে উঁচা জাতের লোকেরা দশ বার থুক দেয়। আমাদের ছায়া যেখানে পড়ে তার দশ মাইল তফাত দিয়ে হাঁটে।'

দোসাদটোলার বাসিন্দারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে সুখনের কথা শুনতে থাকে; তাদের চোখের পাতা পড়ে না।

সুখন সমানে বলে যায়, 'দেশমে চালু হ্যায় বামহনরাজ, কায়াথরাজ, উঁচা জাতোকা রাজ। তোমরা আমরা, মতলব চামার গঞ্জু ধোবি দোসাদ ধাঙড়েরা চান্দা-সূরয যত কাল ধরে উঠছে সব কোই উঁচা জাতের জুতির নিচে পড়ে আছি। জানবরের মতো ওরা আমাদের খাটায়, জানবরের মতো আমাদের সাথ ব্যবহার করে। লেকেন এ নেহী চলেগা, নেহী চলেগা। তোমার আমার মতো অচ্ছুৎদের ভালাইয়ের জন্যে আমাকে জেতানো দরকার। চুনাওতে তোমরা যদি আমাকে জিতিয়ে দাও, আমরা সবাই যাতে মানুষের মতো বাঁচতে পারি তার কোসিস করব। কমসে কম পটনার বিধানসভায় গিয়ে দুনিয়ার মানুষকে তো জানাতে পারব আমরা অচ্ছুৎরা কী অবস্থায় আছি। তোমরা কামিয়ারা কীভাবে পরের জমিনে জান খতম করে দিচ্ছ। ইয়াদ রেখো আমার মার্কা হল উট। উট মার্কায় মোহর মারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুখনের সঙ্গীরা চিৎকার করে ওঠে:

'সুখখন রবিদাসকো—'

'বোট দো, বোট দো।'

'উটমে —'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

'সুখখন জিতনেসে—'

'অচ্ছুৎ বাঁচেগা।'

'সুখখন জিতনেসে—'

'জমানা বদল যায়েগা।'

হাতের ইঙ্গিতে সঙ্গিদের থামিয়ে টিলা থেকে নেমে ফের গণেরির কাছে চলে আসে সুখন। তার বুকে একটা হাত রেখে বলে, 'তোমার ওপর ভরোসা করে রইলাম চাচা।'

গণেরিকে খুবই চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'মগর—'

'মগর-উগর কুছ নায়। দুসরা বাত নেহী শুনেগা। তোমার আদমীদের সবার ভোট আমার চাই, চাই, চাই।'

'মগর—'

'ফির মগর!'

গণেরি বলে, 'আমি কী বলতে চাই, শুনেই নাও না—'

একটু ভাবে সুখন। কপাল কুঁচকে বলে, 'ঠিক হ্যায়। বল—'

গণেরি যা বলে তা এইরকম। তারা বাপ-নানা কি তারও আগের আমল থেকে পুরুষানুক্রমে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের কাছে খরিদী হয়ে আছে। সেই বড়ে সরকার এবার চুনাওতে নেমেছেন। এদিকে সুখন রবিদাসও নেমেছে। সুখন তাদের আপনা আদমী; মনমে বহোত ইচ্ছা তাকেই ভোট দিয়ে চুনাওতে জিতিয়ে দিতে। কিন্তু মুসিবৎ হয়ে গেছে রঘুনাথ সিংয়ের জন্য। তাঁরই জনমদাস হয়ে, তাঁরই কাটানো কুয়োর জল খেয়ে, তাঁরই দেওয়া জায়গায় ঘর তুলে আজীবন বাস করে চুনাওর সময় তাঁর হাতী মার্কার বদলে উট মার্কায় মোহর মারলে ঘাড়ের ওপর মাথাটা কি আর খাড়া থাকতে দেবেন রঘুনাথ? পোষা পহেলবানদের লেলিয়ে জরুর তাদের ঘরে আগ লাগিয়ে দেবেন; জানে খতম করে লাশ গুম করে ফেলবেন।

সুখন বলে, 'ঘাবড়াও মৎ চাচা। সবাই যদি বড়ে সরকারদের নামে ডরে যায় আমাদের হাল কী হবে? সারা জীওন আমরা উঁচা জাতের নাগরার নীচে পড়ে থাকব? তাদের জমিনে কামিয়া খেটে খেটে খতম হয়ে যাব? এ হবে না গণেরি চাচা, সিনার ভেতর থোড়েসে তাকত আনো।' বলে দু কাঁধ ধরে গণেরিকে ঝাঁকায় সুখন। খুব সম্ভব তার মধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চার করতে চেষ্টা করে।

ভীরু গলায় গণেরি জানায়, 'তোমার কথাটা ভেবে দেখব।'

গণেরির কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে সুখন বলে, 'ঠিক হ্যায় চাচা ; আজ যাই। আবার আমি আসব।' অন্য দোসাদদের দিকে হাত তুলে বলে, 'চলি ভাইরা, বহিনরা—' তারপর দলবল নিয়ে কাঁকুরে ডাঙা পেরিয়ে দূরে হাইওয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

গণেরিরা খানিকটা দূরে চলে গেলে, ভিড়ের ভেতর থেকে নওরঙ্গী বেরিয়ে আসে। সুখনের চিৎকার শুনে সবার সঙ্গে সে-ও দোসাদটোলার বাইরে চলে এসেছিল। পরে তার কথা আর কারো মনে ছিল না।

নওরঙ্গী হাত-পা নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বলে. 'ভূচ্চর জানবরটার মরার জন্যে ডানা গজিয়েছে। মরেগা. ও হারামী জরুর মরেগা. বিলকুল ফৌত হো যায়েগা।'

ভূচ্চর জানবর এবং হারামী—এই তিনটে বাছা বাছা উৎকৃষ্ট গালাগাল কার উদ্দেশে দেওয়া হল, দোসাদদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুখন যে এখানে ভোট চাইতে এসেছিল, এই খবরটা জানতে রঘুনাথ সিংয়ের খুব বেশি দেরি হবে না। নওরঙ্গী যখন তাকে দেখে ফেলেছে তখন নিশ্চয়ই সুখনের কথা হিমগিরি মারফত বড়ে সরকারের কানে উঠে যাবে।

এখানে সুখনের ভোট মাঙ্‌তে আসাটা যেন গণেরিদের মস্ত এক অপরাধ। নওরঙ্গীর নানা অঙ্গভঙ্গি দেখে বা তার মুখে সুখন সংক্রান্ত খিস্তিখেউড় শুনেও কেউ মুখ খোলে না ; সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে।

নওরঙ্গী ফের বলতে থাকে, 'কুত্তাটার সিনায় বহোত তাকত। বড়া সরকারের আপনা আদমীদের কাছে ভোট মাঙ্‌তে এসেছে। ঘাড়ের ওপর দশটা শির গজিয়েছে হারামজাদার ; শিরগুলো নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নওরঙ্গীর কথা শুনতে শুনতে রামলছমনের কথা মনে পড়ে যায় ধর্মার। সেদিন চাহাঢ়ের হাটে সুখনদের দেখে এই রকমই ক্ষেপে গিয়েছিল বগুলা ভকতটা দেখা যাচ্ছে বড়ে সরকারের পা-চাটা কুত্তারা তিনি ছাড়া আর যারাই চুনাওতে নেমেছে তাদের সবার ওপর ক্ষিপ্ত।

ওদিকে নওরঙ্গী আর দাঁড়ায় না. সুখনকে আরো কয়েক প্রস্থ

খিস্তিখাস্তা করে লম্বা লম্বা পা ফেলে দোসাদটোলায় ঢুকে যায়। বাকী সবাইও ফিরে যেতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর গোটা দোসাদটোলাটা অবাক হয়ে দেখে, সেজেগুজে নওরঙ্গী চলে যাচ্ছে। অন্য দিন সূর্যাস্তের অনেক পর রাত্ত বেশ ঘন হলে তাকে হিমগিরির কাছে নিয়ে যাবার জন্য খামারবাড়ি থেকে গৈয়া গাড়ি আসে। আজ এখনও সন্ধ্যা পর্যন্ত নামে নি, পশ্চিম দিকের আকাশের গায়ে লাল রঙের সূরযটা আটকে আছে। এত তাড়াতাড়ি এত ব্যস্তভাবে স্রেফ পায়দল নওরঙ্গীর বেরিয়ে পড়ার কারণ কী, দোসাদটোলার বাসিন্দাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারা চুপচাপ বসে বসে নিজেদের ভীরু হৃৎপিণ্ডের ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনতে থাকে। তবু তারই মধ্যে কে যেন ফিসফিসিয়ে গণেরিকে শুধোয়, 'কা হোগা ভাইয়া ? ও ছমকী রাণ্ডী আওরত জরুর মিশির-জীকা পাস সুখনকো খবর পৌঁছা দেগী—'

গণেরি আস্তে মাথা নাড়ে, 'ঠিক বাত—'

'মিশিরজী জরুর বড়ে সরকারকে জানাবে।'

'ও ভি ঠিক।'

'তব্—'

'দ্যাখ কী হয়! কেউ আমাদের কাছে এলে কী করে ভাগাই!'

খুব বেশি সময় কাটে না। সূরয ডুববার পর আকাশ থেকে মিহি অন্ধকার যেই নামতে শুরু করে, লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে রামলছমন এসে দোসাদটোলায় হাজির হয়। চনমন করে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে বলে, 'কী ভেবেছিস তোরা ? একেবারে চৌপট হয়ে যাবি যে রে উল্লুর বেটোয়া-বেটিয়ারা।'

দোসাদরা ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কা হুয়া দেওতা ?'

'কা হুয়া ?' রামলছমন বলতে থাকে, 'চল্ আমার সাথ। গেলেই বুঝতে পারবি। যত মরদ আছিস, উঠে পড়—'

'কঁহা যায়গা হুজৌর ?'

'গেলেই মালুম পাবি। চল্—' ধমকে চেঁচিয়ে গোটা এলাকাটা মাথায় তুলে ফেলে রামলছমন।

একটু পরেই দেখা যায়, দোসাদটোলার তাবত পুরুষরা বগুলা ভকতের পিছু পিছু হাইওয়ের দিকে চলেছে। রামলছমন তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

তবে নওরঙ্গীর ওভাবে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়া, তারপরেই রামলছমনের এখানে আসা—সব কিছুর মধ্যেই একটা অনিবার্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবু দেখাই যাক।

শেষ পর্যন্ত রামলছমন দোসাদদের যেখানে এনে তুলল সেটা বড়ে সরকারের হাভেলি। রঘুনাথ সিং শ্বেত পাথরের ঢালা বারান্দায় তাঁর সেই গদিমোড়া বিরাট ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে তাঁর সর্বক্ষণের সহচরেরা। ডাগদরজী, ভকীলজী, মাস্টারজী ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আছে তাঁর হয়ে চুনাওর জন্য যারা খাটছে সেই সব কর্মীরা।

এধারে ওধারে গণ্ডা গণ্ডা বিজলী বাতি জ্বলছে। রোশনিতে চারদিক দিনের মতো স্পষ্ট।

রামলছমন রঘুনাথ সিংকে বলে, 'সরকার, সবাইকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

আস্তে মাথা হেলিয়ে রঘুনাথ সিং হাতের ইসারায় তাকে চলে যেতে বলেন।

দোসাদদের কাছে এবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। বড়ে সরকারই তাদের তলব করে এনেছেন। তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু রঘুনাথ সিংয়ের চোখমুখ দেখে মনেই হয় না তিনি গুস্‌সা হয়েছেন। বরং তাঁর তাকানোর মধ্যে রয়েছে অগাধ স্নেহ এবং প্রশ্রয়। খুব মিষ্টি করে বলেন, 'কা রে, সব দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বসে পড়।'

নিচের ঘাসের জমিতে গা জড়াজড়ি করে দলা পাকিয়ে বসে পড়ে গণেরিরা। কী কারণে বড়ে সরকার ডাকিয়ে এনেছেন, সেটা না জানা পর্যন্ত বুকের কাঁপুনি তাদের থামে না।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'টিউমলের বেটার সাদির বাত পাক্কা হয়ে গেল?'

টিউমল কাঁপা গলায় জানায়, হুজৌর বড়ে সরকারের কিরপায় পাকা কথা হয়ে গেছে।

মেয়ের বাড়ি থেকে কথা পাকা করতে কারা কারা এসেছিল, কী কী কথা হল, নতুন কুটুমদের কী খাইয়েছে টিউমলরা, সমস্ত অনুষ্ঠানটা ভালভাবে চুকেছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

অনেক কিছু জেনে নিলেন রঘুনাথ সিং। তারপর ফস করে শুধোন, 'শুনলাম তোদের ওখানে সুখন রবিদাস ভোট মাঙতে এসেছিল। লম্বে লম্বে বহোত লেকচার ভি দিয়া।'

টিউমলের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে এত আন্তরিক কথাবার্তা বলছিলেন রঘুনাথ সিং যে ভয়টা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল দোসাদদের। আচমকা সুখনের কথা উঠতেই সবাই ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে গেল। চোখেমুখে আবার দুর্ভাবনার ছাপ পড়েছে তাদের। গণেরিই শুধু দুর্জয় সাহসে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলে, 'হঁ সরকার, আয়া থা, কুছ বাত ভি বোলা—'

'ভোট মাঙা ?'

'হঁ হুজৌর।' বলে জোরে জোরে শ্বাস টানে গণেরি। তারপর নতুন উদ্যমে ফের বলতে থাকে, 'কা করে সরকার। কেউ আমাদের কাছে এলে ভাগাই কী করে ? বহোত গরীব আদমী হামনিলোগ। আপ হামনিলোগনকো মা-বাপ—'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'কভি নায়। গণতন্ত্রমে যে চুনাওতে নামবে তারই ভোট মাঙবার অধিকার আছে। তোদের কাছে আজ সুখন এসেছে, কাল প্রতিভা সহায় আসবে, পরশু আবু মালেক আসবে, নরশু শর্মাজী আসবে। তবে এর 'বীচমে' একটা লেকেন আছে—'

গণেরি শুধোয়, 'কা হুজৌর ?'

'যেই ভোট মাঙুক, তোরা হাতী মার্কায় মোহর মারবি। মনে রাখবি, হাতীতে মোহর মারলে ভোটটা আমিই পাব। আমি তোদের আপনা আদমী। আমাকে চুনাওতে জেতালে তোদের ভালাই হবে। সমঝা ?'

গণেরির ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে ; বুকের সেই ঢিপঢিপানি থামে। রঘুনাথ সিং তা হলে তাদের ওপর গুস্সা হননি। গণেরি বলে, 'সমঝ গিয়া হুজৌর।' বলতে বলতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। শুধোয়, 'একঠো বাত সরকার—'

'হাঁ হাঁ, পুছ না।'

'সেদিন আমাদের টোলাতে অবোধজী এসেছিল।'

'অবোধজী কৌন ?'

'বিজুরি বাজারের বড়া ব্যওসাদার।'

'সমঝ গিয়া ; অবোধ পাণ্ডে। প্রতিভা সহায়ের হয়ে চুনাওতে

খাটছে।'

গণেরি বলে, 'পরতিভাজীর জন্যে 'বোট' মাঙতে এসেছিল।'

উদার ভঙ্গিতে রঘুনাথ সিং উত্তর দেন, 'জনতাকে রাজ গণতন্তমে কারো ভোট চাইতে দোষ নেই।'

সাহস পেয়ে গণেরি ফের বলে, 'আউর একঠো বাত বড়ে সরকার।'

'কা ?'

'সাত-আট রোজের মধ্যে গারুদিয়া বাজারে পরতিভাজীর চুনাওকা মীটিন হবে।'

'চুনাওতে নামবে আর মীটিং হবে না ? জরুর মীটিং হবে। লেকেন আসল কথাটা কী ?'

'সেই মীটিনে অবোধজী আমাদের যেতে বলেছে। গাড়িতে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে যাবে।'

'কা গাড্ডি ? গৈয়া না ভৈসা ?'

'হাওয়া গাড়ি সরকার।'

ওধার থেকে হেড মাস্টারজী বদ্রীবিশাল চৌবে বলে ওঠেন, 'চুনাও আসাতে তোদেরই দেখছি বরাত খুলে গেল। কা সৌভাগ তোদের। হাওয়া গাড়িতে চড়িয়ে অচ্ছুতেয়াদের মীটিঙে নিয়ে যাবে। কলযুগের বাকি যেটুকু ছিল তাও 'পূর্ণ' হয়ে গেল।'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেন রঘুনাথ সিং। বেলন, 'অ্যায়সা না কহিয়ে চৌবেজী। গণতন্তমে সব কোইকো হাওয়া গাড়ি চড়নেকো অধিকার হ্যায়।' গণেরির দিকে ফিরে বলেন, 'যাবি, নিশ্চয়ই হাওয়া গাড়ি চড়ে তোরা প্রতিভা সহায়ের মীটিং শুনতে যাবি।'

গণেরির সাহস এবার চারগুণ বেড়ে যায়। সে বলে, 'সরকার, অবোধজী বলেছে, যে পরতিভাজীর চুনাও মীটিনে যাবে তার তিনগো রুপাইয়া মিলবে। রুপাইয়া নেব ?'

'রুপাইয়া দিতে চাইছে আর নিবি না! গাধ্ধা কাঁহাকা! গণতন্তমে রুপাইয়া নিতে কোথাও মানা নেই। লেকেন—'

'কা সরকার ?' দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে গণেরি।

'চুনাওর মওকায় যত পারিস হাওয়া গাড়ি চড়ে নে, যত পারিস পাইসা কামাই কর, লেকেন ভোটটা আমার চাই। হাতী মার্কায়

মোহর মারার কথা জান গেলেও ভুলবি না।'

'নায় হুজৌর।'

ডান দিকে যেখানে তেরপল দিয়ে নির্বাচন কর্মীদের জন্য অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেখান থেকে চিৎকার ওঠে।

'আপনা ভালাইকে লিয়ে—'

'রঘুনাথ সিংকো বোট দো, বোট দো।'

'হাতী মার্কামে—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

চিৎকার থামলে রঘুনাথ সিং গণেরিদের বলেন, 'অনেক রাত হল ; তোরা ঘরে যা।'

দোসাদরা ফিরে যায়।

রঘুনাথ সিংয়ের প্রধান কুত্তাদের একজন ভকীলজী এবার বলে ওঠেন, 'কারখানাবালীর বহোত পাইসা হয়েছে। চুনাওতে খুব ছড়াচ্ছে।'

চৌবেজী বললেন, 'চারদিকে সব গরীব মানুষ। রুপাইয়া পাইসার লালচে ভোট টোট কারখানাবালীকে না দিয়ে বসে।'

এতক্ষণ বেশ হাসিখুশিই ছিলেন রঘুনাথ সিং। এবার তাঁর মুখটা ভয়ানক গম্ভীর দেখায়। তবে তিনি আপাতত প্রতিভা সহায় সম্পর্কে কোনরকম মন্তব্য করেন না।

বাঙালী ডাগদর শ্যামদুলাল সেন বলেন, 'আরো একটা কথা আছে রঘুনাথজী।'

রঘুনাথ সিং বিশাল শরীর কাত করে ডান পাশে শ্যামদুলালের দিকে তাকান।

শ্যামদুলাল বলেন, 'এবার আমাদের এই জায়গায় চুনাওর ক্যারেক্টারটা বড়া আজীব।'

'কী রকম ?'

'মোট ছ'জন চুনাওর লড়াইতে নেমেছে। প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, সুখন চামার, আবু মালেক, আপনি আউর ছে নম্বর যে আছে তাকে না ধরলেও চলে। নিজের ফ্যামিলির আট দশ জনের ছাড়া বাইরের আধখানা ভোটও সে পাবে না।'

রঘুনাথ বলেন, 'চুনাওতে কোথাও পাঁচ ক্যাণ্ডিডেট লড়ে, কোথাও সাত ক্যাণ্ডিডেট, কোথাও দশ পন্দরভি। এর মধ্যে আজীব কেরেক্টারটা

কোথায় পেলেন ?'

হাত তুলে রঘুনাথ সিংকে থামিয়ে দেন শ্যামদুলাল। তারপর গারুদিয়া-বিজুরির চুনাওতে এবার যে আশ্চর্যজনক লক্ষ্যণীয় ব্যাপারটা ঘটছে সবিনয়ে এবং সংক্ষেপে তা বলে যান। এখানকার পাঁচ নির্বাচন প্রার্থীর ভেতর থেকে প্রথমেই রঘুনাথ সিংকে ধরা যাক। রঘুনাথ সিং হলেন জমির মালিক, সান অফ দি সয়েল—পুরুষানুক্রমে মিট্টিকা সন্তান। দু নম্বর প্রতিভা সহায়; বিজুরিতে তাঁর সসুরাল হলেও আসলে তিনি গাঁওকা আদমী নন; তিনি শহরের মানুষ—ইণ্ডাস্ট্রিয়া-লিস্ট, কারখানাবালী। দেশের মিট্টিতে তাঁর 'রুট' নেই। তিন নম্বর হল সুখন রবিদাস। সে অচ্ছুৎ জল-অচলদের প্রতিনিধি। চার নম্বর আবু মালেক: মাইনোরিটিদের রিপ্রেজেণ্টেটিভ। আর পাঁচ নম্বর নেকীরাম শর্মা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে এই চুনাওতে নেমেছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে জমি মালিক, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অচ্ছুৎ, মুসলিম মাইনোরিটি আর উঁচা জাতের হিন্দু—পাঁচ ক্লাসের রিপ্রেজেণ্টেটিভ এই অঞ্চলের নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী।

খুবই মনোযোগ দিয়ে শ্যামদুলালের কথা শুনে যান রঘুনাথ সিং, তবে তেমন গুরুত্ব দেন না। হাল্কাভাবেই বলেন, 'এর মধ্যে আজীব বা নয়া কিছু নেই। এসব আমাদের জানা। আগেও এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে।'

শ্যামদুলাল ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'ও তো ঠিক বাত। লেকেন আমার আরো কথা আছে।'

'কী ?'

'সোসাইটির পাঁচ ক্লাসের রিপ্রেজেণ্টেটিভ যখন চুনাওতে নেমেছে তখন ভোট জরুর পাঁচ ভাগ হয়ে যাবে। সেটা কিন্তু চিন্তার কথা।'

রঘুনাথ সিং হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে এবার বলেন, 'চিন্তার কথা কেন ? থোড়াসে সমঝা দিজিয়ে।'

শ্যামদুলাল এবার যা বলেন তা এইরকম। গারুদিয়া-বিজুরিতে কমসে কম থার্টি পারসেণ্ট অচ্ছুৎ আছে। সুখন চামার এই ভোটের প্রায় পুরাটাই টানবে। দুই তালুকে উঁচা জাতের হিন্দু আছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পারসেণ্ট। বিজুরি তালুকের মিশিরলালজী ভরসা দিলেও নেকীরাম জাতওয়ারি সওয়াল তুলে ব্রাহ্মণদের ভোট অনেকহাই পেয়ে যাবে। এখানে মাইনোরিটি মুসলিম রয়েছে ফিফটিন থেকে

সেভেনটিন পারসেন্ট। আবু মালেক তাদের প্রায় সব ভোটটাই পাবে। আর কারখান্নাবালী প্রতিভা দশ হাতে পয়সা ছড়িয়ে প্রচুর ভোট কিনে নেবে। ফলে কেউ অন্যের চাইতে খুব বেশি একটা ভোট টানতে পারবে না। যেই জিতুক, সামান্য ভোটের মার্জিনে জিতবে।

রঘুনাথ সিংয়ের কপালে ভাঁজ পড়ে। শ্যামত্বলালের কথাগুলো তাঁর মস্তিষ্কের ভেতর দ্রুত বসে যেতে থাকে। গম্ভীর মুখে তিনি বলেন, 'চুনাওর এ দিকটা তো খেয়াল করি নি। করা উচিত ছিল।'

শ্যামত্বলাল ছাড়া রঘুনাথ সিংয়ের অন্য পা-চাটা কুত্তারা নড়েচড়ে বসে। রঘুনাথ যখন শ্যামত্বলালের কথায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়েছেন তখন তাঁদেরও না দিলে চলে না। সব হাঁ-তে হাঁ মিলানোর দল। তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, 'সচমুচ করা উচিত ছিল।'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'বহোত চিন্তাকি বাত।'

'হাঁ হাঁ—'

অস্বস্তির মধ্যে খানিকটা সময় চুপচাপ কাটে। তারপর বদ্রী-বিশাল চৌবে বলে ওঠেন, 'প্রতিভা সহায় কারখান্না কারখান্না চালাচ্ছিল, তাই নিয়ে থাকলেই তো পারত। এই চুনাওর ভেতর কেন যে আওরতটা নাক ঢোকাল—'

শ্যামত্বলাল নাকের ভেতর শব্দ করে বলেন, 'ক্লাস ইণ্টারেস্ট চৌবেজী, স্রিফ ক্লাস ইণ্টারেস্ট—'

'সুখন চামার, আবু মালেক আর নেকীরাম শর্মা—এদের ইণ্টারেস্টটা কীসের?'

'এ তো জলের মতো সোজা ব্যাপার। জাতওয়ারি ইণ্টারেস্ট। পলিটিক্যাল পাওয়ার হাতে থাকলে জোর কত বাড়ে, ভেবে দেখেছেন?'

রঘুনাথ সিংকে এবার চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। তিনি বলেন, 'আপনাদের কী মনে হয়, চুনাওতে আমি হেরে যাব?'

নির্বাচনের নানা দিক নিয়ে চুলচেরা হিসাব করলেও রঘুনাথ সিংয়ের হারের কথা বদ্রীবিশাল চৌবেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। গিদ্ধড়ের মতো ঝাঁক বেঁধে তাঁরা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নেহী নেহী, কভী নেহী।'

'এই পয়লা চুনাওতে নামলাম। হেরে গেলে কাউকে আর

মুখ দেখাতে পারব না। এটা আমার ইজ্জৎকা সওয়াল।'

'আপনার বেইজ্জতি পুরা গারুদিয়া তার বিজুরি তালুকের হর আদমীকা বেইজ্জতি। আমাদের গায়ে এক বুঁদ খুন থাকতে আমরা তা হতে দেব না।' বলে একটু থামেন সবাই। পরমুহূর্তে দম নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করেন, 'আপনি যদি হারেন সূরয পছিমা আকাশে উঠবে।'

সর্বক্ষণের সঙ্গী এতগুলো মানুষের জোরালো মৌখিক মদতে রঘুনাথ সিংয়ের দুর্ভাবনা কিছুটা কাটে। তিনি বলেন, 'বিশ ত্রিশ পুরুষ ধরে আমরা গারুদিয়ায় পড়ে আছি। কোনদিন গাঁও ছেড়ে কোথাও যাই নি। আমি হলাম আসল মিট্টিকা সন্তান। ভোট চাইবার হক একমাত্র আমারই আছে।'

'আলবত। আজীবচাঁদ মুনশী যে কথাটা বলে সেটা হাজার বার ঠিক। আপনি চুনাওতে জিতলে গারুদিয়া-বিজুরিতে রামরাজ নেমে আসবে। এখানকার মানুষ বেঁচে যাবে।'

এ সব শুনে রঘুনাথ সিং গলার ভেতর এমন এক ধরনের শব্দ করেন যা শুনে আন্দাজ করা যায়, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

চুপচাপ খানিকটা সময় কাটে। তারপর বদ্রীবিশাল চৌবে গলা ঝেড়ে একটু কেশে নেন। এক সময় শুরু করেন, 'তবে একটা কথা রঘুনাথজী।'

চৌবের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রঘুনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা?'

'আপনার জেতার ব্যাপারে পুরা নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।'

'এ ব্যাপারে আপনার সন্দেহ আছে নাকি?'

হিক্কা তোলার মতো শব্দ করে চৌবেজী চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নেহী নেহী। তবে কিনা সাবধানের মার নেই।'

রঘুনাথের কপালটা মসৃণ হয়ে গিয়েছি। আবার সেখানে ভাঁজ পড়ে। স্থির চোখে বদ্রীবিশালকে দেখতে দেখতে বলেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বলছিলাম ভোটগুলো পাঁচ ভাগ হয়ে গেলে অসুবিধা হলেও হতে পারে।'

'ভাগাভাগি রুখবেন কী করে? আপনারাই একটু আগে বললেন, যারা চুনাওতে নেমেছে তারা সবাই ভাল ভোট টানবে।'

বদ্রীবিশাল বলেন, 'ও তো ঠিক আছে। লেকেন এই পাঁচ

ক্যাণ্ডিডেটের মধ্যে দু একজন যদি না দাঁড়ায়, অত ভাগাভাগি হবে না।'

রঘুনাথ সিংয়ের মতো প্রখর বুদ্ধিমান লোকেরও কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'সরে দাঁড়াবার জন্যে ওরা চুনাওতে নেমেছে নাকি ?'

'সহজে কি কেউ সরে। তবে তার রাস্তা আছে।'

'আপনি কি ওদের গুম করে দেবার কথা ভেবেছেন নাকি ? লেকেন চৌবেজী আমার বাপ-নানার আমলের সেই পুরানা জমানা আর নেই। কান্ট্রিতে গণতন্ত্র চালু হয়েছে। চুনাওর ক্যাণ্ডিডেটের গায়ে হাত লাগালে কী হবে ভাবতে পারেন ?'

দুই কান ধরে জিভ কাটতে কাটতে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করেন বদ্রীবিশাল চৌবে; যেন মারাত্মক পাপের কথা শুনেছেন। সেই অবস্থাতেই বলেন, 'ছিয়া ছিয়া ছিয়া, কী যে বলেন রঘুনাথজী! আমার কি নরকের ভয় নেই ? গুম করা ছাড়া কাউকে কি সরানো যায় না ?'

'কীভাবে ?'

বদ্রীবিশাল বাঁ চোখ কুঁচকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করেন।

রঘুনাথ সিংকে তেমন উৎসাহিত হতে দেখা যায় না। নিরুৎসুক মুখে তিনি বলেন, 'পয়সা দিয়ে কি সবাইকে কেনা যায় ? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী ?'

'সুখন চামারটা বড় ঠেঁটা; রুপাইয়া-পাইসা দিয়ে তার গর্দান নোয়ানো যাবে না। জান গেলেও চুনাওর লড়াই থেকে সে হটবে না। প্রতিভা সহায়কে কেনার কথাই ওঠে না; ওরা হল ক্রোড়পতি। বাকী রইল নেকীরাম শর্মা আর আবু মালেক। নেকীরাম সুদখোর, পয়সার লালচ ওর আছে তবে আবু মালেকের পিঠের হাড্ডি শক্ত, ওকে বাঁকানোও সোজা হবে না।'

রঘুনাথ সিং যেভাবে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন তাতে কোথাও ফাঁক নেই। তাঁর পা-চাটা কুত্তাদের খুবই চিন্তিত দেখায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর রঘুনাথ সিংহ ফের বলে ওঠেন,

'বড়া মুসিবত—'

আচমকা ভকীল গিরিধরলালজী রঘুনাথ সিংকে বলে ওঠেন, 'যদি হুকুম দেন তো একটা কথা বলি।'

'জরুর আপনি বলবেন। এক কথা কেন, শও কথা বলুন।'

'সব দিক পুরা ভেবে দেখলাম. সুখন চামার আউর প্রতিভা সহায়কে হটানো যাবে না। তবে আবু মালেক আউর নেকীরাম শর্মাকে সরানোর একটা ফিকির হতে পারে।'

'কী ফিকির?'

'পয়সা রুপাইয়া হয়ত লাগবে। সাথ সাথ একটা কথাও ওদের জানাতে হবে।'

'কী কথা?'

'নেকীরামকে বলতে হবে, ব্রাহ্মণদের পুরা ইন্টারেস্ট আপনি দেখবেন। আবু মালেককে বলতে হবে. মুসলমান মাইনো—রিটির স্বার্থ আপনি ছাড়া এখানে অন্য কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

রঘুনাথ সিং চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর তারিফের গলায় বলেন. 'আচ্ছা বাত। এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি। মগর—'

'মগর কী?'

'বামহন আর মাইনোরিটির স্বার্থের কথা বলে ওদের না হয় হটানো গেল। তাতে ফায়দা ওঠানো যাবে কি?'

'যাবে রঘুনাথজী।'

'ক্যায়সে? ওরা চুনাওকা লড়াই থেকে সরে গেলে ওদের ভোটগুলো আমি যে পাব তার গিরান্টি (গ্যারান্টি) আছে?'

'তা নেই।'

'তব্?'

'যাতে নেকীরাম আর আবু মালেকের ভোটাররা হাতীমার্কায় মোহর মারে তার ব্যওস্থা করতে হবে।'

'ক্যায়সে?'

'নেকীরাম আর আবু মালেককে আপনার সাপোর্টে ক্যাম্পেনে নামাতে হবে। বামহন আর মুসলিম মাইনোরিটিদের ওরা বোঝাবে, আপনাকে ভোট দিলে তাদের ইন্টারেস্ট পুরা রক্ষা করা হবে। নেকীরাম আর আবু মালেক চুনাওতে জিতলে তাদের যতটা ভালাই

হবে, আপনি জিতলে ডবল ভালাই হবে।'

রঘুনাথ সিং নড়েচড়ে বসেন। মুখচোখ দেখে মনে হয়, তিনি খুশী হয়েছেন। নেকীরামেরা তাঁর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামলে ব্রাহ্মণ আর মুসলমানদের ভোট যে প্রচুর পাবেন এবং ফলত চুনাওতে তাঁর জয় যে অবধারিত সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রঘুনাথ বলেন, 'তা হলে নেকীরাম আর আবু মালেকের কাছে আমাদের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠাতে হয়।'

বদ্রীবিশাল চৌবে বলেন, 'তা তো পাঠাতেই হবে।'

'কাকে পাঠানো যায় ?'

বিশাল কমপাউণ্ডের একধারে তেরপল খাটিয়ে যে অস্থায়ী নির্বাচনী ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেখানে শিরদাঁড়া টান টান করে বসে এতক্ষণ রঘুনাথ সিংদের কথা শুনে যাচ্ছিল ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ। এবার সে বলে ওঠে, 'হুজৌর, হুকুম হো যায় তো হামনি চলা যায়েগা।'

ঘণ্টাখানেক গভীর পরামর্শের পর স্থির হয়, ঠিকাদার অযোধ্যা-প্রসাদ এবং বদ্রীবিশাল গোপনে রাতের অন্ধকারে নেকীরামের কাছে যাবেন; গিরধরলালজী এবং শ্যামতুলাল যাবেন আবু মালেকের কাছে।

চব্বিশ

আজ তুপুরে কালোয়া খাওয়ার পর ধর্মারা আবার হাল-বয়েল নিয়ে জমিতে নেমে পড়েছে। ধান রোয়ার আগে পর্যন্ত এখন তাদের একই ধরনের কাজ। অনবরত লাঙলের শীষ চালিয়ে চালিয়ে পাথরের মতো শক্ত জমাট মাটি আবাদের যোগ্য করে তোলা।

আজ দক্ষিণ দিকের জমি চষছে ধর্মা। তার ঠিক পরের জমিটা থেকেই মরসুমী ওরাঁও আর মুণ্ডা কিষাণরা লাঙল ঠেলছে। সুবিশাল আকাশের নীচে পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে যতদূর চোখ যায়, রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিগুলোর নানা দিক থেকে নানা গলায় ক্রমাগত আওয়াজ শোনা যায়, 'উর্‌রা উর্‌রা—চল্‌ বেটা, চল্‌।' ভূমিদাস আর

ওরাঁও মুণ্ডারা আলটাকরা এবং জিভ দিয়ে শব্দ করে করে বয়েল চালাচ্ছে।

কোয়েলের মরা খাতের ওধারে অর্থাৎ উত্তর দিকটাতেও সেই একই ছবি। অন্য দিনের মতো ওখানেও মিশিরলালজীর ক্ষেতিগুলোতে ভট ভট করে ট্রাক্টর চলছে।

ক'দিন আগে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরা টুকরা পছিমা মেঘ দেখা দিয়েছিল। এখন আকাশে সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার ওপর থেকে জেঠ মাহিনার গনগনে রোদ নেমে আসছে শুধু। আর মাঠের ওপর দিয়ে ঝলকানো লু-বাতাস উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

অর্থাৎ হাইওয়ের এধারের এবং ওধারের জমিগুলোতে সেই চৈত্র মাস থেকে বারিষ না পড়া পর্যন্ত রোজ এই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। এই স্থির চিত্রের কোন পরিবর্তন নেই।

রোজকার মতো আজও ধর্মার পিছু পিছু দৌড়চ্ছে কুশী আর সমানে মাটি থেকে কোদা বেছে যাচ্ছে। আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। খানিকটা উত্তেজিতভাবেই নীচু গলায় ডাকে, 'ধম্মা— এ ধম্মা—'

ধর্মা লাঙলের মাথাটা শক্ত মুঠে চেপে ধরে তেজী পাটনাই বয়েল দুটোকে থামিয়ে ঘাড় ফেরায়। শুধোয়, 'কা ?'

'দেখ দেখ—হুই—' বলে তাদের পাশের জমিটার দিকে আঙুল বাড়ায় কুশী।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে নিয়ে ধর্মা ডাইনে তাকায়। ফুর পাণ্ট (ফুল প্যাণ্ট), দামী জামা, দামী জুতো পরা দুটো লোক পাশের জমির আধবুড়ো কিষাণটার সঙ্গে কথা বলছে। কিষাণটাকে ধর্মা চেনে ; চাহাঢ়ের হাটিয়ায় তাকে প্রথম দেখেছে। তারপর এখানে রোজ কত বার দেখছে তার হিসেব নেই। যে সব মরসুমী আদিবাসী কিষাণ এবার রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে কাজ করতে এসেছে তাদের ভেতর বেশির ভাগই মুণ্ডা। আধবুড়ো লোকটা মুণ্ডা কিষাণদের মাতব্বর।

ফুর প্যাণ্ট পরা লোকদুটোর মুখও বেশ চেনা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে যায়, রামলছমনদের সঙ্গে চাহাঢ়ের হাটিয়ায় মুরসুমী কিষাণ আনতে গিয়ে এই লোক দুটোকেও দেখেছিল। ওরা গুজ গুজ করে আদিবাসীদের সঙ্গে কী সব কথা বলছিল যেন।

তারপর ধর্মারা যখন ওরাঁও মুণ্ডাদের নিয়ে হাইওয়ে ধরে গারুদিয়া ফিরে আসছিল তখন লোকছুটো দৌড়ে এসে আদিবাসীরা কোথায় ক্ষেতির কাজে যাচ্ছে, কোথায় থাকবে ইত্যাদি খবর জেনে নিয়েছিল। ওরা যে একদিন মরসুমী কিষাণদের খোঁজে এখানে হানা দেবে, তখনই তা টের পাওয়া গেছে।

মাতব্বর মুণ্ডাটার সঙ্গে লোকছুটো যে সব কথা বলছে তার পুরোটা শোনা যাচ্ছে না। টুকরা টুকরা যা কানে আসছে তা থেকে বোঝা যায় তারা আদিবাসীদের রেলের ডিব্বায় চড়িয়ে আগরতলা বা আসাম ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। সেখানে গেলে সালভর কাম মিলবে, ভরপেট খাওয়া জুটবে, বহোত পাইসা রুপাইয়া মিলবে।

এ সব ধর্মার অজানা নয়। চাহাঢ়ের হাটিয়ায় এরকম বলেই আড়কাঠি ছুটো ওরাঁও মুণ্ডাদের ফুসলাতে চেয়েছিল।

আধবুড়ো মাতব্বরটা বলে, 'সোচনা হোগা—'

আড়কাঠি ছুটো একই সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, সোচ-বিচার তো জরুর করতে হবে। মগর যা করার তুরন্ত করে ফেলবি। সমঝা?'

মাতব্বর মাথা নাড়ে।

আড়কাঠি ছুটো ফের বলে, 'আগরতলা আসামে গেলে তোদের ভালাই হবে। ভুখে কষ্ট পাবি না, অভাব-দুখ থাকবে না—' আধা নাঙ্গা আধবুড়ো আদিবাসীটার চোখের সামনে তারা গাঢ় রঙে স্বপ্নের ছবি আঁকতে থাকে।

মাতব্বর কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা উত্তরের ক্ষেতিগুলোর দিক থেকে গরম বাতাস চিরে চিরে অত্যন্ত পরিচিত একটা কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'চলে বনবাস, রামসীয়া জানকীয়া—'

অর্থাৎ বগুলা ভকত রামলছমন ক্ষেতির কাজের তদারকিতে বেরিয়েছে। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত একবার তাকে দেখে নেয় ধর্মা। তারপর বয়েল ছুটোর লেজে মোচড় দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'উর্‌রা হট্—হট্—' লাঙলের ধারাল শীষ আবার মাটি চিরতে চিরতে এগিয়ে যায়।

ওদিকে পাশের জমিতে আড়কাঠি ছুটোও আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। রামলছমন যে ক্ষেতিমালিকের আপনা আদমী, চাহাঢ়ের

হাটিয়াতেই সেটা তারা টের পেয়ে গিয়েছিল। মালিকের জমিতে এসে তাঁরই কিষাণদের কেউ লোভ দেখিয়ে ফুসলে নিয়ে যেতে চাইছে, এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষা নেই। মালিকের লোকেরা তাদের ছাল ছাড়িয়ে লাশ মাটিতে পুঁতে দেবে।

লাঙল ঠেলতে ঠেলতে ধর্মা ভাবে, আসাম বা আগরতলা কোথায়, কতদূরে? উত্তরে তালুক মনপথল, পশ্চিমে বিজুরির রেল টিসন, পুবে হাঁথিয়াগঞ্জ, দক্ষিণে নওশেরাগঞ্জ—এই হল তার পরিচিত পৃথিবীর সীমা। এর বাইরে কোথায় কতদূরে আসাম আর কোথায়ই বা আগরতলা, তার জানা নেই। আনপড় ধর্মা তার সবটুকু কল্পনাশক্তি দিয়েও সেই দূরত্বটা মাপতে পারে না।

সন্ধ্যের আগে আগে সূর্যটা দিগন্তের তলায় যখন নেমে যাচ্ছে সেই সময় ক্ষেতি থেকে হাল-বয়েল তুলে জনমদাসেরা আর ওরাঁও মুণ্ডা কিষাণেরা হাইওয়েতে এসে ওঠে। তারপর লাল ধুলো ওড়াতে ওড়াতে কাতার দিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

চলতে চলতে আচমকা চোখে পড়ে, হাইওয়ের ধার ঘেঁষে নাবাল পড়তি জমিতে যেখানে আদিবাসীরা কিছুদিন ধরে আস্তানা গেঁড়েছে, সেখানে তুপুরের আড়কাঠিতুটো ঘোরাঘুরি করছে। এই ওরাঁও মুণ্ডা সাঁওতালেরা এসেছে পুব দিক থেকে। ওদিকে খরায় মাঠঘাট জ্বলে যাওয়ায় খাদ্যের খোঁজে এধারে চলে এসেছে ওরা।

আড়কাঠি তুটোর কী মতলব? মরসুমী কিষাণদের মতো এই আদিবাসীদেরও ওরা আসাম বা আগরতলা নিয়ে যাবার ধান্দা করছে নাকি?

আচমকা ধর্মার মনে হয়, ঐ ফুর প্যাণ্টপরা লোকতুটোকে ধরে আসামে চলে গেলে কেমন হয়? ওরা তো আদিবাসীদের ভরসা দিয়েছেই—ভরপেট খানা মিলবে, রুপাইয়া-পাইসা মিলবে, সালভর কাম মিলবে। ওরাঁও-মুণ্ডাদের যদি নিয়ে যায়, কুশী এবং তাদেরও কি নিয়ে যাবে না? নিশ্চয়ই নেবে। রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে জনমভর লাঙল ঠেলার হাত থেকে তা হলে রেহাই পাওয়া যাবে। অতদূরের আসাম বা আগরতলায় পহেলবান পাঠিয়ে নিশ্চয়ই বড়ে সরকার তাদের ধরে আনতে পারবেন না। গণেরি চাচার সঙ্গে এই

নিয়ে একটু পরামর্শ করে দেখতে হবে।

উজ্জ্বল স্বাধীন জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আদিবাসী-দের এলাকাটা পেরিয়ে যায় ধর্মারা।

আরো কিছুক্ষণ পর ওরা যখন হাইওয়ে থেকে নেমে খামার-বাড়ির দিকের কাচ্চীতে নামতে যাবে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার ওধার থেকে অগুনতি মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধর্মারা। ঘাড় ফেরাতেই নজরে পড়ে, দু-আড়াই শো লোক ধুলো উড়িয়ে তাদের দিকেই দৌড়ে আসছে।

কাছাকাছি আসতেই বোঝা যায়, ওরা দোসাদটোলার দুবলা কমজোরি বুড়াবুড়ীর দল। অর্থাৎ রঘুনাথ সিং যাদের ক্ষেতির কাজ থেকে বাতিল করে দিয়েছেন সেই সব লোক। তাদের সঙ্গে রয়েছে উত্তর দিক থেকে আসা জনকতক ওরাঁও-মুণ্ডা। রোজ সকালে উঠে এরা খাদ্যের খোঁজে দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে সেই জঙ্গলে চলে যায়।

লোকগুলো সমানে চেঁচাচ্ছিল। দোসাদটোলার মাতব্বর গণেরি তাদের সামনে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলে, 'কা হুয়া? কা হুয়া? এত্তে চিল্লাতা কায়?'

একসঙ্গে সবাই গলার শির ছিঁড়ে চেঁচানোর কারণ জানাতে চায়। ফলে কিছুই বোঝা যায় না।

এবার ধমক ধামক দিয়ে সবাইকে থামায় গণেরি। বলে, 'চুপ হো যা। বিলকুল চুপ'। সিরিফ একজন বল্—'

বুড়ো বজরঙ্গী বুক চাপড়ে বলে, 'মর গিয়া রে গণেরি, পুরা মর গিয়া—'

সঙ্গে সঙ্গে বাকী সবাই ফের ডুকরে ওঠে, 'মর যায়গা, হামনি-লোগন মর যায়েগা—'

হাত তুলে আবার তাদের থামিয়ে গণেরি বলে, 'একসাথ নায়, একসাথ নায়। সিরিফ এক আদমী—'

বজরঙ্গী ভয় উত্তেজনা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি মিলিয়ে দম-আটকানো গলায় এবার যা বলে যায় তা এইরকম। রোজকার মতো আজও তারা কোয়েলের মরা খাতটার ওপর দিয়ে মহুয়ার গোটা আনতে জঙ্গলে গিয়েছিল। গিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে যায়। কাল সন্ধ্যেবেলায় ওরা যখন জঙ্গল থেকে ফেরে তখনও অগুনতি গাছে

মহুয়ার ফল ছিল। আজ গিয়ে ছাখে, তারা পৌঁছুবার আগেই সেই সব গাছের আধাআধি সাফ করে কারা ফল নিয়ে চলে গেছে।

মালিক রঘুনাথ সিং ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও কিছুদিন ধরেই বজরঙ্গী-দের সন্দেহ হচ্ছিল, আগের সন্ধ্যেয় তারা যত ফল দেখে আসে পরের দিন তার চাইতে কম কম লাগে। এ ক'দিন তাদের মনে হয়েছে, হয়ত চোখের ভুল। কিন্তু আজ বজরঙ্গীরা নিশ্চিত, ভোরবেলা তারা জঙ্গলে যাবার আগে কিংবা সন্ধ্যেবেলা ওখান থেকে ফেরার পর রাত্তিরে কেউ না কেউ লুকিয়ে মহুয়ার ফল পেড়ে নিয়ে যায়। এভাবে নিয়ে গেলে গরমের এই সময়টা সবাইকে ভুখা মরে যেতে হবে।

সব শুনে গণেরি গম্ভীর হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, 'বহেতি চিন্তাকা বাত।' একটু ভেবে ফের বলে, 'তোমরা এখানে বসো। আমরা হাল-বয়েল জমা করে আসছি।'

কাঁচা সড়কের ধারে কাঁকুরে ডাঙায় বজরঙ্গীরা বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর খামার থেকে দোসাদটোলার জনমদাসদের নিয়ে ফিরে আসে গণেরি। ওরাঁও-মুণ্ডা কিষাণরা অবশ্য আসে না; খামারের পেছন দিকে নিজেদের আস্তানায় চলে যায়।

গণেরিকে দেখে ভিড়ের ভেতর থেকে বুড়ো বজরঙ্গী. নাথুর বাপ চৌপটলাল, বুধেরির চাচা জগন—এমনি অনেকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে।

'অব কা করে গণেরি?'

'কা হোগা হামনিলোগনকা?'

'বড়ে সরকারকা পাশ যায়েগা—কা?'

দু হাত নেড়ে সবাইকে থামাতে থামাতে গণেরি বলে, 'বড়ে সরকারের কাছে এখন যাওয়া ঠিক হবে না।'

সবাই শুধোয়, 'কখন যাবি?'

গণেরি মাথাঠাণ্ডা পাকা লোক। সে যা বলে. তা এইরকম। আগে দেখতে হবে কারা মৌয়ার ফল চুরাচ্ছে। চোরদের ধরে সিধা বড়ে সরকারের মকানে নিয়ে যেতে হবে।

'তা হলে তো পেহ্‌রা (পাহারা) বসাতে হয়।'

'তাই হবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর গণেরিই আবার শুরু করে, 'আমার কী

মনে হয় জানো?'

'সবাই জানতে চায়, 'কা?'

'স্মবে কেউ মৌয়া চুরাতে আসে না।'

'কখন আসে?'

'তোরা জঙ্গল থেকে ফেরার পর। রাতমে—'

'তব্ তো রাতভরি পেহ্‌রাদারি করতে হয়।'

গণেরি বলে, 'হুঁ। এখন ঘরে চল। আন্ধেরা নামলে তুরন্ত রাতকা খানা চুকিয়ে সবাই জঙ্গলে যাব। এক রাত পেহ্‌রা দিলেই মালুম হয়ে যাবে, কারা চুরাতে আসে—' ওরাঁও-মুণ্ডাদের বলে, 'তোরাও যাবি।'

এই ব্যবস্থাই সবার মনে ধরে। গণেরির পিছু পিছু একদল চলে যায় দোসাদটোলায়; আর ওরাঁও-মুণ্ডারা হাইওয়ের দিকে।

পঁচিশ

এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ের সেই জঙ্গলে দোসাদটোলার বাসিন্দারা আর কিছু ওরাঁও-মুণ্ডা অগুনতি মহুয়া, পরাস, সীমার গাছ এবং নানা ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছে। কেউ লালটীন বা অন্য কোনরকম আলো টালো আনে নি। দূর থেকে রোশনি দেখলে চোরেরা সাবধান হয়ে যাবে, এদিকে আর ঘেঁষবে না। গণেরির ইচ্ছা চোরেদের একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তার ধারণা, এটা নির্ঘাত সেই গাই-বকরি চরানিদের কাজ। রঘুনাথ সিংয়ের হুঁশিয়ারিতে ওরা দিনের বেলা আসে না; রাতে লুকিয়ে-চুরিয়ে মহুয়া গাছ ফাঁকা করে দিয়ে যায়।

আজ কী তিথি, জনমদাস বা ভূমিহীন ওরাঁও-মুণ্ডারা তার খবর রাখে না। জেঠ মাহিনার ঝকঝকে নীলকাশে ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদের একটা টুকরো দেখা যায়। মহুয়া পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা আবছা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে নীচে। চারপাশের ঝোপেঝাড়ে লক্ষ কোটি জোনাকি উড়ছে, জ্বলছে এবং নিভছে। তাদের গায়ের সবুজ আলো ছুঁচের মতো অন্ধকারের গায়ে ফোঁড় তুলে চলেছে যেন। ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গুলে পোকা আর মশা অনবরত গণেরিদের চামড়ায় হুল

ফুটিয়ে বিষ ঢালতে থাকে।

নাথুর চাচা রামখিলাওন অন্ধকারে এলোপাথাড়ি চাপড় মেরে মশার ঝাঁক নিপাত করতে করতে বলে, 'কা রে গণেরিয়া, তোর মতলবটা কী?'

গণেরি বলে, 'কীসের মতলব?'

'মচ্ছড়দের দিয়ে আমাদের খাওয়াবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছিল?'

'আরেকটু সবুর কর।'

'সেই সাম থেকেই তো সবুর করে আছি। কাঁহাতক আর থাকা যায়? নিদে আঁখ ভেঙে আসছে।'

'পেটের ভুখ বড়, না আঁখের নিদ বড়?' গণেরি চাপা গলায় প্রায় ধমকেই ওঠে।

রামখিলাওন এরপর আর গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে না; একেবারে চুপ মেরে যায়।

তবে বুড়ো বজরঙ্গী শুধোয়, 'তোর কি মনে হয়, শয়তানের ছৌয়াগুলো জঙ্গলে আসবে?'

গণেরি গলার স্বরে জোর দিয়ে বলে, 'জরুর আসবে। আজ নায় আয়েগা তো কাল আয়েগা। কাল নায় তো পরশু, পরশু নায় তো নরশু।'

এবার অনেকেই গলা মেলায়। সমস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'রোজ রোজ আন্ধারাতে এসে আমরা এই জঙ্গলে পেহ্‌রাদারি করব?'

গণেরি বলে, 'হঁ; সিরিফ পেটকা লিয়ে। ভুখা যদি মরতে না চাও, আসতেই হবে।'

সবাই আবার কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা চোখে পড়ল, দূরে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ওপর দিয়ে ক'টা মশাল ফ্যাকাশে অন্ধকারে জ্বলতে জ্বলতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। বাদামী বালির দানাগুলো মশালের রোশনিতে চিকচিক করতে থাকে।

গণেরি হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তীব্র চাপা গলায় সে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়, 'বিলকুল চুপ রহো।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে সবাই টান হয়ে বসে। উত্তেজনায় তাদের বুকে শ্বাস আটকে আসে যেন; চোখে পাতা পড়ে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মশালগুলো জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে

কাছাকাছি আসার জন্য চোখে পড়ে, মোট তিরিশ চল্লিশটা হট্টাকট্টা চেহারার তাগড়া আদমী; তাদের হাতে পাকানো বাঁশের লাঠি আর চটের বোরা। বোঝা যায়, ওরা মহুয়ার গোটা পেড়ে বোরা বোঝাই করে নিয়ে যাবে।

লোকগুলো অচেনা নয়। এ অঞ্চলের ছোট বড় যত জমিমালিক আর পয়সাওলা মানুষ আছে, ওরা তাদের গাই-বকরি চরায়। এমন কি এদের মধ্যে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের গাই-ভয়েস চরানিরাও রয়েছে।

লোকগুলো এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না। জ্বলন্ত মশালের নীচের দিকগুলো মাটিতে পুঁতে যেই তারা মহুয়াগাছে চড়তে যাবে সেইসময় আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে গণেরি। তার দেখাদেখি কয়েক শো অচ্ছুৎ জনমদাস এবং আদিবাসী ওরাঁও মুণ্ডা।

গণেরি গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'নায় নায়, কভী নায়।'

গাই-বকরি চরানিরা থমকে যায়। এই মাঝরাতে এত লোক জঙ্গলে বসে আছে, তারা ভাবতেও পারে নি।

গণেরি আগের মতোই আবার চেঁচায়, 'মৌয়া কিছুতেই নিতে দেব না।'

তার সঙ্গীরাও তার সঙ্গে গলা মেলায়, 'কিছুতেই না। কভী নায়—'

গাই-বকরি চরানিরা প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরে সামলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে হুমকে ওঠে, 'হট যা, হট যা ভুচ্চরের দল।'

গণেরি বলে, 'নায় হটেগা। মৌয়া হামনিলোগনকা—'

আর সবাই চেঁচায়, 'হামনিলোগনকা।'

'তুহরকা বাপকা। হট যা কুত্তেকা ছৌয়ারা—' মারমুখি গাই-বকরি চরানিরা তেড়ে আসে।

গণেরিও রুখে দাঁড়ায়, 'তুলোগন হট যা। বড়ে সরকার এই মৌয়া আমাদের দিয়েছেন।'

'তোদের বাপেদের দিয়েছেন রেণ্ডিকা ছৌয়ারা। ভাগ কুত্তা, ভাগ—' বলেই একটা গাই-বকরি চরানি লোহার গুল-বসানো মোটা লাঠি সিধা গণেরির মাথায় বসিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে তার কপাল দু ফাঁক হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

চিৎকার করে গণেরি ঘুরে পড়ে যায়।

জনমদাসেরা পুরুষানুক্রমে বেগার দিয়ে দিয়ে জনমভীতু হয়ে আছে। কয়েক পা পিছিয়ে ভয়ার্ত গলায় তারা ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে, 'গণেরি চাচাকো খতম কর দিয়া রে।'

আদিবাসী-ওরাঁও-মুণ্ডারা কিন্তু পিছু হটে না; একই জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ছু-একজন দৌড়ে গিয়ে গণেরিকে তুলে একধারে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তারই ঠেটি কাপড়ের খুঁট ছিড়ে রক্তাক্ত কপালে ফেট্টি বাঁধতে থাকে।

গণেরির মাথা ফাটাবার মতো প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে একমুহূর্তও আর দাঁড়ায় না গাই-বকরি চরানিরা; ফের মহুয়াগাছে চড়ার জন্য এগিয়ে যায়।

গণেরি পুরোপুরি বেহুঁশ হয় নি। নির্জীব ছুর্বল গলায় সে তাদের বলে, 'নায়, নায়—মৌয়া হামনিলোগনকা—'

তার কথার প্রতিধ্বনি করেই ভূমিহীন স্বাধীন আদিবাসীরা গর্জে ওঠে, 'রুখ যা, রুখ যা—'

বাপ-মা এবং চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিতে দিতে গাই-বকরি চরানিরা এবার ওরাঁও-মুণ্ডাদের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু ডর বস্তুটা তাদের সিনায় নেই। ওদের বেশির ভাগেরই কাঁধে রয়েছে টাঙ্গি বা তীর ধনুক। সেগুলো বাগিয়ে তারা রুখে দাঁড়ায়।

জমিমালিকের লোকেদের লাঠি এলোপাথাড়ি পড়তে থাকে আদিবাসীদের ওপর। ওরাঁও-মুণ্ডাদের টাঙ্গির ধারাল ফলাগুলো মশালের আলোয় ঝিলিক মারতে থাকে। বাঁশের ধনুক থেকে ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুটে যায়। ছু পক্ষের দশ বারোটা লোক ধপাধপ মাটিতে পড়ে যায়। তাদের কারো মাথা কি কপাল চৌচির, কারো সিনা এফোঁড় ওফোঁড় করে তীরের ফলা বেরিয়ে গেছে। রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। চারদিকে গোঙানি, লাঠি এবং তীর ছোটার সাঁই সাঁই আওয়াজ। দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে নিঝুম মহুয়ার জঙ্গল জষ্ঠি মাসের মধ্যরাতে পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে উঠতে থাকে।

ডরপোক জনমদাসেরা জঙ্গলের ভেতর অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ভীত গলায় অনবরত চিৎকার করতে থাকে। কয়েক শো বছর ধরে পরের জমিতে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে তাদের ওপর নির্বীর্য, ভীরু ক্রীতদাসের আত্মা যেন ভর করে আছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য

তারা অস্ত্র ধরতে শেখে নি। কোনরকম যুদ্ধের পদ্ধতিই তারা জানে না।

কতক্ষণ মহুয়া জঙ্গলের এই মহাযুদ্ধ চলেছিল, কারো হুঁশ নেই। আচমকা দেখা যায়, দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ধু-ধু বালির ওপর দিয়ে একটা তেজী ঘোড়া দৌড়ে আসছে। তাদের পেছনে অগুনতি মানুষ। লোকগুলোর হাতের উঁচু লাঠিতে হ্যাজাক বাঁধা, কারো কারো হাতে মশাল।

ঘোলাটে চাঁদের আলো আর হ্যাজাক ইত্যাদির রোশনিতে ঘোড়-সওয়ারকে চেনা যায়—বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। তার এক হাতে লাগাম, আরেক হাতে বন্দুক। মাঝে মাঝে বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে তিনি ফাঁকা আওয়াজ করছেন। পেছনের লোকগুলোকেও চিনতে অসুবিধা হয় না; ওরা তাঁর পোষা পহেলবানের দল। আর আছে তাঁর চুনাওকা এজেণ্ট ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ। লোকগুলো সমানে চিৎকার করে হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছে, 'রুখ যা, রুখ যা। না রুখলে গোলি চলবে—'

রঘুনাথ সিং কীভাবে মহুয়া জঙ্গলের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের খবর পেয়েছেন, তিনিই জানেন। হয়ত হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে গারুদিয়া তালুকের কোন লোক হৈচৈ চেঁচামেচি শুনে তাঁকে জানিয়েছে।

কেশরওলা তেজী ঘোড়া, বন্দুক, পহেলবান এবং স্বয়ং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংকে দেখে লড়াই থেমে যায়। দু পক্ষের যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঘোড়া থেকে বন্দুকসুদ্ধ লাফ দিয়ে নেমে পড়েন রঘুনাথ সিং। যারা প্রচণ্ড রকমের জখম এবং রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে ছিল তাদের দ্রুত এক পলক দেখে নেন তিনি। খুন-জখম-রক্তারক্তি এ সব তাঁর কাছে খুব একটা অচেনা বা অনভ্যস্ত ব্যাপার নয়। সব দেখা হয়ে গেলে মারাত্মক গম্ভীর স্বরে জানতে চান, 'কা হুয়া?'

কেউ গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে না।

রঘুনাথ সিং গর্জে ওঠেন, 'কী রে, চুপ কেন? বাত্‌া কী হয়েছে?'

দোসাদ ভূমিদাস থেকে ওরাঁও-মুণ্ডা পর্যন্ত সবাই চমকে ওঠে। তাদের সামনে যে রঘুনাথ সিং তিনি ভোট-মাঙোয়া স্নেহশীল মহানুভব রঘুনাথ সিং নন। যে সরকার-বড় মমতায় তাদের মতো অচ্ছুৎদের

ঘিয়ের উৎকৃষ্ট লাড্ডু নিজের হাতে বিলিয়ে ছিলেন তাঁকে এঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। এই রঘুনাথ সিং দোসাদদের চিরকালের চেনা— বন্দুকবাজ, হিংস্র, ভয়ঙ্কর।

গণেরি একধারে পড়ে ছিল। বুক টেনে টেনে সে রঘুনাথ সিংয়ের কাছে চলে আসে। বলে, 'হুজৌরকা হুকুম হো যায় তো হামনি বাতায়গা—'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'হাঁ, বল—'

গণেরি কাঁপা কমজোরি গলায় শুরু করে, 'বড়ে সরকার, ইয়ে হামনিলোগনকা পেটকা সওয়াল—'

বিরক্ত মুখে রঘুনাথ ধমকে ওঠেন, 'বকবাস না করে আসল কথাটা বলে ফেল।'

গণেরি এবার যা বলে তা এইরকম। বড়ে সরকার স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন, এ বছর এই মারাত্মক খরার সময়টা যখন গাঁকে গাঁ জ্বলে যাচ্ছে, কোথাও একদানা খাদ্য নেই, তখন বড়ে সরকার গরীবের মা-বাপ, বহোত কিরপা করে তাদের মতো ভুখানাঙ্গাদের এই জঙ্গলের মহুয়ার গোটা নেবার ব্যবস্থা করেছেন। গাই-বকরি চরানিদের হুকুম দিয়েছেন, তারা যেন মহুয়ার জঙ্গল থেকে তফাতে থাকে। লেকেন তারা হুজৌরের হুকুমের পরোয়া না করে মাঝরাতে এসে মহুয়ার ফল নিয়ে যায়। তারপর কীভাবে আজ দোসাদ এবং আদিবাসীরা এখানে এসে পাহারা দিতে থাকে এবং কীভাবে গাই-বকরি চরানিদের সঙ্গে তাদের, বিশেষ করে ওরাঁও-মুণ্ডাদের লড়াই বাধে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে যায় গণেরি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন রঘুনাথ সিং। চোখের কোণ দিয়ে গাই-বকরি চরানিদের লক্ষ্য করেন। এদের ভেতর তাঁর নিজের লোকেরাও রয়েছে।

আসলে চতুর পরিকল্পনাটা ছিল তাঁরই। চুনাওর দিকে নজর রেখে, বিপুল মহানুভবতা দেখিয়ে রঘুনাথ বাতিল ভূমিদাস আর ওরাঁও-মুণ্ডাদের মহুয়ার ফল নেবার ব্যবস্থা করে দেন। সবার সামনে গাই-বকরি চরানিদের হুঁশিয়ারও করে দেন, তারা যেন এ বছর মহুয়ার জঙ্গলে না যায়। কিন্তু তলায় তলায় তাদের জানান, রাত্তিরে দোসাদরা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তারা গিয়ে যেন মহুয়া পেড়ে আনে। এই ধূর্ত চালে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। ভোটদাতা জনমদাসেরাও খুশী

থাকবে, আর নিজের এবং অন্য জমি-মালিকের গাই-বকরির জন্য মহুয়ার ফলও পাওয়া যাবে। এখন যা কিছু করণীয় সবই সুকৌশলে করা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ফন্দিটা শেষ পর্যন্ত খাটল না। হারামীর ছৌয়া দোসাদগুলো তাঁর চালটা হয়ত টের পায় নি, তবে মহুয়া যে কমে যাচ্ছে—সেটা ঠিকই ধরে ফেলেছে।

গণেরি ফের বলে, 'হুজৌর, এবার বলুন জানবর বাঁচবে, না মানুষ বাঁচবে?'

রঘুনাথ সিং পরম উদারতায় ঘোষণা করেন, 'মানুষ—' তাঁর হিসেব ঠিক আছে। চুনাওর আর বেশি দেরি নেই। ভালয় ভালয় নির্বাচনটা একবার হয়ে গেলে কী করতে হবে, তিনি ভাল করেই জানেন। বৃহৎ লাভের জন্য আপাতত সামান্য স্বার্থত্যাগ বুদ্ধিমান-মাত্রেই করে থাকেন। এই আপ্তবাক্য রঘুনাথ সিংয়ের আজানা নয়। গাই-বকরি চরানিদের দিকে ফিরে বলেন, 'কুত্তারা বচ্চেরা, এধারে আর কখনও আসবি না। যদি শুনি এসেছিস, কোয়েলের বালির তলায় তোদের লাশ পুঁতে দেব।'

রঘুনাথ সিংয়ের গোপন নির্দেশেই গাই-বকরি চরানিরা রাতে জঙ্গলে আসে। সুতরাং অকারণে এই গালাগাল যে তাদের প্রাপ্য নয়, এ কথা গলা দিয়ে বার করার হিম্মত কারো নেই। তারা সংয়ের পুতুলের মতো মাথা নেড়ে একই সঙ্গে বলে ওঠে, 'জী হুজৌর।'

রঘুনাথ সিং এবার তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক বাহিনী অর্থাৎ পহেলবানদের হুকুম দেন, 'জখমী লোকগুলোকে নিয়ে ভকিলগঞ্জের হাসপাতালে চলে যা

'জী হুজৌর—' পহেলবানেরা দু পক্ষের আহত রক্তাক্ত মানুষ-গুলোকে কাঁধের ওপর তুলতে থাকে। এমন কি আধবুড়ো গণেরিও এই মওকায় একজনের কাঁধে চড়ার দুর্লভ সুযোগ পায়।

রঘুনাথ চারপাশের দোসাদ আর আদিবাসীদের দেখতে দেখতে বলেন, 'যারা জখম হয়েছে তাদের বাপ-মা কি জরুরা কাল এসে মুনশী আজীবচাঁদের কাছ থেকে দশগো করে রুপাইয়া নিয়ে যাবি।'

রঘুনাথ সিংয়ের এও এক উৎকৃষ্ট চাল। মাত্র দশটা করে টাকা মাথাপিছু খরচ করে লোকগুলোকে যদি খুশী রাখা যায়, মন্দ কী। চুনাওর দিন এই চালটা যথেষ্ট কাজ দেবে।

ভুখানাঙ্গা লোকগুলো একেবারে কৃতার্থ হয়ে যায়। তারা অভিভূত

গলায় বলে, 'হুজৌর মা-বাপ—'

রঘুনাথ সিং আর দাঁড়ান না; রেকাবে পা ঢুকিয়ে লাফ দিয়ে ফের ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েন। গোড়ালি দিয়ে পেটে একটা গুঁতো মারতেই তেজী জানোয়ারটা দৌড়ুতে শুরু করে। ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার কোয়েলের বালির ওপর দিয়ে হাইওয়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এদিকে জখমী লোকগুলো পহেলবানদের কাঁধে চড়ে সাত মাইল তফাতে ভকিলগঞ্জের দিকে রওনা হয়। বাকী ওরাঁও-মুণ্ডা এবং দোসাদরা যে যার আস্তানায় ফিরতে থাকে।

এখন কত রাত, কে জানে। তবে ক্ষয়িত ঘোলাটে চাঁদ পছিমা আকাশের দিকে ঢলে পড়েছে।

ছাব্বিশ

গাই-বকরি চরানিদের সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনাটা এবং রঘুনাথ সিংয়ের অপার মহানুভবতা ক'টা দিন ভূমিদাস দোসাদদের যুগপৎ উত্তেজিত এবং আপ্লুত করে রাখে। এর মধ্যে ভকিলগঞ্জের হাসপাতাল থেকে গণেরি ফিরে এসেছে। প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় শরীর ভয়ানক কাহিল হয়ে গেছে। রঘুনাথ সিং এতই বিবেচক এবং দয়ালু যে স্বয়ং হিমগিরিকে খবর পাঠিয়ে গণেরিকে কাজ থেকে রেহাই করিয়ে দিয়েছেন। যতদিন না সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়, তাকে ক্ষেতিতে যেতে হবে না।

এটুকু ছাড়া দোসাদটোলার জীবন পুরনো নিয়মেই বয়ে চলেছে। তাদের দিন যেভাবেই কাটুক, চুনাওর তৌহার কিন্তু ক্রমাগত জমে উঠছে।

এর ভেতর পর পর দু'দিন সন্ধ্যেবেলা গারুদিয়া বাজারে হ্যাজাক জ্বালিয়ে নেকীরাম শর্মা এবং আবু মালেকের চুনাওর মীটিং হয়ে গেল। তাদের কথা শোনার জন্য লোকজনও ভালই হয়েছিল।

রোজকার মতো ক্ষেতির কাজ চুকিয়ে হাল-বয়েল রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে জমা দিয়ে ধর্মা আর কুশী চলে গেছে কোয়েলের মরা

খাতের ধারে সাবুই ঘাসের ঝোপে। সেখান থেকে ফাঁদের বগেড়ি নিয়ে চলে গেছে ঠিকাদারদের কাছে। পাখি বেচে মাস্টারজীকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে গারুদিয়া বাজারের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে চুনাওর মীটিং নজরে পড়েছে তাদের। ভিড়ের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রথম দিন ছিল নেকীরাম শর্মার মীটিং। রোগা পাকানো চেহারার হাড্ডিসার নেকীরামের পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো ; চোখ দুটো গিধের মতো ধারালো। নাকের ফুটোয় এবং কানের লতিতে পর্যাপ্ত লোম। কপালে তার ত্রিপুণ্ড্রক, পায়ে লম্বা চটি।

মঞ্চের ওপর নিজের খুবসুরত শালীকে তুলেছে নেকীরাম। এটা বাড়তি আকর্ষণ। গদরা জওয়ানী যেখানেই ঘুরুক ফিরুক, মাছির মতো ভনভনে ভিড় জমে যায়।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে, 'কলযুগ, ঘোর কলযুগ ! বেদ-বরাম্ভনকে কেউ মানে না আজকাল। তাই দেশের এই হাল। কভী দেখা অ্যায়সা খরা, অ্যায়সা বাঁড় ! কীসের জন্য এসব হচ্ছে ? ঘোর অনাচার, ভ্রষ্টাচার চল রহা হ্যায়। বরাম্ভন কারা ? জাতওয়ারি সওয়ালে তারা শ্রেষ্ঠ কেন ? ইয়ে ভগোয়ানকা লীলা। স্বয়ম্ ব্রহ্মা ঔর বিষুণ বরাম্ভনকে শ্রেষ্ঠ জাত বানিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে। এ কলযুগে তাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। রামায়ণ মহাভারত পড়ুন। রামচন্দজী থেকে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন—সবাই বরাম্ভনকে পূজা চড়িয়েছেন। বরাম্ভনরাজই হল সেরা রাজ। তাদের হাতে দেশ গেলে আসল কল্যাণ হবে। শান্তি আসবে। খরা-বাঁড় বন্ধ্ হবে, মড়ক বন্ধ্ হবে। ভগোয়ানের তাই ইচ্ছা। তাই বলছিলাম, এবার চুনাওতে আপনারা আমাকে ভোট দিন। ভৈস মার্কায় মোহর মারুন।'

অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সুদখোর নেকীরাম শর্মার বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই ভিড় ফুঁড়ে গারুদিয়া কোয়েল ফাগুরাম বেরিয়ে এসেছিল। তার মাথায় রঙীন পাগড়ী, পরনে হলুদ ধুতি, লাল জামা, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। ইদানীং এই পোশাকেই সে চুনাওর মীটিংয়ে মীটিংয়ে গান গেয়ে বেড়ায়।

ঝড়ের বেগে হারমোনিয়ামের রিডের ওপর আঙুল চালিয়ে ফাগুরাম মজা করে নেচেকুঁদে লাফিয়ে তার যাদুভরি গলায় গান

ধরেছিল :

'শর্মাজীকে লম্বী চটি
আউর তিলক ত্রিপুণ্ড
তিন লোককে পাপ বাটোরায় (টানে)
বাজায় ডমরু ডুং
ভোট লড়ানকো শর্মা আয়ে
কীর্তনীয়া হ্যায় গুম।
শর্মাজীকে শালী দেখো নাগন যেইসী চাল
তিতলি বনকে উড়তি-ফিরতি
ভোটনকে ব্যেপার।
ভাইয়া হো যাও হোঁশিয়ার,
ভাইয়া হো যাও হোঁশিয়ার।'

গান থামিয়ে একটা হাত আকাশে ছুঁড়ে ফাগুরাম চিৎকার করে ওঠে :

'ভৈসকা টাং তোড় দো.
নেকীরামকো ফোঁক দো।'

ফাগুরামের গান টান শেষ হতে না হতেই মীটিংয়ের ভিড়ে হাসির বান ডেকে গিয়েছিল। নেকীরামের চুনাও কর্মীরা ক্ষেপে গালাগাল করতে থাকে। কেউ কেউ ফাগুরামের দিকে তেড়ে যায়। হৈ-চৈ, চিৎকার এবং হাসাহাসিতে চুনাওক. মীটিংয়ের বারোটা বাজে। সব মিলিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড।

ধর্মা আর দাঁড়ায় নি; কুশীর একটা হাত ধরে ছুটতে ছুটতে কালালী পেরিয়ে আদিগন্ত মাঠে গিয়ে নেমেছে।

পরের দিন ছিল আবু মালেকের চুনাওকা মীটিং। যথারীতি মাস্টারজীকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে ভিড়ের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল ধর্মারা।

আবু মালেক বিশাল চেহারার মধ্যবয়সী আদমী। ইয়া লম্বা, ইয়া চওড়া। গায়ের রঙ টকটকে। থুতনিতে কাঁচাপাকা ছুঁচলো দাড়ি। পরনে ধবধবে চুস্ত আর চিকনের কাজ-করা পাঞ্জাবী। মাথায় রেশমের ফুলতোলা ফেজ।

বিরাট পাঞ্জা দিয়ে মাইকটা চেপে ধরে আবু মালেক গমগমে গলায় যা বক্তৃতা দিয়েছিল তা এইরকম :

মাইনোরিটি, মতলব সংখ্যালঘুর কথা কেউ ভাবে না। এ দেশে যো কুছ হোতা হ্যায়, সিরিফ সংখ্যাগুরুকে লিয়ে। লেকিন ইয়ে নায় চলেগা। সংখ্যালঘুদের কথা ভাবতেই হবে। তাদের অবহেলা করা চলবে না। তাদের জন্য সরকারী দপ্তরে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে জায়গা রিজার্ভ রাখতে হবে। চাকরি-বাকরির গেরাণ্টি দিতে হবে।

এখন সংখ্যালঘু কারা? শুধু মুসলমানেরা? নেহী নেহী। যে সব অচ্ছুৎ হিন্দু রয়েছে, কিরিস্তান রয়েছে—তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের আদমীরা জানবরের মতো ব্যবহার করে। কাজেই সংখ্যালঘুদের স্বার্থে আমাকে ভোট দেওয়া দরকার। ইয়াদ রাখবেন, আমার মার্কা হল হীরণ (হরিণ)। হীরণ মার্কামে মোহর মারবেন। স্রিফ সংখ্যালঘুকা স্বার্থে।

বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই আগের দিনের মতো ভিড় ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ায় ফাগুরাম এবং হারমোনিয়ামে ঝড় তুলে যাতুভরি গলায় গাইতে থাকে। গানের কথাগুলোতে থাকে শানানো অস্ত্রের ধার। ঘুরে ফিরে নেচে লাফিয়ে গাইতে গাইতে ফাগুরাম বুঝিয়ে দেয়—আবু মালেক আসলে চোর, ফেরেববাজ, বাটমার।

গাওয়া শেষ করে যথারীতি চিৎকার করে বলে :

'গলি গলি শোর হ্যায়,
আবু মালেক চোর হ্যায়।
হীরণকা শির তোড় দো,
আবু মালেককো ফোঁক দো।'

এইভাবেই দিন কাটতে থাকে।

সাতাশ

আজ তুপুরে কালোয়া খাওয়ার পর সীসম গাছের রুগ্ন ছায়ায় ধর্মারা জিরিয়ে নিচ্ছিল। হাইওয়ের দিক থেকে আচমকা টিরকে এসে হাজির। পাশে বসে কপালের ঘাম কাঁচাতে কাঁচাতে সে বলে, 'কা রে, চিতিয়ার বাচ্চার কী হল?'

ধর্মা মুখ কাচমাচু করে বলে, 'জঙ্গলে যেতে পারি নি ভাইয়া। তু-এক রোজের ভেতর জরুর যাব।'

'লেট নায় করনা।'

'নায় নায়।'

'আমরিকী সাব বিশ বাইশ রোজের মধ্যে রাঁচী ফিরে আসবে চিতিয়ার বাচ্চা না পেলে মুসিবত হো যায়েগা। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

ধর্মা বলে, 'ঘাবড়াও নেহী ভাইয়া। চিতিয়া বাচ্চা জরুর মিল যায়েগা।'

তাগাদা দেবার জন্যই রাঁচী থেকে এতদূর ছুটে আসা। আরো কিছুক্ষণ চিতার বাচ্চা সম্পর্কে ঘ্যানর ঘ্যানর করে টিরকে হাইওয়ের দিকে ফিরে যায়। তারপরও কিছুক্ষণ জিরোতে থাকে ধর্মারা।

সূর্য পছিমা আকাশের দিকে চলতে শুরু করলে জনমদাস এবং মরসুমী আদিবাসী কিষাণরা যখন ফের ক্ষেতিতে নামতে যাবে সেইসময় বড় সড়কের দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসে।

'প্রতিভা সহায়কো—'

'ভোট দো, ভোট দো।'

'ঘোড়েকা পর—'

'মোহর মারো, মোহর মারো।'

চুনাওর তারিখ যত এগিয়ে আসছে ততই হাইওয়ে ধরে ভোটের গাড়িগুলোর যাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে। কখনও জীপ হাঁকিয়ে রঘুনাথ সিং কি প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা যায়, কখনও টাঙ্গা হাঁকিয়ে নেকীরাম এবং আবু মালেকের লোকেরা যায়। তবে পায়দল যায় সুখন রবিদাসের দল। গাড়ি করে যাবার মতো পয়সার জোর ওদের নেই।

শান্ত কৌতূহলশূন্য চোখে প্রতিভা সহায়ের চুনাওর গাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই হঠাৎ চমক লাগে ধর্মাদের। গাড়িগুলো পাক্কীর কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর একটা জীপ থেকে অবোধ-নারায়ণ পাণ্ডে নেমে নয়ানজুলির গাড্ডা পেরিয়ে এদিকেই আসছে। অবোধনারায়ণ প্রতিভা সহায়ের নির্বাচন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট।

ধর্মাদের কাছ থেকে খানিক দূরে একটা কড়াইয়া গাছের তলায় বসে ছিল গণেরি। তার মাথায় এখনও তিন পরল পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। বড়ে সরকারের হুকুমে এবং মহত্তে তাকে এখন আর লাঙল ঠেলতে হচ্ছে না, তবে রোজই অন্য সবার সঙ্গে ক্ষেতিতে আসে, সারাদিন কড়াইয়া কি সীসম গাছের তলায় বসে থাকে। সুরয ডুবে গেলে সবার

সঙ্গেই আবার দোসাদটোলায় ফিরে যায়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ভুরুর ওপর একটা হাতের ছাউনি দিয়ে রোদ ঠেকাতে ঠেকাতে হাইওয়ের দিকে গণেরি তাকায়। বলে, 'অবোধজী আসছে না?'

আশপাশ থেকে সবাই বলে ওঠে, 'হঁ।'

একটু পর অবোধনারায়ণ কাছে এসে পড়ে। দোসাদটোলার মাতব্বর হিসেবে গণেরিকে বেছে নিয়ে বলে, 'কা রে, সেদিন তোদের যা বলেছিলাম, মনে আছে তো?'

গণেরির মনে পড়ে যায়। সেদিন রাত্তিরে অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব নিয়েই অবোধনারায়ণ দোসাদটোলায় হানা দিয়েছিল তবু খুব একটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে না গণেরি। নিরুৎসুক গলায় বলে, 'আছে।'

'কাল গারুদিয়া বাজারে প্রতিভাজীর চুনাওর মীটিন। তোরা কাজকাম চুকিয়ে সিধা ঘরে চলে যাবি। আমি গাড়ি নিয়ে তোদের আনতে যাব। যাদের ভোট আছে তাদের তো জরুর, যাদের ভোট নেই তাদেরও মাথাপিছু তিন রুপাইয়া করে দেব। জবান দিয়ে এসেছিলাম; তা তো রাখতেই হবে।' বলে একটু থামে অবোধ-নারায়ণ। পরক্ষণে ফের শুরু করে, 'কাল গাড়িতে উঠবার আগে তোদের হাতে নগদনারায়ণ দিয়ে দেব।'

গাড়িতে চড়ে প্রতিভা সহায়ের মীটিংয়ে যাওয়া এবং তিনটে করে রুপাইয়া নেওয়ার বাবদে রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে আগাম হুকুম নিয়ে রেখেছে গণেরি। তবু এই ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। গণেরি খুব একটা উৎসাহ দেখায় না; নিতান্ত সাদামাঠাভাবে বলে, 'ঠিক হ্যায় দেওতা—'

'কথাটা তোদের মনে করিয়ে দেবার জন্যে এলাম। এখন যাই: কাল ফির দেখা হবে।'

পরের দিন ধর্মা এবং কুশীর সাবুই ঘাসের জঙ্গলে যাওয়া হয় না। নগদ তিনটে করে টাকা পাওয়া যাবে। সেটা তাদের মতো হা-ভাতে জনমদাসদের কাছে খুব সামান্য ঘটনা নয়।

সুরয ডুবতে না ডুবতেই খামার বাড়িতে হাল-বয়েল জমা দিয়ে অন্য সবার সঙ্গে দোসাদটোলায় ফিরে আসে ধর্মারা এবং নিজের নিজের ঘরে

শিরদাঁড়া খাড়া করে দূর সড়কের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কখন অবোধনারায়ণ আসবে, তারই দমবন্ধ প্রতীক্ষা।

সন্ধ্যা নামার কিছুক্ষণ পরেই সামনের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে পঁচিশ তিরিশটা দামী ঝকঝকে লাক্সারী বাস এসে কাতার দিয়ে দাঁড়ায়। একটা গাড়ি থেকে স্বয়ং অবোধনারায়ণ নেমে সোজা দোসাদটোলায় ঢোকে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাড়া লাগাতে থাকে, 'চল্ সব, চল্। তোদের জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছি, তুরন্ত উঠে পড়।'

দোসাদ ভূমিদাসরা যে যার ঘর থেকে মুহূর্তে বেরিয়ে আসে এবং লাক্সারি বাসগুলোর দিকে দৌড়ে যায়। এমন গাড়িতে চড়া দূরের কথা, বাপের জন্মে তারা চোখেও ছ্যাখে নি। কাছাকাছি এসে সবাই থমকে যায়। হাজামজা চেহারা তাদের, গায়ের ফাটা খসখসে চামড়ার ওপর জমাট ময়লা, পরনের কাপড়গুলো কমসে কম দু মাস ধোয়া হয় নি। এরকম নোংরা শরীরে এবং নোংরা পোশাকে অত দামী গাড়িতে চড়তে তাদের সাহসে কুলোয় না।

পেছন থেকে অবোধনারায়ণ সস্নেহে তাড়া লাগায়, 'কী হল রে, উঠে পড়, উঠে পড়।'

প্রতিটি গাড়ির দরজার মুখে দুটো করে লোক দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে স্টীলের পাতলা পরাতে কাঁচা টাকার পাহাড় সাজানো রয়েছে। অনবরত তাড়া খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত দোসাদরা গাড়িতে উঠতে থাকে। উঠবার মুখে দ্বিতীয় লোকটা পরাত থেকে তিনটে করে টাকা গুনে প্রত্যেকের হাতে দেয়। বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ টাকাটা পায় তাদের মা-বাপেরা।

একটা লোকও বোধ হয় আর ঘরে পড়ে নেই। গোটা দোসাদ-টোলা ফাঁকা করে কাচ্চাবাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়ো-হাবড়া পর্যন্ত সবাই লাক্সারি বাসগুলোতে উঠে পড়েছে।

অন্য সবার মতো আরামদায়ক নরম গদীতে অতি সন্তর্পণে বসে ধর্মা ভাবতে থাকে, এমন সৌভাগ্যের কথা তাদের চোদ্দ পুরুষের কেউ কখনও চিন্তাও করতে পারে নি। চুনাওর তৌহার কেন যে হর সাল দু-চার বার করে আসে না?

এদিকে অবোধনারায়ণ নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব তদারক করছিল। এবার সামনের দিকে একেবারে প্রথম বাসটায় উঠে ড্রাইভারকে যেই স্টার্ট দেবার কথা বলতে যাবে, আচমকা দোসাদ-

টোলার ভেতর থেকে কারা যেন চিৎকার করে ওঠে, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অবোধনারায়ণ দেখতে পায়, একশো বছরের বুড়ো অথর্ব গৈরুনাথকে কাঁধে করে তার ছেলে ধনপত আসছে। ওদের পেছনে গৈরুনাথের পুতহু এবং নাতিনাতনীরা। যে গৈরুনাথের দিকে ছেলে, ছেলের বউ ফিরেও তাকায় না, যার পায়ে শোথ, দিনরাত সংসারের সবাই যার মৃত্যুকামনা করে, চুনাওর দৌলতে আজ সে চিতায় ওঠার আগেই একবার ছেলের কাঁধে চড়ে নেয়। নগদ তিনটে টাকা পাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়!

যতই বয়স হোক, যতই পঙ্গু হয়ে যাক, চামড়া ফেটে কষ পড়ুক, গৈরুনাথ তো চুনাওর চোখে একটা মানুষ নয়—আস্ত একটা ভোট। নির্বাচনের যখন আর বারোটা দিনও বাকী নেই তখন গৈরুনাথকে অবহেলা করা যায় না। অবোধনারায়ণ দ্রুত নেমে এসে সসম্ভ্রমে বলে, 'আও আও—' নগদ তিনটে করে টাকা গুনে দিয়ে একটা বাসে গৈরুনাথ, তার ছেলে, পুতহু এবং নাতিনাতনীদের আরামে বসার ব্যবস্থা করে দেয়।

একসময় লাক্সারি বাসগুলো ধুলো উড়িয়ে চলতে শুরু করে।

গারুদিয়া বাজারের সেই বড় মাঠটায় এসে ধর্মাদের চোখের তারা একেবারে কপালে চড়ে যায়। জায়গাটাকে আজ আর চেনাই যায় না। যেদিকে যতদূর তাকানো যায়, শুধু রোশনি আর রোশনি। প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা বারো চোদ্দটা বিরাট বিরাট জোরালো জেনারেটর এনে চারদিকে আলোর বান ডাকিয়ে দিয়েছে। জনারেটরগুলো থেকে অনবরত ভট ভট আওয়াজ উঠছে।

মাঠের শেষ মাথায় বিশাল সাজানো মঞ্চ। মঞ্চের সামনে মানুষ আর মানুষ। ডাইনে রাস্তার ধার ঘেঁষে সারি সারি ট্রাক, লাক্সারি বাস এবং নতুন নতুন ঝকঝকে প্রাইভেট কার। বোঝা যায়, এই গাড়িগুলো করেই বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের তিরিশ চল্লিশটা গাঁ সাফ করে সব মানুষ তুলে আনা হয়েছে।

ভিড়ের ভেতর চারদিকে অগুনতি বাঁশের খুঁটি পোঁতা। সেগুলোর গায়ে লাউড স্পীকারের লম্বা লম্বা চোঙা আটকানো রয়েছে।

আগেও গারুদিয়া বাজারের এই মাঠে নেকীরাম শর্মা, আবু মালেক, এমন কি স্বয়ং রঘুনাথ সিংও চুনাওর মীটিং করে গেছেন। রঘুনাথ

চারদিকের গাঁগুলোতে অগুনতি গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি পাঠিয়ে প্রচুর লোকজন জুটিয়ে এনেছিলেন কিন্তু প্রতিভা সহায়ের এই মীটিংয়ের কাছে সে মীটিং একেবারেই কিছু না।

ধর্মা তার অল্প অভিজ্ঞতা এবং তার চাইতেও কম বুদ্ধি দিয়ে টের পায়, মাথাপিছু নগদ তিনটে করে টাকা আর দামী হাওয়া গাড়িতে চড়ার লোভটা নাকের সামনে ঝুলিয়ে না দিলে প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা এত লোকজন জোটাতে পারত না। বাপ ভাল না, ভালা ভাইয়া, সবসে ভালা রুপাইয়া। এটাই হল জগতের সার সত্য। এর ওপরে আর কিছু নেই।

মঞ্চের ওপর সারি সারি চেয়ার এবং টেবল পাতা। সেখানে প্রতিভা সহায়কে মাঝখানে রেখে বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের বহু বড়া বড়া আদমী বসে আছেন। রঘুনাথ সিংয়ের চারপাশে ভকিল ডাগদর, বড় স্কুলের মাস্টারজী জমা হয়েছেন। ওঁরা ছাড়াও এই দুই মৌজায় আরো অনেক ডাগদর, ভকিল, মাস্টারজী, পণ্ডিতজী আছেন। তাঁরা প্রতিভা সহায়ের কাছে জড় হয়েছেন। ভুখানাঙ্গা জনমদাসেরা জানে না, যেখানে রুপাইয়া-পাইসা আর রাজনৈতিক ক্ষমতার গন্ধ সেখানেই মানুষের ভিড়। চিটেগুড়ের গায়ে যেমন মাছির ঝাঁকের ভনভনানি।

প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী এজেন্ট অবোধনারায়ণ ধর্মাদের মীটিংয়ে পৌছে কোন ফাঁকে বিশাল শরীর টেনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে মঞ্চে গিয়ে উঠেছিল, কেউ টের পায় নি। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সে-ই মীটিংয়ের কাজ পরিচালনা করতে থাকে। লোকটার সাংগঠনিক ক্ষমতা বিপুল।

অত্যন্ত সুচারুভাবে বিজুরির বড় ভকিলকে আজকের মীটিংয়ের সভাপতি করা হয়। একটা বাচ্চা মেয়ে এসে তাঁর এবং মঞ্চের অন্যান্য মান্যগণ্য মানুষগুলোর গলায় টাটকা গোলাপের মালা পরায়। পর্যাপ্ত হাততালির মধ্যে এই আনুষ্ঠানিক পর্বটি সমাধা হয়। তারপর অবোধনারায়ণের ইসারায় পাটনা এবং অন্য ভারী টৌনের ঢংয়ে প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা আকাশে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করতে থাকে।

'পরতিভা সহায়--'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'পরতিভা সহায়কি—'
'বোট দো, বোট দো।'
'ঘোড়াকা পর—'
'মোহর মারো, মোহর মারো।'
প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী প্রতীক হল ঘোড়া।

শ্লোগানে শ্লোগানে চুনাওর মীটিং সরগরম হয়ে ওঠে। তারপর একে একে প্রতিভা সহায়ের সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক, দুই তালুকের মানী লোকেরা গলার শির ছিঁড়ে এবং মাইক ফাটিয়ে বক্তৃতা করে যায়। তাঁদের সবার বক্তব্যই মোটামুটি এক। ভাইয়া এবং বহিনরা প্রতিভাজীকে আপনারা সবাই ভোট দিন। তিনি জিতলে এখানে রামরাজ এসে যাবে। দুঃখ কষ্ট অভাব গরীবী—কিছুই থাকবে না। নহরে নহরে দুধের বান ডেকে যাবে। সবার পাকা মকান হবে। কেউ ভুখা থাকবে না, নাঙ্গা থাকবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন তো বলেই ফেললেন, 'ভাইয়া আউর বহিনরা, একটা ব্যাপার আপনারা নজর করে দেখেছেন? এই কেন্দ্র থেকে এবার যাঁরা চুনাওর লড়াইতে নেমেছেন তাঁদের কারো সিম্বল, মতলব প্রতীক চিহ্ন হল উট, কারো হাতী, কারো হীরণ, কারো ভৈস। হাতী বহোত দামী জানবর। কথায় বলে হাতী মরলেও লাখো রুপাইয়া। মগর এত বড় জানবর কোন উপকারে লাগে? কোন কিছুতেই না। উপকার দূরের কথা, সিরিফ বসে বসে খাওয়া ছাড়া এর দুসরা কাম নেই। হাতীকে আপনারা নাকচ করে দেবেন। উটও আমাদের এখানে অচল। হীরণ বহোত উমদা জানবর। মগর সে-ও কোন কাজে লাগে না। ভৈস কামে লাগে বটে, মগর বড়া স্লো জানবর। তার চাল বহোত ধীরা। ইস যুগ হ্যায় প্রগতিকা যুগ। যা কিছু ধীর, স্লো—সেসব বাতিল হয়ে যাবে। আপনারা জানেন, লাখো লাখো বরষ আগে দুনিয়ায় হাতীর চাইতেও বড়া বড়া জানবর ছিল। তারা ডাইনোসর, ম্যামাল। সব খতম হয়ে গেছে। এখন চাই স্পীড, মতলব গতি। যো কুছ করনা, তুরন্ত করনা। ইস লিয়ে প্রতিভাজী ঘোড়াকা প্রতীক নিয়েছেন। একবার ওঁকে জিতিয়ে দিন, দেখবেন প্রতিভাজী গারুদিয়া বিজুরীর সড়ক সোনাচাঁদী দিয়ে বাঁধিয়ে দেবেন।'

বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের তিরিশ বত্রিশটা গাঁয়ের আধ-

ন্যাংটো, ক্ষুধার্ত আনপড় লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। নানা বক্তার জ্বালাময়ী ভাষণের শতকরা দশভাগ হয়ত তাদের মাথায় ঢোকে, বাকী নব্বই ভাগ দুর্বোধ্যই থেকে যায়। তবে এটুকু তারা বোঝে, সব বক্তাই প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী প্রতীক ঘোড়া চিহ্নে মোহর মারতে বলছেন।

যাই হোক, সবার বক্তৃতা হয়ে যাবার পর প্রতিভা সহায় স্বয়ং সামনে উঠে দাঁড়ান। তিনি এভাবে শুরু করেন, আমাদের বংশের কেউ কোনদিন রাজনীতি করে নি, চুনাওতে নামে নি। তবে আচানক আমি কেন এতে এলাম? ভাইয়া আউর বহিনরা, আপনারা জরুর এই প্রশ্ন আমাকে করতে পারেন। তার উত্তরে আমি বলব, বিজুরি আমার সসুরাল। আপনারা জানেন আওরতের কাছে সসুরালই হল আপনার ঘর।'

'আমরা থাকি বড় শহরে। গাঁও ঘরে খুব একটা আসা হয় না। দো সাল চার সাল বাদে একবার হয়ত আসি। যেবারই আসি, নজরে পড়ে গাঁওয়ের হাল আরো বুরা হয়ে গেছে। গরীব আরো গরীব হয়ে গেছে, নাঙ্গা আরো নাঙ্গা। এবার গাঁওয়ে এসে সব দেখে আমার আঁশু এসে গেল। ভাবলাম, কিছু একটা করা দরকার। গাঁও না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। গাঁওবালাদের যেমন করে হোক রক্ষা করতেই হবে। বিজুরি আমার সসুরাল, তাই এই জায়গার ওপর আমার কর্তব্য আছে।'

'ভাইয়া আউর বহিনরা, আপনারা জানেন আমার নিজের কোন অভাব নেই। আমার স্বামী শ্বশুর ফ্যাক্টরি আর কয়লাখাদান থেকে যা টাকা পান তাতে আমার পরও বিশ-পঁচিশ পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে আরামে কাটিয়ে যেতে পারবে। মগর আমি একটা মানুষ; আপনাদের মতোই আমার গায়ে লাল খুন রয়েছে। এখানে এসে দেখলাম হাজারো লাখো আদমী করজের ফাঁদে আটকে আছে। কামিয়া প্রথা, বেটবেগারি, জাতপাতের সওয়াল নিয়ে অত্যাচার সমানে চলছে। মগর এ আমি চলতে দেব না। গরীবী, কামিয়াগিরি, ছুয়াছুত ভারতকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ চলতে দেওয়া যায় না। মগর হাতে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকে এ সব জঘন্য নিয়ম ঠেকাবো কী করে? তাই এবার চুনাওতে নেমেছি। এখন সবই আপনাদের হাতে, আপনাদের কিরপা। আপনারা যদি আমাকে ভোট দিয়ে জেতান, প্রাণ দিয়ে আপনাদের সেবা করতে চেষ্টা করব।

মনে রাখবেন আমার প্রতীকচিহ্ন ঘোড়া।'

প্রতিভা সহায়ের কথা শেষ হবার পর তাঁর চুনাও কর্মীরা যখন শ্লোগান দিয়ে মীটিংটাকে শেষবারের মতো গরম করতে যাবে সেই সময় একটা কাণ্ড ঘটে যায়। ভিড়ের ভেতর কোথায় হারমোনিয়াম নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালা, কেউ টের পায় নি। আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে, নেচে কুঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার মজাদার গান শুরু করে দেয়ঃ

'কায়থ কুলশিরোমণি
পরতিভা সহায়!
ভোট মাঙনে আয়ী হ্যায়
হাম দুখিয়ানকে পার
হাম দুনিয়ানকে পার।
পরতিভাদেবী বড়ী সয়ানী
ঠম্মক ঠম্মক চাল,
ভোট মাঙ্‌তী রোতী ফিরতী
ও য্যায়সা ঘড়িয়াল
য্যায়সা ঘড়িয়াল।'

নেকীরাম শর্মা বা আবু মালেকের চুনাওর মীটিংয়ে যেমন হয়েছে, এখানেও হুবহু তাই ঘটে। ভিড়ের লোকজন মজাদার গান শুনে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আর সমঝদারদের প্রতিক্রিয়া দেখে উৎসাহ দশগুণ বেড়ে যায় গারুদিয়া-কোয়েল ফাগুরামের। সেই সঙ্গে নাচন কোঁদন এবং লাফ-ঝাঁপও। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে নতুন উদ্যমে গাইতে থাকে:

'কায়াথকুল শিরোমণি
পরতিভা দেবী সহায়
ভোট মাঙ্‌নে আয়ী হ্যায়—'

গানটা আর শেষ করতে পারে না ফাগুরাম। আচমকা মাটি ফুঁড়ে হট্টাকট্টা ডাকু-য্যায়সা চেহারার ক'টা লোক উঠে আসে। তাদের হাতে লোহার গুল-বসানো লাঠি।

'হারামজাদকা ছৌয়া, কুত্তেকা বাচ্চা—' অকথ্য খিস্তিখেউড় করতে করতে লোকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাগুরামের ওপর। এলোপাথাড়ি

লাঠি পড়তে থাকে তার মাথায় পিঠে ঘাড়ে কাঁধে। একটা চোট খেয়ে নতুন হারমোনিয়ামটা ভেঙে ছেতরে যায়। আর দু-হাত দিয়ে মুখ মাথা আড়াল করতে করতে চিৎকার করতে থাকে ফাগুরাম, 'বঁচাও, বঁচাও—' ঘা খেতে খেতে তার তিন চারটে দাঁত উপড়ে যায়। মাথা মুখ কপাল, সব জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। একসময় বুকফাটানো চিৎকার করতে করতেই রক্তাক্ত বিধ্বস্ত ফাগুরাম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

'শালে গারুদিয়া কোয়েল বনেছে; গলার নলিয়া একেবারে ফেঁরে ফেলব—' লোকগুলোর লাঠি সমানে পড়তেই থাকে।

প্রথমটা মিটিংয়ের লোকজন, বিশেষ করে দোসাদটোলার ভূমি-দাসেরা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। কী করবে, ভেবে উঠতে পারছিল না কেউ। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে যায় গণেরি। মা-পাখি যেভাবে ডানা মেলে ছানা আগলায় অবিকল সেইভাবে দু-হাত ছড়িয়ে লাঠির ঘা থেকে ফাগুরামকে বাঁচাতে বাঁচাতে চেঁচাতে থাকে, 'মারো মত, মারো মাত—'

এদিকে চারধারে গোটা মাঠ জুড়ে চেঁচামেচি হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। লোকজন ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরে করে দেয়। মঞ্চ থেকে মাইকে কারা যেন অনবরত কী বলতে থাকে। সে সব কিছুই বোঝা যায় না।

হাট্টাকাট্টা লোকগুলো কী ভেবে আর লাঠি চালায় না। হয়ত ভাবে, আপাতত এই পর্যন্তই থাক। একটা বেয়াড়া গান গাওয়ার পরিণাম হিসেবে মারটা মোটামুটি মন্দ হয় নি। তারা ফাগুরামকে ফেলে রেখে চোখের পলকে ভিড়ের ভেতর উধাও হয়ে যায়।

প্রথমে কলিজা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল ফাগুরাম। ক্রমশঃ তার স্বর নির্জীব হয়ে আসে। গলার ভেতর থেকে থেমে থেমে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুতে থাকে। ফাগুরাম পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে গেছে।

একটু দূরে দোসাদটোলার বাসিন্দারা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে ফিরে গণেরি ধমকে ওঠে, 'বুরবাকরা, তুরন্ত এখানে আয়। ফাগ্‌ওকে নিয়ে আভ্‌ভী অসপাতাল যেতে হবে।'

প্রথমেই দৌড়ে আসে ধর্মা। তার পেছন পেছন মাধোলাল শিউমল নাটুয়া ধানো, এমনি আরো অনেকে।

মুহূর্তে ফাগুরামের রক্তাক্ত বেহুঁশ দেহ ধর্মার কাঁধে ওঠে। ধর্মা নাটুয়া শিউমল ধানো এই চারটে জোয়ান ছোকরাকে থাকতে বলে বাকী সবাইকে দোসাদটোলায় ফেরত পাঠিয়ে দেয় গণেরি। এত লোকজন নিয়ে অসপাতাল যাওয়াটা কাজের কথা নয়; অকারণ ঝঞ্ঝাট শুধু।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, মীটিংয়ের জায়গাটা পেছনে ফেলে গারুদিয়া বাজারের উত্তর দিকের সেই কালালীটার পাশ দিয়ে গণেরিরা আদিগন্ত ফাঁকা মাঠে গিয়ে নামে। মাঠের ওপর দিয়ে কোণাকুণি রশিভর হাঁটলে হাইওয়ে।

এখান থেকে সব চাইতে কাছের শহর ভকিলগঞ্জ। তাও কমসে কম মাইল ছয়েক তফাতে। এতটা রাস্তা কোন একজনের পক্ষে একটা বেহুঁশ লোককে কাঁধে করে যাওয়া অসম্ভব। তাই চারটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়েছে গণেরি। পালা করে তারা ফাগুরামকে বইতে পারবে।

অন্ধকারে নিঃশব্দে মাঠ ভাঙছিল ওরা। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ধর্মা ডাকে, 'গণেরিচাচা---

গণেরি সাড়া দেয়, 'কা?'

'ফাগ্‌গুচাচার এ কী হল?'

অন্ধকারের ভেতর থেকে গণেরির অলৌকিক বিষণ্ণ গলা উঠে আসে যেন, 'এ আমি জানতাম, আমি জানতাম।'

ধর্মার মনে পড়ে; এমন একটা ভয়াবহ পরিণামের কথা গণেরি বহুবার দোসাদটোলায় সবাইকে জানিয়েছে।

হাইওয়েতে ওঠার পর আচমকা কী মনে পড়তে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে গণেরি। বলে, 'ডাইনা নহী, বাঁয়ে চল্—'

ধর্মারা অবাক। পাক্কী ধরে ডাইনে না গেলে ভকিলগঞ্জে যাওয়া যাবে না।

ধর্মাদের মনোভাব মুহূর্তে বুঝে ফেলে গণেরি। বলে, 'অসপাতাল যাবার আগে একবার বড়ে সরকারের কোঠিতে যেতে হবে। হুজৌরকে ফাগ্‌গুর খবরটা দিতে হবে। তার কী হাল হয়েছে, সেটা দেখানো দরকার।'

কেউ আর কোন প্রশ্ন করে না। সবাই হাইওয়ে ধরে বাঁ দিকে হাঁটতে থাকে।

আটাশ

এখন বেশ রাত।

রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে সেই পাথর-বসানো বিশাল বারান্দায় নির্বাচন সংক্রান্ত কথাবার্তা চলছে। এটা কোন প্রকাশ্য অধিবেশন নয়। যেদিন কোথাও চুনাওর মীটিং থাকে না সেদিন সন্ধ্যের পর একান্ত নিজস্ব এবং বিশ্বস্ত ক'জন বন্ধুবান্ধব, পরামর্শদাতা এবং চামচাকে নিয়ে রঘুনাথ নিগূঢ় ও গোপন আলোচনায় বসেন। চামচা শব্দটা হিন্দী সিনেমার দৌলতে ইদানীং এ অঞ্চলে বেশ চালু হয়ে গেছে। যাই হোক, এটাকে ইংরেজিতে ইনার সার্কেলের মীটিং বলা যেতে পারে। এখানে বসেই চুনাও নামক লড়াইয়ের নানা সূক্ষ্ম এবং চতুর চাল ঠিক করা হয়।

আজও ইনার সার্কেলের সেই মীটিং চলছে। রঘুনাথ সিংকে মাঝখানে বসিয়ে অন্য সবাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। রঘুনাথের সেই চিরস্থায়ী পা-চাটা কুত্তার দল অর্থাৎ মাস্টারজী, ডাগদর সাহেব, ভকীলজী—এঁরা তো রয়েছেনই। সেই সঙ্গে নতুন দুটি মুখও দেখা যাচ্ছে—নেকীরাম শর্মা এবং আবু মালেক। রাতের অন্ধকারে বিশ্বাসী এজেন্টদের পাঠিয়ে নেকীরাম আর মালেক সাহেবের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলেছেন রঘুনাথ। তবে খালি হাতে না। এ বাবদে তাঁকে বেশ কিছু খরচও করতে হয়েছে। ব্যাপারটা এখনও জানাজানি হয় নি, তবে ঠিক হয়েছে নেকীরাম আর আবু মালেক এবারের চুনাও থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে এবং রঘুনাথ সিংয়ের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে নামবে। তারা বোঝাবে, উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ একজনই রক্ষা করতে পারেন। তিনি আর কেউ নন—রঘুনাথ সিং। আশা করা যাচ্ছে, এর ফলাফল ভালই হবে। নেকীরাম আর আবু মালেকের ভোটের যে হিস্যা পাবার কথা, সেগুলো তিনিই পেয়ে যাবেন। গারুদিয়া-বিজুরির জনগণ কাল-পরশুর মধ্যেই চুনাওর মীটিংয়ে সুসজ্জিত মঞ্চে রঘুনাথ সিংয়ের সঙ্গে আবু মালেক এবং নেকীরাম শর্মাকে পাশাপাশি দেখতে পাবে।

রঘুনাথ সিং বললেন, 'চুনাওর লড়াইটা শেষ পর্যন্ত তা হলে তিন-

জনের মধ্যেই হচ্ছে—প্রতিভা সহায়, সুখন চামার আর আমার।'

সবাই ঘাড় নাড়ে। ডাক্তার শ্যামতুলাল ইংরেজি করে বলেন, 'ট্র্যাঙ্গুলার ফাইট।'

'আপনাদের কি মনে হয়, এই লড়াইতে বেরিয়ে যেতে পারব ?'

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই।'

নেকীরাম শর্মা বলে, 'আপনি যে ভোটটা পেতেন তার সঙ্গে আমার আর মালেক সাহেবের ভোটটা জুড়ে নিন। জরুর জিতবেন।'

তবু পুরোপুরি সংশয় কাটে না রঘুনাথ সিংয়ের। তিনি বলেন, 'প্রতিভা সহায় দশ হাতে পয়সা ছড়াচ্ছে। আমার মনে হয় ও আওরত জরুর ভাল ভোট টানবে। সুখন রবিদাসের কথা যদি বলেন— '

সবাই বিপুল আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে রঘুনাথের দিকে তাকায়। তিনি বলতে থাকেন, 'ঐ চামারের ছোয়াটাও যথেষ্ট ভোট পাবে। আমরা ক'জন দোসাদ কিষাণ বাদ দিলে গারুদিয়া-বিজুরির সব অচ্ছুতিয়ারা ওকেই ভোট দেবে।'

সবাই সমস্বরে হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'কভী নায়, কভী নায়—'

গলার স্বরে যথেষ্ট জোর দিয়ে রঘুনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই দেবে।'

সবাই থতিয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কী করে বুঝলেন ?'

এ ক'দিন চুনাওর ব্যাপারে গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের গাঁয়ে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে ভোট মাংতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আদ্যোপান্ত নিখুঁত বিবরণ দিয়ে রঘুনাথ বলেন, 'অচ্ছুতিয়াদের কাছে যখনই ভোট দেবার কথা বলেছি, কুত্তাগুলো চুপ করে গেছে। বিলকুল যেন গুংগা! যারা ভোট দেবে তাদের মুহ্ দেখলে বোঝা যায়।'

রঘুনাথ সিংয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তির সবাই উচ্ছ্বসিত তারিফ করে কিন্তু তাতে সমস্যার সুরাহা হয় না। এ অঞ্চলের হরিজন ভোটের ভাল একটা অংশ কীভাবে পাওয়া যাবে, সেই প্রশ্নটাই সবার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। ইনার সার্কেলের পরামর্শ সভাটা নিঝুম হয়ে যায়। এখন একটা পাতা খসে পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যাবে।

একসময় রঘুনাথ হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আমার মাথায় একটা শতরঞ্জের চাল এসেছে। দেখুন আপনাদের কীরকম লাগে ?'

'কী চাল ?' চোখে মুখে অনন্ত কৌতূহল নিয়ে সবাই রঘুনাথের

দিকে তাকায়।

চাপা নীচু গলায় ফিস ফিস করে রঘুনাথ সিং তাঁর দাবার চাল সম্পর্কে বিশদভাবে বলে যান। রাতের আন্ধেরাতে পাঁচ-সাতটা হরিজন গাঁ মিট্টি তেল দিয়ে প্রথমে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর অচ্ছুৎদের বন্ধু সেজে ওদের নয়া ঘর বানাবার জন্য ঢালাও টিন খড় বাঁশ এবং নগদ টাকা বিলোতে হবে। এতে স্বাভাবিক নিয়মেই গঞ্জু-ধোবি-ধাঙড়েরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। তার ফল পাওয়া যাবে ভোটের বাক্সে।

পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। চুনাও শতরঞ্জের খেলায় এর চাইতে ভাল এবং দামী চাল নাকি কেউ আর কখনও ভাবতে পারে নি।

রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা তা হলে এটা মঞ্জুর করছেন?'

'অবশ্যই। তবে কাজটা বহোত হুঁশিয়ারিসে করতে হবে।'

অচ্ছুৎদের গাঁয়ে আগুন লাগাবার ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে যায়। কীভাবে কোন কোন গাঁ জ্বালানো হবে তাই নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ এসে হাজির।

অযোধ্যাকে দেখে হঠাৎ রঘুনাথের মনে পড়ে যায়, বিকেলে তাকে গারুদিয়া বাজারে প্রতিভা সহায়ের চুনাওর মীটিংয়ের খবর আনতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি শুধোন, 'কী রকম দেখলে?'

অযোধ্যাপ্রসাদ মেঝেতে বসতে বসতে বলে, 'বহোত ভারি মীটিন রঘুনাথজী।'

'কেমন লোকজন হয়েছিল?'

'কমসে কম লাখো আদমী হবে। তিন সাল এখানে চুনাও দেখছি। মগর এত বড় মীটিন আর নজরে পড়ে নি।'

রঘুনাথ সিংয়ের মুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে যায়। সেটা লক্ষ্য করে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে অযোধ্যাপ্রসাদের। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত এবার সে বলে ওঠে, 'হবে নাই বা কেন? লাখো লাখো রুপাইয়া ওড়াচ্ছে যে আওরতটা। পাইসার লালচে ভুখা হাভাতের দল দৌড়ে গেছে। মাংসের একটা টুকরা ফেঁকলে বিশটা কুত্তা দৌড়ে আসে না? মীটিনে গেছে বলেই কি ঐ আওরতটাকে ওরা ভোট দেবে নাকি? কভী নেহী।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় রঘুনাথ সিংয়ের। মনে পড়ে, তিনিও নিজের খরিদী কিষাণদের প্রতিভা সহায়ের মীটিংয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন। তাতে গরীব লোকগুলো ক'টা করে পয়সা পাবে।

একটু ভেবে রঘুনাথ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কী বলল?'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে, 'মামুলী বাত। এই করব সেই করব। আসমান থেকে স্বরগ পেড়ে এনে গারুদিয়া-বিজুরিতে বসিয়ে দেব।' প্রতিভা সহায়দের বক্তৃতার সারমর্ম আশ্চর্য দক্ষতায় পেশ করতে থাকে সে। করতে করতে মাঝখানে হঠাৎ থমকে যায়।

'কী হল? চুপ করে গেলে যে?'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে, 'একটা বুরা খবর আছে রঘুনাথজী।'

'কা বুরা খবর?' রঘুনাথ সিংয়ের ভুরু কুঁচকে যায়।

'ফাগুরামকে নিয়ে মীটিনে গণ্ডগোল হয়েছে।'

রঘুনাথ সিং শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেন। বলেন, 'কীসের গণ্ডগোল?'

অযোধ্যাপ্রসাদ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বড় ফটকের বাইরে থেকে কার গলা শোনা যায়, 'হুজৌর—'

ঘাড় ফিরিয়ে রঘুনাথ সিং এবং তাঁর পা-চাটা কুত্তারা দেখতে পায় গণেরি দোসাদ দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে আলোটালো নেই। অন্ধকারে গণেরির পেছনে আরো কয়েকজন আবছা ভাবে চোখে পড়ে।

রঘুনাথ সিং এই মুহূর্তে তাঁর খরিদী কিষাণদের এখানে আশা করেন নি। অন্য সময় হলে নৌকর দিয়ে ভাগিয়ে দিতেন। কিন্তু চুনাওর তারিখ দ্রুত এগিয়ে আসছে। এ সময় হঠকারিতা কোন কাজের কথা না। ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠলেও মুখে দেখন হাসি ফুটিয়ে রঘুনাথ বলেন, 'কা রে, এত্তে রাতমে?'

বড়ে সরকারের ডাক না এলে তাঁর কোঠিতে ঢোকার সাহস নেই গণেরিদের। আগে যে এসেছে, তখনও রঘুনাথ সিংয়ের তলব পেয়েই। গণেরি ভয়ে ভয়ে বলে, 'হুজৌরের হুকুম হলে আমরা অন্দরে আসি।'

'আয়—'

গণেরিরা ভেতরে ঢুকতেই ধর্মার কাঁধে রক্তাক্ত বেহুঁশ ফাগুরামকে দেখে রঘুনাথ সিং চমকে ওঠেন, 'ফাগ্‌গুর এ হাল হল কী করে?'

গণেরি প্রতিভা সহায়ের চুনাও মীটিংয়ে ফাগুরামকে ঘিরে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বিমর্ষ মুখে বলে, 'মার দিয়া

সরকার। ফাগুয়াকে বিলকুল খতম করে দিয়েছে পরতিভাজীর পহেলবানেরা। হাসপাতাল নিয়ে যাবার আগে আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে গেলাম।'

ধর্মা এমনিতে চুপচাপ থাকে। আচমকা তার মধ্যে কী যেন ঘটে যায়। সে বলে ওঠে, 'হুজৌর, আপনার জন্যে চুনাওর গানা গাইতে গিয়ে ফাগ্‌গুচাচা মরতে চলেছে।'

পোকামাকড়ের চাইতেও তুচ্ছ একটা অচ্ছুৎ জনমদাস যে এভাবে কথা বলতে পারে, এটা রঘুনাথ সিংয়ের ধারণার বাইরে। ধর্মার সীমাহীন স্পর্ধায় তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর চোখমুখ ভয়ঙ্কর দেখায়। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। জুতিয়ে অথবা চাবুক চালিয়ে দোসাদটার মুখের চামড়া ছিঁড়ে নেবেন কিনা, ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে, চুনাওয়ের বেশি দেরি নেই। নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চেপে রঘুনাথ সিং বলেন, 'ওই বাঁজা কারখান্না-বালী কুত্তেকা বেটিয়াকে আমি দেখে নেব। গারুদিয়ায় এসে আমার আপনা আদমীকে পিটিয়ে যাবে, এ আমার অপমান। এর বদলা যদি তুলতে না পারি তো আমি ক্ষত্রিয় রাজপুতের ছৌয়া নই।' তাঁর ভেতর থেকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক বর্বর প্রতিনিধি যেন বেরিয়ে আসে।

প্রতিভা সহায়ের ওপর বদলা নেবার ব্যাপারে দোসাদরা কতটা সান্ত্বনা পায়, তারাই জানে। গণেরি কাঁপা গলায় বলে, 'হুজৌরকা হুকুম হো যায় তো হামনিলোগন অসপাতল চলে—'

রঘুনাথ বলেন, 'নেহী। আমার গান গাইতে গিয়ে ফাগুয়ার এই হাল। আমিই ওকে হাসপাতাল পাঠাব।' হাঁকডাক করে তক্ষুনি চুনাওর জন্য নির্দিষ্ট একটি জীপ বার করান। ফাগুরামকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। রঘুনাথ সিংয়ের মহানুভবতায় গণেরিরাও তার সঙ্গে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ পর জীপটা হাইওয়ে দিয়ে ভকিলগঞ্জ হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। পাঁচ দোসাদ স্তব্ধ হয়ে ফাগুরামের ক্ষতবিক্ষত শরীর আগলে বসে থাকে। চুনাওর মীটিং থেকে রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলির দিকে যাবার সময় ফাগুরামের গলা দিয়ে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুচ্ছিল। এখন আর কোন শব্দই নেই।

হাসপাতালে পৌঁছুবার পর ডাক্তার সাব ফাগুরামের নাড়ি ইত্যাদি দেখে ঘোষণা করেন, অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

বহুদর্শী আধবুড়ো গণেরি দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বলতে থাকে, 'এ আমি জানতাম, এ আমি জানতাম।'

চুনাওর জন্য এ অঞ্চলে প্রথম প্রাণ দেবার স্বর্গীয় গৌরব অর্জন করে অচ্ছুং নৌটঙ্কীবালা ফাগুরাম দোসাদ।

ঊনত্রিশ

রঘুনাথ সিং সেদিন তাঁর পরামর্শদাতা, চামচা এবং গণেরিদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন, ফাগুরামকে মারার বদলা অবশ্যই নেবেন। প্রতিভা সহায়কে তিনি ছাড়বেন না। কিন্তু ফাগুরামের মৃত্যুর পর তিন চার দিন কেটে গেল, এ ব্যাপারে তাঁর কোনরকম গরজ দেখা যাচ্ছে না। হয়ত ভেবেছেন, চুনাওর মুখে এ নিয়ে হুজ্জুত করতে গেলে এমন ঝামেলায় জড়িয়ে যাবেন যেটা তাঁর নির্বাচনী ফলাফলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তা ছাড়া একটা নগণ্য দোসাদের জীবন গারুদিয়া বিজুরিতে এমন কিছু অমূল্য নয় যা নিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের মতো মানুষকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ভেবে ভেবে সময় অপচয় করতে হবে।

বড়ে সরকার চুনাও নিয়ে এখন সর্বক্ষণ ব্যস্ত। গারুদিয়া বিজুরির গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর জীপ প্রায় সারাদিনই ধুলো উড়িয়ে ছুটতে থাকে। বাজারে-গঞ্জে নিয়মিত মীটিং করে চলেছেন তিনি। ইদানীং প্রতিটি মীটিংয়েই তাঁর সঙ্গে আবু মালেক আর নেকীরাম শর্মাকে দেখা যায়। তারা আগামী নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। নেকীরাম এবং আবু মালেক আজকাল প্রতিটি উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং মাইনোরিটিকে রঘুনাথ সিংকে ভোট দেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। বোঝাচ্ছে, রঘুনাথজীকে ভোট দিলেই তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে : তাদের নিরাপত্তা একেবারে 'গিরান্টিড'।

প্রতিভা সহায় বা সুখন রবিদাসও বসে নেই। তারাও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চুনাওর মীটিং করে যাচ্ছে।

যে যা খুশি করে যাক, ফাগুরামের বেঘোরে এই মৃত্যু গণেরিদের দোসাদটোলাটাকে কয়েকটা দিন বিমর্ষ করে রাখে।

আজ সকালে খামারবাড়ি থেকে হালবয়েল নিয়ে ক্ষেতির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অবাক হয়ে যায় ধর্মা। হাইওয়ের তলায় নীচু পড়তি জমিতে যেখানে কিছুদিন আগে আদিবাসী ওরাঁও-মুণ্ডারা এসে চট বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে অস্থায়ী ছাউনি তুলে নিয়েছিল তার গা ঘেঁষে সারি সারি গৈয়া এবং বয়েল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই লোকদুটো, চাহাঢ়ের হাটিয়ায় যারা আদিবাসীদেব আসাম না আগরতলা কোথায় নিয়ে যাবার জন্য অনবরত ফোসলাচ্ছিল—তাদের দেখা যায়। তারা হাঁকডাক করে তাড়া দিয়ে দিয়ে ওরাঁও-মুণ্ডাদের গাড়িগুলোতে তুলছে।

আচানক কী মনে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধর্মা। একেবারে সামনে যে জোয়ান মুণ্ডাটাকে পায় তাকে শুধোয়, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা ?'

মুণ্ডাটা বলে, 'আসাম।'

জোরে শ্বাস ফেলে ধর্মা। আড়কাঠি দুটো বলেছিল, আসাম বা আগরতলায় গেলে পেট ভরে খেতে পাবে, পাইসা মিলবে, জামা-কাপড় মিলবে। আদিবাসীগুলো তো বেঁচে গেল। কিন্তু তাদের মতো জনমদাসদের আমৃত্যু হয়ত বড়ে সরকারের ক্ষেতিতে লাঙল ঠেলেই যেতে হবে।

পেছন থেকে বুধেরি বলে, 'কা রে ধর্মা, পাক্কীতেই দাঁড়িয়ে থাকবি, না জমিনে যাবি ?'

ধর্মা উত্তর দেয় না। ঘাড় গুঁজে বিষণ্ণ মুখে ফের হাঁটতে থাকে।

ক্ষেতিতে আসার পর দুপুর পর্যন্ত আর কোন দিকে তাকাবার ফুরসত পায় না কেউ। দুপুরে সূর্যটা যখন খাড়া মাথার ওপর এসে ওঠে সেই সময় অন্য সবার সঙ্গে গামছায় মুখ মুছে কালোয়া খেতে বসে ধর্মা, কুশী। আর তখনই দেখা যায় হাইওয়ের দিক থেকে টিরকে আসছে। এই ঝাঁ-ঝাঁ জ্যৈষ্ঠের দুপুরে যখন লু-বাতাস চারদিকে আগুন ছড়াচ্ছে সেই মুহূর্তে তার আসার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না ধর্মার। টিরকে কাছাকাছি এসে গেলে সে বলে, 'দো-চার রোজকা অন্দর জঙ্গলমে যায়েগা টিরকে ভাইয়া। ইডভান্স পাইসা নিয়েছি; চিতার বাচ্চা ঠিক এনে দেব। চিন্তা করো না।'

টিরকে বলে, 'ও তো ঠিক আছে। মগর বাচ্চা দুটো তাড়াতাড়ি চাই। আমরিকী সাব আগেলা উইকমে আয়েগা। সাত রোজ থাকবে। তার ভেতর যেভাবে পারিস যোগাড় করে দে।'

'ঠিক হ্যায়। মগর—'

'কা?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে ধর্মা। তারপর বলে, 'ভাইয়া আউর দোশো রুপাইয়া দিতে হবে।'

টিরকে চমকে ওঠে প্রথমটা। তারপর স্থির চোখে ধর্মাকে দেখতে দেখতে বলে, 'তোর সাথ তো সেদিনই দাম ফাইনিল হয়ে গেল। আবার টু হানড্রেড চাইছিস যে?'

'এটা দিতে হবে। না হলে তোমার ইডভান্স ওয়াপস নিয়ে যাও।' ধর্মা বলে। আসলে মাস্টারজীকে দিয়ে সে গুনিয়ে দেখেছে ঐ বাড়তি দুশো টাকা না হলে বড়ে সরকারের করজটা শোধ করা যাবে না। আন্দাজে সেদিন দেড় হাজারের কথা বলেছিল সে।

টিরকে বলে, 'এ বহোত জুলুমকা বাত।'

ধর্মা কাচুমাচু মুখে বলে, 'তুমি ইস টেইন রুপাইয়াটা দাও। পরে তোমাকে বিনা পয়সায় অন্য জানবর জুটিয়ে এনে দেব।'

লাভ কিছুটা কম হবে। কিন্তু এখন আর ফেরার রাস্তা নেই। আমেরিকান সাহেবের কাছ থেকে আগাম বহু টাকা নিয়ে ফেলেছে টিরকে। সন্দিগ্ধ গলায় সে বলে, 'পরে আবার দামটা চড়াবি না তো?'

'নায় নায়, রামজী বিষ্ণুজী কসম—'

'ঠিক হ্যায়। টু হানড্রেড জ্যাদাই দেব—মগর জঙ্গলে দু-এক রোজের মধ্যে চলে যা।'

'হঁ, জরুর।'

টিরকে আর বসে না, নিরানন্দ মুখে চলে যায়। বাড়তি দুশো টাকা দিতে কার প্রাণই বা খুশিতে নেচে ওঠে!

পছিমা আকাশে সূর্য যখন আধাআধি ডোবে, সেই সময় ভূমিদাসেরা জমিন থেকে হালবয়েল তুলে অন্য দিনের মতোই খামার বাড়িতে ফিরতে থাকে। হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে ধর্মা দেখতে পায়, নীচের সেই পড়তি জমিটা এখন একেবারে ফাঁকা। ওরাঁও মুণ্ডাদের

একজনকেও কোথাও দেখা যায় না। এমন কি তাদের আস্তানার এক টুকরো বাঁশ বা এক ফালি চটও পড়ে নেই। ক্ষণস্থায়ী আস্তানার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে তারা চলে গেছে।

হালবয়েল জমা দেবার পর দৈনন্দিন কর্মসূচী অনুযায়ী সাবুই ঘাসের জঙ্গলে চলে যায় ধর্মা এবং কুশী। সেখান থেকে ঠিকাদারদের কাছে। তারপর মাস্টারজীকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে বেশ রাত করেই কালালীর পাশ দিয়ে যখন তারা জ্যৈষ্ঠের ফাঁকা শস্যক্ষেত্রে নামে সেই সময় আচমকা দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। ধর্মা এবং কুশী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। হৈ চৈ এবং চেঁচামেচিটা কোন দিক থেকে আসছে, বোঝার জন্য এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে চমকে ওঠে। গারুদিয়া বাজারের পেছন দিকে কোণাকুণি দক্ষিণের গোটা আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

চাপা ভয়ার্ত গলায় কুশী বলে ওঠে, 'আগ—'

ঠিক এই কথাটাই ভাবছিল ধর্মা। ঐ দিকটায় কোথাও আগুন লেগেছে। সে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হুঁ।'

'ওধারে গঞ্জুদের দোগো গাঁও—'

'হুঁ। চামার লোগনকা গাঁও ভি হ্যায়—'

ধর্মা এবং কুশী জানে ঐ দক্ষিণ দিকটায় পর পর খান কয়েক অচ্ছুৎদের গাঁ গা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। ধর্মা বলে, 'কাদের গাঁওয়ে আগ লাগল কে জানে।'

কুশী উত্তর দেয় না।

কতক্ষণ দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সুদূর রক্তবর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, নিজেরাই জানে না। হঠাৎ পায়ের শব্দে তাদের চমক লাগে। দেখতে পায়, সাত আটটা হট্টাকট্টা চেহারার লোক দৌড়ে আসছে। পাশ দিয়ে ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই সময় অন্ধকারেও চিনে ফেলে ধর্মারা। লোকগুলো রঘুনাথ সিংহের পোষা পহেলবান। তাদের হাতে লাঠি এবং মিট্টি তেলের টিন।

ওরাই কি তা হলে অচ্ছুৎদের গাঁ-গুলোতে আগুন লাগিয়ে এল? কথাটা মনে হতেই হাড়ের ভেতর পর্যন্ত ভয়ে হিম হয়ে যায় ধর্মাদের।

ওদের ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়েই আবার ফিরে আসে লোকগুলো। ধর্মা এবং কুশীকে ভয়ঙ্কর চোখে দেখতে দেখতে বলে, 'তোরা এই অন্ধেরাতে দাঁড়িয়ে কী করছিস?'

ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে ধর্মা বলে, 'মাস্টারজীর কাছে এসেছিলাম। এখন ঘরে ফিরছি।'

'আমাদের যে দেখেছিস, কাউকে বলবি না। যদি বলিস্ গলার নালিয়া ফেঁড়ে ফেলব।

জিভের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে ধর্মার। কোন রকমে গলার ভেতর থেকে দুটো মাত্র শব্দ বার করতে পারে, 'নায়, নায়—'

'হোঁশিয়ার!'

ধর্মা এবং কুশীকে সতর্ক করে দিয়ে চলে যায় লোকগুলো।

অনেক রাতে দোসাদটোলায় ফিরে ধর্মা এবং কুশী গণেরিকে কাঁচা ঘুম থেকে তুলে ফিসফিসিয়ে অচ্ছুৎদের গাঁয়ে আগুনের এবং রঘুনাথ সিংয়ের পহেলবানদের কথা জানায়।

সব শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ বসে থাকে গণেরি। তারপর বলে, 'যা দেখেছিস মুহ্ দিয়ে কখনও তা বার করবি না। হোঁশিয়ার।'

পরের দিন সকালে খামার বাড়িতে এসে তাজ্জব বনে যায় ধর্মারা। স্বয়ং রঘুনাথ সিংকে সেখানে দেখা যায়। একটা প্রকাণ্ড চেয়ারে তিনি বসে আছেন। তাঁর সামনে একান্ত বশংবদ ভঙ্গিতে শিঁরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে হিমগিরি। খানিকটা দূরে হাত জোড় করে বসে আছে কয়েক হাজার ধোবি, গঞ্জু এবং রবিদাস। গারুদিয়া বাজারের দক্ষিণে এদের গাঁগুলো কাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সমানে ওরা কেঁদে যাচ্ছে আর বলছে, 'মর গিয়া হুজৌর, মর গিয়া।'

ধর্মারা জানে না, ভোর রাত্তিরে গঞ্জু ধোবিদের লোক পাঠিয়ে খামারে ডাকিয়ে এনেছেন রঘুনাথ সিং। অপার স্নেহে মধুর গলায় তিনি বলেন, 'কেন মরবি! আমি আছি না? আমি তোদের নিজের লোক, মেরে আপনে। আমি তোদের গাঁ নতুন করে বানিয়ে দেব।' হিমগিরির দিকে ফিরে বলেন, 'এদের যার যা লাগে, বাঁশ, খড়, নয়া টিন—সব দেবে। আর হাঁ, দশ রোজ খোরাকির জন্য গেঁহু, বাজরা, মকাই, মিট্টি তেল, নিমুকও দেবে।'

অচ্ছুৎরা অভিভূত হয়ে যায়। কৃতজ্ঞ আপ্লুত মানুষগুলো রুদ্ধ গলায় বলতে থাকে, 'হুজৌর হামনিকো মা-বাপ। আপনার কিরপায় হামনিলোগ বঁচ যায়েগা। হুজৌর ভগোয়ান।'

যেন কতই বিব্রত হয়েছেন এমন ভঙ্গিতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'এ সব

বলতে নেই। মনে রাখিস আমি তোদের আপন জন—সিরিফ মেরে আপনে।'

ত্রিশ

ইদানীং ক'দিন ধরে ধর্মা ক্ষেতের কাজকর্ম সেরে কাঁধে একটা টাঙ্গি ফেলে চলে যাচ্ছে দূর জঙ্গলের ভেতরে। আর কুশীকে পাঠাচ্ছে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে—যদি মেয়েটা দু-চারটে বগেড়ি ধরে ঠিকাদারদের কাছে বেচে এক-আধটা টাকা আনতে পারে—এই আশায়। চিতার বাচ্চা ধরে দেবার জন্য আগাম টাকা নেওয়া আছে টিরকের কাছ থেকে। তা ছাড়া বাকী টাকাটা না পেলে জনমদাসের জীবন থেকে মুক্তি নেই। কাজেই চিতার বাচ্চা তাকে ধরে আনতেই হবে।

চিতা, লাকড়া, দাঁতাল শুয়োর এবং অন্য সব ভয়ানক জানোয়ারে ঠাসা ঐ জঙ্গলটায় একা একা ধর্মা যাক, এটা একেবারেই চায় না কুশী। সে বলে, 'ওহী জঙ্গলমে খতারনাক জানবর ছায়। নায় যা, নায় যা—'

কুশীর কথা কানে না তুলে আগে কয়েক বার ওখানে গেছে ধর্মা। এখনও যেতে লাগল। ধর্মা তাকে বোঝায়, একবার চিতার বাচ্চা দুটো সে যোগাড় করে আনুক। তারপর আর ওখানে যাবে না।

কুশীর মন খারাপ হয়ে যায়। তার মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়, ভীষণ ভয় পেয়েছে। ভীত গলায় কুশী বলে, 'তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।'

ধর্মা বোঝায়, তার জন্য ভয় নেই। হাতে যতক্ষণ টাঙ্গি রয়েছে, কোন জানোয়ারের সাধ্য নেই গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারে। বরং সঙ্গে একটা আওরত থাকলে অনেক ঝামেলা। আচমকা কোন জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়লে তখন নিজেকে বাঁচাবে, না কুশীকে বাঁচাবে!

রোজই সূর্যাস্তের সময় খামারে হাল-বয়েল জমা দিয়ে কাঁধে টাঙ্গি ফেলে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের স্তূপাকার বালির ওপর দিয়ে দৌড়ুতে থাকে ধর্মা। তার পেছন পেছন কুশী। বিশাল আকাশের তলায় ধু-ধু ফাঁকা বালির ডাঙার ওপর এক ক্রীতদাস যুবক আর এক ক্রীতদাসী যুবতী স্বাধীনতার দাম যোগাড় করার

জন্য রোজ এইভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

সাবুই ঘাসের বন পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে যায়। ওখানে পৌঁছুলেই ধর্মা বলে, 'ফাঁদে বগেড়ি পড়েছে কিনা ছাখ, আমি যাই।'

কুশী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখটা তার করুণ হয়ে যায়। আস্তে করে সে বলে, 'দের নায় করনা। তুরন্ত চলে আসবি।'

ধর্মা দাঁড়ায় না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই সে জঙ্গলে ঢুকতে চায়। জঙ্গলে রাত নামা আর অন্ধ হয়ে যাওয়া এক কথা। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই সে বলে, 'হুঁ, আসব—'

কুশী কিন্তু তক্ষুণি সাবুই ঘাসের বনে ফাঁদ দেখতে ঢোকে না, দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালির ওপর যতক্ষণ ধর্মাকে দেখা যায়, তাকিয়ে থাকে। শেষ বেলার আলোয় ধর্মার বিশাল কাঁধে টাঙ্গির ফলাটা জ্বলতে থাকে। দেখতে দেখতে মনে হয় ও পারবে, নিশ্চয়ই চিতার মুখ থেকে তার বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। পরমুহূর্তেই ভয় হয়, জঙ্গল বড় বুরা জায়গা আর চিতা ভীষণ খতারনাক জানোয়ার। আশায় এবং ভয়ে তার বুকের ভেতরটা দুলতে থাকে।

দক্ষিণ কোয়েলের শুকনো খাত অনেক দূরে যেখানে বাঁক ঘুরেছে একসময় সেখানে অদৃশ্য হয়ে যায় ধর্মা। তখন কুশী বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'হো রামজী, হো ভগোয়ান, তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—' ধর্মার যাতে কোনরকম ক্ষতিটতি না হয় সে জন্য ঈশ্বর রামচন্দ্রজীর কাছে তার এই প্রার্থনা। নিজের মনে ধর্মার মঙ্গল কামনা করতে করতে সে ঘাসবনে ঢুকে যায়।

ওদিকে আরশির মতো জলের ধারে শাল-পরাস-কড়াইয়া আর কেঁদের জঙ্গলে ধর্মা গিয়ে যখন ঢোকে তখন সন্ধ্যে নামতে শুরু করে। কান খরগোশের মতো খাড়া করে সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে পা টিপে টিপে জঙ্গলের গভীরে যেতে থাকে সে।

দিন তিনেক এইভাবে কেটে যায়। এ ক'দিনে জঙ্গলে একটা লাকড়া, গোটা দুই দাঁতাল, আখছার হরিণ খরগোশ ছাড়া চিতা দূরে থাক, তার গায়ের একটা ফুটকিও চোখে পড়েনি। যা-ও দু-একটা জন্তু-জানোয়ার তার চোখে পড়েছে তা দূর থেকে। তবে একদিন সাপের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ধর্মা। টাঙ্গির কোপে সেটার মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়েছিল সে।

জঙ্গলে চিতার খোঁজে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ক্লান্তিতে শরীর যখন টলতে থাকে সেই সময় বেরিয়ে আসে ধর্মা। দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত ধরে আবার সে ফিরে যায়।

কোয়েলের বালি ভাঙতে ভাঙতে সাবুই ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা আসার পর রোজই ধর্মার চোখে পড়ে, হাইওয়ের কাছে উঁচু বালির স্তূপের ওপর কুশী দাঁড়িয়ে আছে। রোজই তার জন্য ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটা। রাত তখন নিঝুম হয়ে যায়, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ধু-ধু শস্যক্ষেত্রে, আদিগন্ত মাঠ, ঝাপসা আকাশ, সব একেবারে ফাঁকা। সুবিশাল আকাশের তলায় আবছা চাঁদের আলো গায়ে মেখে যে মানবীটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে দেখতে স্বপ্নের কোন পরীর মতো মনে হয়। হঠাৎ চিরকালের ক্রীতদাস ধর্মা আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে তার দিকে ছুটতে থাকে।

একত্রিশ

নির্বাচনের আর মাত্র চারটে দিন বাকী। গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের তিরিশ বত্রিশটা গাঁ তিন চুনাওপ্রার্থীর ফেস্টুনে পোস্টারে সেজে উঠেছে। লাল শালুতে নিজের নিজের প্রতীক চিহ্ন আঁকিয়ে সুখন রবিদাস, প্রতিভা সহায় এবং রঘুনাথ সিং চারদিকে টাঙিয়ে দিয়েছেন। এমন কি হাইওয়ের পরাস বা কড়াইয়া গাছগুলোও রেহাই পায় নি ; আঠা দিয়ে সেগুলোর গায়েও পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, চুনাওর ব্যাপারটা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

আজ এখনও ভালো করে ভোর হয়নি। আকাশে আবছা আবছা আলোর ছোপ ধরেছে মাত্র। এরই মধ্যে কিন্তু দোসাদটোলাটা জেগে উঠেছে। খানিকটা মাড়োয়া সেদ্ধ বা মাড়ভাত্তা কিম্বা মকাই ভাজা খেয়ে এখনই তাদের ছুটতে হবে খামারবাড়িতে, সেখান থেকে ক্ষেতিতে।

হঠাৎ আধবুড়ো গণেরি সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠিল, 'হো রামজী আজ কা হৈল ? কা হৈল আজ ? আঁখ সচমুচ দেখতা ছায় তো ?'

গণেরির চারপাশে যারা ছিল তারা সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল, অ্যাঁ কী হল ?'

'ওহী দেখ—' গণেরি রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সবাই সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। খানিকক্ষণ কারো গলা দিয়ে একটু আওয়াজও বেরুল না। আকাশ থেকে চাঁদ সুরয নেমে এলেও কেউ এতটা অবাক হত না। স্বয়ং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং পায়ে হেঁটে তাদের মতো এই অচ্ছুৎ তুসাদদের মহল্লায় আসছেন। এই নিয়ে দু'বার তিনি এখানে এলেন। রঘুনাথ সিং তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে একবারও এ তল্লাট মাড়াননি। এই চুনাওর সময়ে পনের দিনের মধ্যে দু-দু'বার এলেন। ভোটের জন্য তাঁর হয়ে যারা খাটছে তারা তো সঙ্গে রয়েছেই। তা ছাড়াও রয়েছে তাঁর একান্ত বশংবদ কুত্তার দল। হিমগিরিনন্দন, আজীবচাঁদ, রামলছমন—এমনি অনেকে।

ধর্মাদের চোদ্দ পুরুষে কখনও যা ঘটে নি, এখন তা বার বার ঘটছে। সুরয কি আজকাল পছিমা আকাশে উঠতে শুরু করেছে! বড়ে সরকার, ভূমিদাস অচ্ছুৎদের পাড়ায় আজ রাত পোহাতে না পোহাতে আসবেন, বহুদর্শী গণেরিও তা ভাবতে পারে নি।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকার পর গোটা দোসাদটোলাটা প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়ে সরকার আ গৈল—'

যারা ঘরের ভেতর ছিল তারাও দৌড়ে বেরিয়ে আসে। তারপর রঘুনাথ সিংয়ের জন্য কে যে কী করবে, কোথায় বসাবে ঠিক করে উঠতে পারে না। বড়ে সরকারের পা রাখার জন্য তারা বুক পর্যন্ত পেতে দিতে পারে। যদিও নিজের হাতে তাঁর লাড্ডু বিলি করার একটা দৃষ্টান্ত আছে তবু এই ভোরবেলা তাদের মতো অচ্ছুৎদের ছুঁলে যদি সরকারের পাপ লাগে তাই ভরসা করে সেটা আর ওরা পেরে ওঠে না।

এর মধ্যে গিধনী সাহস করে তার ঘর থেকে একটা হাতলভাঙা পুরনো চেয়ার বার করে এনে পেতে দিয়েছে। এই ভূমিদাসদের মহল্লায় এই একখানা আস্ত চেয়ারই রয়েছে। এর চাইতে ব্যক্তিগত দামী সম্পত্তি আর কারো নেই।

যদিও আগে রঘুনাথ সিং নিজেকে তাদের আপনজন বলে বার কয়েক ঘোষণা করেছেন তবু সবাই ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করে দূরে

দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের ধারণা ছিল, বড়ে সরকার গিধনীর চেয়ারটা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুঁয়েও দেখবেন না। কিন্তু সবাইকে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে তিনি চেয়ারটায় বসেই পড়েন। হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'অনেকদিন ভেবেছি, তোদের কাছে মাঝে মাঝে আসব, গল্প করব। আমি তো তোদেরই লোক। লেকেন নানা ঝামেলায় আসতে পারি না।'

ধর্মারা কি কথাগুলো ঠিক শুনছে? তারা কেউ কিছু বলে না। হাতজোড় করে আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে।

রঘুনাথ সিং এবার জনে জনে ডেকে কে কেমন আছে, কার কী সুবিধা-অসুবিধা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সবার খবর নেবার পর বললেন, 'এবার তোদের একটা ভাল খবর দিচ্ছি।'

ধর্মারা আধফোটা গলায় বলে, 'হুজৌর—'

রঘুনাথ সিং বলতে লাগলেন, 'আজ থেকে তিন রোজ তোদের কাম করতে হবে না। স্রিফ খাও, পীও আউর আরাম কর। চাওর (চাল), গেঁহু, ঘিউ, মিরচি, আলু—সব কিছু আমার লোক দিয়ে যাবে। বহোত রোজ তোরা আমার ক্ষেতিতে কাম করছিস। এই তিন রোজ তোদের বিলকুল আরাম আউর আরাম।'

বলছেন কী রঘুনাথ সিং? তিনি যা বলছেন তা বুঝ-সমঝ করে বলছেন? না কি তারাই ভুলটুল শুনছে?

এদিকে রঘুনাথ সিংয়ের এক নম্বর পা-চাটা কুত্তা আজীবচাঁদ আচমকা যেন ক্ষেপে ওঠে, 'হোয় হোয় হোয়, এ্যায়সা বাত কো-ই কভি নায় শুনা! রামচন্দজী খুদ স্বরগসে উতারকে আয়ে রে। হোয়—হোয়—হোয়—'

হাতের ইসারায় আজীবচাঁদকে থামিয়ে দিয়ে রঘুনাথ সিং আবার বলেন, 'কাল থেকে তিন রাত আমার কোঠির সামনে নৌটঙ্কীর আসর বসবে। পুরা রাত ধরে চলবে। তোরা সবাই যাবি কিন্তু—'

পুরো তিনদিন কাজ করতে হবে না অথচ ভালো ভালো খাদ্যবস্তু আসবে বড়ে সরকারের খামার থেকে। শুধু তাই না, তিন রাত তাদের নৌটঙ্কীও দেখানো হবে। চোদ্দ পুরুষে এমন ঘটনা গারুদিয়া তালুকের দোসাদদের জীবনে আর কখনও ঘটে নি।

আজীবচাঁদ ফের চিৎকার করে, 'হোয় হোয় হোয়, রামরাজ জরুর আ যায়গা, জরুর আ যায়গা—'

রঘুনাথ সিং আর বসলেন না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'তা হলে আজ আমরা যাই। তোরা নৌটঙ্কীতে যাস কিন্তু—

তাঁর সঙ্গের সেই চুনাওকর্মী ছোকরারা চেঁচিয়ে উঠল :

'রঘুনাথ সিং—'

'অমর রহে—'

'রঘুনাথ সিং—'

'অমর রহে—'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো—'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো—'

চিৎকারটা থামলে রঘুনাথ সিং ধর্মাদের বলেন, 'তোরা তো সবাই জানিস, আমি এবার ভোটে নেমেছি।'

ধর্মারা ঘাড় কাত করে দেয়, 'জী বড়ে সরকার। এই জন্মে তো সেদিন আমরা লাড্ডুয়া খেলাম।'

'আমি তোদের লোক, তোদের আপনা আদমী। ভোটের কাগজে হাতী-মার্কায় মোহর মারবি। তা হলে আমি ভোট পাব। হাতী মনে রাখবি।'

'জী সরকার—' সবাই আবার ঘাড় কাত করে।

আজীবচাঁদ ঘুরে ঘুরে চিৎকার করতে থাকে, 'হোয় হোয়, রামরাজ আ যায়গা রে, রামরাজ আ যায়গা। শুন তুলোগন, শুনকে লে। তোদের ভালাইর জন্মে সবাই বড়ে সরকারকে ভোট দিবি—'

বুধেরি ঢোঁড়াই বুধনী কুঁদরী—সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'জরুর দেব, জরুর দেব।'

রঘুনাথ সিং হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'চলি রে, গাঁওয়ে গাঁওয়ে ঘুরে সবাইকে নৌটঙ্কী শোনার নেমন্তন্ন করতে হবে।'

রঘুনাথ সিং তাঁর দলবল নিয়ে চলে যাবার পর আচমকা ধর্মার মনে পড়ে গেল, এই তিনটে দিন ক্ষেতির কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে ভালই হয়েছে। যেভাবেই হোক, যদি পুরো তিনটে দিনও দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে কেঁদ শাল পরাস সাগুয়ানের জঙ্গলে কাটাতে হয়, কাটিয়ে চিতার জোড়া বাচ্চা যোগাড় করবে। এর চাইতে বড় সুযোগ এ জীবনে আর আসবে কিনা সন্দেহ। রঘুনাথ সিং তিনদিনের ছুটি

দিয়ে মুক্তির পুরো ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন সব কিছু তার নিজের ওপর নির্ভর করছে।

রঘুনাথ সিং চলে যাবার ঘণ্টা তিনেক পর তাঁর খামার বাড়ি থেকে দু-তিনটে লোক ভয়েসের গাড়িতে চাপিয়ে চাল-ডাল-গম মকাই, এমন কি ঘি পর্যন্ত দিয়ে গেল।

অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের মহল্লায় এখন সুখের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এত সুখ আগে আর তারা কখনও তো পায়ই নি, তাদের বাপ নানা, নানার বাপ, নানার বাপের বাপ, তার বাপের বাপ পর্যন্ত ওপরের দিকের কয়েক পুরুষে কেউ কখনও পেয়েছে বলে শোনা যায় নি। আজীবচাঁদ যে রামরাজের কথা বলে গেল তবে কি এই গারুদিয়া তালুকে সত্যি সত্যি তাই নেমে এসেছে!

গোটা পাড়া জুড়ে এখন ঢিলেঢালা আর আসস্তের ভাব। মেয়েরা রান্নাবান্নার তোড়জোড় করছে। পুরুষেরা চৌপায়ায় বসে বসে খৈনি বানাতে বানাতে রঘুনাথ সিংয়ের কথাই হাজার বার করে বলতে থাকে। বড়ে সরকারের দিল রাতারাতি কি করে যে এরকম দরাজ হয়ে গেল তা ভেবে অবাক হয়ে যায়। সবই ভগোয়ান রামচন্দজীকা কিরপা।

কেউ কেউ এরই মধ্যে গলা পর্যন্ত মহুয়া গিলে এসে মাতোয়ালা হয়ে বসে আছে কিংবা জড়ানো গলায় চেঁচাচ্ছে।

ঠিক দুপুরবেলা সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর, সেই সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে কোমরে আধ হাত লম্বা বাঁকানো ছুরি গুঁজে আর কাঁধে টাঙ্গি ফেলে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। তার সঙ্গে সঙ্গে কুশীও যায়। দুপুরের জ্বলন্ত রোদে টাঙ্গির ফলা ঝলকাতে থাকে।

এক সময় ওরা হাইওয়েতে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার কাছে এসে পড়ল। বড় সড়কের বাঁ দিকে যতদূর চোখ যায় একেবারে ধু ধু দিগন্ত পর্যন্ত রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতগুলো আজ একেবারে ফাঁকা। কোথাও লোকজন চোখে পড়ছে না। সব কিছু নির্জন আর শূন্য। আজ থেকে পুরো তিনটে দিন রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে হালবয়েল পড়বে না। তারা তো মাঠে নামেই নি, এমন কি সেই মরসুমী ওরাঁও আর মুণ্ডা কিষাণগুলোকেও তিনদিনের জন্য ছুটি দিয়েছেন রঘুনাথ সিং।

তবে হাইওয়ের ওপারে মিশিরলালজীর জমিতে যথারীতি মিশিনের লাঙল চলছে। বিশাল প্রান্তর জুড়ে ভট ভট শব্দ উঠছে।

হাইওয়ে থেকে ধর্মা আর কুশী অন্ত দিনের মতো কোয়েলের মরা খাতে নেমে এল। একসঙ্গে সাবুই ঘাসের জঙ্গল পর্যন্ত তুজনে এসে কুশী দাঁড়িয়ে পড়ল আর ধর্মা বালির ডাঙার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে।

আগে থেকেই ওদের কথা হয়ে আছে, এ ক'দিন সাবুই ঘাসের বন পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে আসবে। কুশী এখানে ফাঁদ পেতে পাখি ধরবে। আর একা একাই ধর্মা চলে যাবে আরশির মতো সেই স্বচ্ছ জলের পাড়ে শাল-কেঁদের জঙ্গলে।

পেছন থেকে কুশী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুরন্ত লৌটনা। আমার বহোত ডর লাগছে।'

ধর্মা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'তুরন্তই আসব। ডর কীসের?' কাঁধের সেই ধারাল টাঙ্গির ফলাটা দেখিয়ে বলে, 'এটা তো আছে। জানবর যত খতারনাক হোক, আমার চামড়া ছুঁতে পারবে না।' কথাটা আগেও আরো কয়েক বার বলেছে সে। কিন্তু ডরপুক কুশীটার ভয় কিছুতেই যায় না।

কুশী এবার বলে, 'বড়ে সরকারের কোঠিতে আন্ধেরা নামলেই নওটঙ্কি বসবে—'

'তুই নওটঙ্কি শুনতে চলে যাস। আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকিস না।'

'নায় নায়। তুই না এলে আমি যাব না।'

'একেলী এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি না কুশী। হাইওয়ে দিয়ে বহোত আদমী যায়। তাদের মধ্যে খতারনাক বদমাসও রয়েছে। বুরা মতলব নিয়ে কেউ চলে আসতে পারে। তুই একেলী আওরত, তাদের ঠেকাতে পারবি না।'

কুশী ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্মার কথামতো চলে যাবার ইচ্ছা তার নেই।

ধর্মা আবার বলে, 'বগেড়ি মিললে ঠিকাদার সাবদের কাছে বেচে বড়ে সরকারের কোঠিতে নওটঙ্কি শুনতে চলে যাবি। আমি সিধা ওখানে যাব।' বলে চলে যায় সে।

আগের সব দিনের মতো যতক্ষণ নদীর ধুধু বাঁকে ধর্মা আর তার টাঙ্গির ফলাটা দেখা গেল ততক্ষণ তাকিয়ে রইল কুশী। তারপর সাবুই ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বিকেলের আগে আগে শাল-কেঁদের জঙ্গলে পৌঁছে গেল ধর্মা। খুব সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে ক্রমশ আরো গভীরে চলে যেতে লাগল।

আজও চিতার বাচ্চা খুঁজতে খুঁজতে তার চোখে পড়ে, অগুনতি হরিণ লাফিয়ে চলেছে। একেবারে ঝুনঝুনকে। গোটা তিনেক বন-বেড়াল, একটা শজারুও দেখতে পেল। অনেক দূরে দেখা গেল, একটা দাঁতাল শুয়োর ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ঘন ঝোপের দিকে চলে যাচ্ছে।

বনবেড়াল, হরিণ, শুয়োর ইত্যাদি সম্পর্কে ধর্মার কোনরকম উৎসাহ নেই। তার ছুরির তাক মারাত্মক। ইচ্ছা করলে দূর থেকে ছুঁড়ে কোন একটা জানোয়ারকে বিঁধতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে শক্তি বা সময় নষ্ট করতে সে চায় না। তার লক্ষ্য হলো চিতার বাচ্চা।

ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ডোবার সময় হয়ে গেল। জঙ্গলের ছায়া দ্রুত ঘন হয়ে আসতে লাগল। এরপর এখানে থাকা খুবই বিপজ্জনক। কেননা অন্ধকারে পেছন থেকে কিংবা মাথার ওপর গাছের ডাল থেকে যে কোন জন্তু আচমকা ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

একসময় ধর্মা জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। ছুটির একটা দিন কেটে যায়। অথচ কোন কাজই হল না। ফলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আসে তার।

এখনও অবশ্য হাতে পুরো দুটো দিন রয়েছে। কাল আরো আগে আগে জঙ্গলে চলে আসতে হবে।

আজ আর ধর্মার জন্য সাবুই ঘাসের জঙ্গলের কাছে কিম্বা হাইওয়ের ধারে উঁচু বালির স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে নি কুশী। ধর্মা একা একাই দোসাদটোলায় ফিরে এল।

এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ভরা পূর্ণিমার পর অমাবস্যার পক্ষ চলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। চাঁদ উঠবে আরো অনেকক্ষণ পর; সেই মাঝরাতের কাছাকাছি সময়। এখনকার চাঁদ বড় রুগ্ন। তার গায়ে যেটুকু আলো আছে এই গারুদিয়া তালুক পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। ফলে এ অঞ্চলের মাঠ প্রান্তর, দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের স্তূপাকার বালি, গাঁও-গঞ্জ-বাজার, সব অন্ধকারে ডুবে থাকে।

দোসাদদের পাড়াটা এখন একেবারে ফাঁকা। কোন ঘরেই কেউ

নেই ; এলাকা খালি করে সবাই রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে নৌটঙ্কী শুনতে গেছে।

নিজেদের ঘরে ঢুকে ছুরি আর টাঙ্গি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন বার করে ধরিয়ে নেয় ধর্মা। তারপর পরনের ঘাম-ভেজা জবজবে হাফ প্যান্ট আর জামাটা ছেড়ে ডোরাকাটা পাজামা আর লাল কুর্তা গায়ে চড়িয়ে রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলির দিকে যায়।

বড়ে সরকারের মকানের সামনে যেন দশেরা পরবের মেলা বসে গেছে। গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের কোন গাঁওয়ের কোন মানুষই আজ আর বুঝি ঘরে নেই। সব ঝেঁটিয়ে এখানে চলে এসেছে।

সেদিন ফাগুরামের বেহুঁশ দেহ কাঁধে করে আনার পর এখানে আর আসেনি ধর্মা। এর মধ্যে নৌটঙ্কীর জন্য কবে যে বিশাল শামিয়ানা খাটানো হয়েছিল সে টের পায় নি।

শামিয়ানার তলায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মাঝখানে উঁচু মঞ্চে নৌটঙ্কীর আসর বসেছে। প্রচুর জোরালো আলো জ্বলছে গোটা শামিয়ানা জুড়ে।

ভিড়ের ভেতর খুঁজে খুঁজে কুশীকে ঠিক বার করে ফেলে ধর্মা। চাপবাঁধা মানুষের মধ্যে রাস্তা করে করে তার গা ঘেঁষে বসে পড়ে।

কুশী আজ সস্তা সাবানে কাচা একটা খাটো হলুদ শাড়ি আর লাল জামা পরেছে। উঁচু করে চুল বেঁধে গুঁজে দিয়েছে বুনো ফুল ; কপালে দিয়েছে কাচপোকার টিপ।

কুশী জিজ্ঞেস করে, 'কখন ফিরলি ?'

ধর্মা বলে, 'এই তো। ঘরে টাঙি রেখেই চলে এসেছি।'

'চিতার বাচ্চা মিলল ?'

'নায়। মুল্লুক ছেড়ে সব চিতা ভেগেছে। এত ঢুঁড়লাম ; একটাও চোখে পড়ল না। কাল সুবে নিদ ছুটলেই জঙ্গলে চলে যাব।'

এই সময় হারমোনিয়াম তবলা আর ফ্লুট একসঙ্গে বেজে উঠল। তারপর চড়া মিঠে সুরে কোন আওরতের গলা কানে এল। রঘুনাথ সিংয়ের লোকেরা আসরে মাইকের ব্যবস্থা করেছে যাতে শামিয়ানার শেষ মাথার শ্রোতাও শুনতে পায়।

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে আসরের দিকে তাকায় ধর্মারা। প্রচুর সাজ-গোজ করে, গিল্টির গয়না পরে নৌটঙ্কী দলের পরীর মতো ছোকরিটা গলায় গিটকিরি খেলিয়ে গান ধরেছে। চোখমুখের কিবা ঠমক তার! গোটা শামিয়ানা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে।

বালমোয়া ঘর না আয়ে রে
ওমরিয়া বীতী যায়ে রে
যো ম্যায় ইতনা জানতী
প্রীত কিয়ে দুখ হোয়
নগর ঢিঁঢড়ো (ঢেঁড়া) পিটতী
প্রীত না করিয়ো কোই
কোঠা উপর কোঠ লী
উসমে কালা নাগ
ঝরোখা পরকে লায়লী পুকারে
মজনু ডসিয়ো (কামড়ানো) না যায়
নদী কিনারে ধুঁয়া উঠৎ ছায়
ম্যায় জানু কুছ হোয়
কোঠা পর লায়লী পুকারে
মজনু জ্বলিয়ো যায়—

ধর্মা বলে, 'বহোত বঢ়িয়া গানা—'

গান শুনতে শুনতে কুশী অন্যমনস্কের মতো বলে, 'হুঁ, ফরবিশগনকা (ফরবেশগঞ্জকা) নওটঙ্কী –'

'উসি লিয়ে ইতনা বঢ়িয়া। দুনিয়া ফরবিশগনের নওটঙ্কীর নাম জানে।'

গান চলতে লাগল।

শুধু ফরবেশগঞ্জেরই না, আরারিয়া ঘাট, পুর্ণিয়া, ভাগলপুর—এমনি নানা জায়গা থেকে নৌটঙ্কীর দল আনিয়েছেন রঘুনাথ সিং। একেক রাত একেক দল গাইবে।

সারা রাত নৌটঙ্কী শুনে ভোরবেলা ঢুলতে ঢুলতে ধর্মারা দোসাদ-টোলায় ফিরে আসে।

রাতভর গান শোনার ফল হয় এই, পরের দিন সকালবেলা চিতার

বাচ্চার খোঁজে জঙ্গলে যেতে পারে না ধর্মা। রঘুনাথ সিংয়ের মকান থেকে মহল্লায় ফিরেই শুয়ে পড়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল, তুপুর হয়ে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে ধর্মা দেখল গোটা দোসাদপাড়া বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মা-বাপও পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। ডাকাডাকি করে তাদের আর জাগালো না ধর্মা। তাড়াতাড়ি কুয়োর জলে চানটান করে বাসি কুঁদরুর তরকারি দিয়ে খানকতক বাজরার রুটি খেয়ে কোমরে ছুরি গুঁজে আর কাঁধে টাঙ্গি ফেলে জঙ্গলে ছোটে সে।

কি আশ্চর্য, পুরো দোসাদপাড়াটা ঘুমোলেও কুশী ঠিক জেগে আছে। তক্কে-তক্কে ছিল মেয়েটা। ধর্মা জঙ্গলের রাস্তা ধরতেই সে তার পিছু নেয়। তারপর অন্যদিনের মতো সাবুই ঘাসের বনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে আর গনগনে আকাশের তলা দিয়ে ধর্মা চলে যায় শাল-কেঁদের জঙ্গলের দিকে।

আজও জঙ্গলের ভেতর অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল ধর্মা কিন্তু না, চিতার বাচ্চা পাওয়া গেল না। সূর্যাস্তের সময় বনভূমিতে ছায়া যখন ঘন হয়ে আসে তখন বেরিয়ে এল সে। আগের দিনের মতোই ফাঁকা দোসাদ-টোলায় ফিরে, ছুরি-টাঙ্গি রেখে, জামাকাপড় বদলে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের মকানে নৌটঙ্কী শুনতে চলে গেল। শামিয়ানার তলায় গিজগিজে ভিড়ের ভেতর কালকের মতোই কুশীকে খুঁজে বার করে তার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর সারারাত আরা জেলার নামকরা দামী দলের মনমাতানো গান শুনল।

মেরে গোরে বদন পর সভী রাজী
সাসুভি রাজী সসুর ভি রাজী
বালমা আনাড়ী, নেহী রাজী
মেরে গোরে বদন পর সভী রাজী
ভাসুরজী রাজী, ননদভি রাজী
দেওরা বেদরদী নেহী রাজী
মেরে গোরে বদন পর সভী রাজী—

ভোর বেলা যখন ধর্মারা ঘরে ফেরে সবার চোখে ঘুমে জুড়ে আসছে।

এইভাবে পর পর তুটো দিন বরবাদ হয়ে গেল। বাকী রইল মোটে একটা দিন।

বত্রিশ

আজ ছুটির শেষ দিন। আবার কাল থেকে হাল বয়েল নিয়ে গোটা দোসাদপাড়াকে রঘুনাথ সিংয়ের ক্ষেতিতে নামতে হবে। কাজেই যা করার আজকের ভেতরেই করে ফেলতে হবে ধর্মাকে। কারণ কাল থেকে ক্ষেতে নামলে তার হাতে কতটুকু আর সময় থাকবে! সারাদিন জমি চষার পর জঙ্গলে যেতে যেতেই তো রাত নেমে যাবে। খতরনাক জন্তু জানোয়ারে বোঝাই শাল-কেঁদের ঐ বনভূমি খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া হুট করে এক-আধদিন ক্ষেতির কাজ ফেলে যে জঙ্গলে যাবে তার উপায়ও নেই। বারিষ নামার আগে জমি পুরো চষে ফেলতেই হবে। চুনাও বলে এখন বড়ে সরকার বা তাঁর লোকেরা খাতিরদারি করছে। কিন্তু চুনাও তো মাসভর সালভর থাকবে না? তখন?

আজ যদি সারারাত জঙ্গলে কাটাতেও হয় তাই কাটাবে ধর্মা। মোট কথা, দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ের ঐ বনভূমি তোলপাড় করে চিতার বাচ্চা তাকে আনতেই হবে।

আগের দু দিনের মতো আজও দুপুরবেলা ঘুম ভাঙল ধর্মার। তবে মা-বাপ এখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের না জাগিয়ে গতকাল এবং পরশুর মতো চান করে টাঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। কুশী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়ার মতো মেয়েটা তার সঙ্গে চলতে থাকে।

হাইওয়ে থেকে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত ধরে চলতে চলতে হঠাৎ ধর্মাদের চোখে পড়ে, ধুলো উড়িয়ে বড়ে সরকারের ছাদখোলা প্রকাণ্ড মোটরটা বিজুরি তালুকের দিক থেকে আসছে। কৌতূহলের বশে ধর্মা আর কুশী দাঁড়িয়ে যায়।

মোটরটা যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন দেখা যায়, ভেতরে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের পাশাপাশি বিজুরি তালুকের মালিক মিশিরলালজী এবং তাঁদের আরো কয়েকজন প্যারা দোস্ত বসে আছেন। ধর্মারা বুঝতে পারে, মিশিরলালজীদের আনবার জন্যই রঘুনাথ সিং বিজুরি তালুকে গিয়েছিলেন। ধর্মারা যা জানে না তা এইরকম।

রঘুনাথ সিংয়ের নির্বাচনী এলাকা গারুদিয়া এবং বিজুরি—এই দুই তালুকের ত্রিশ বত্রিশটা গ্রাম জুড়ে পড়েছে। গারুদিয়া তালুকের গাঁওবালাদের ভোট সম্পর্কে রঘুনাথ মোটামুটি দুশ্চিন্তামুক্ত। কিন্তু বিজুরির ভোট সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা না। তবে মিশিরলালজী যদি তাঁর হয়ে একবার আঙুল তোলেন বকরীর পালের মতো ওখানকার সবাই গিয়ে ভোটের কাগজে মোহর মেরে আসবে। মিশিরলালজীকে একটু খুশী করার জন্য তিনি আজ তাঁকে গারুদিয়ায় তোয়াজ করে নিয়ে এসেছেন।

মিশিরলালজী সম্পর্কে এখানে কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে। ষাটের কাছাকাছি বয়েস হলেও আজ প্রচুর সাজগোজ করে এসেছেন তিনি। কাঁচা-পাকা চুল পাট করে মাথার বাঁ দিকে ফেলে রাখা হয়েছে। ডান দিকে সিঁথি। প্রচুর ভয়সা ঘি আর দুধ-মাখন-শক্কর খাওয়া শরীরে এখন মখমলের পাঞ্জাবী আর ফিনফিনে ধুতি। দুহাতে কম করে আটটা আংটি। তার মধ্যে একটা হীরে-বসানো, একটা মুক্তো-বসানো, একটা চুনী আর একটা পান্না-বসানো। তাঁর পাঞ্জাবীর বোতামগুলোতেও হীরে সেট-করা, কানে সোনার মাকড়ি। পায়ে কারুকাজ-করা লক্ষ্ণৌর নাগরা। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ সেটা প্রমাণ করার জন্য কপালে এবং কানের লতিতে চন্দনের ছাপ মারা রয়েছে। মলমলের পাঞ্জাবীর তলায় এক গোছা মোটা পৈতাও দেখা যাচ্ছে।

এ অঞ্চলে গারুদিয়া বিজুরি এবং চারপাশের দশ বিশটা তালুকের সবাই তাকে বলে 'চরণ ছুঁ জমিন্দার'। জমিদারিপ্রথা উঠে গেলেও ঐ নামটা মিশিরলালজীর গায়ে আঠার মতো আটকে আছে।

এছাড়াও চরণ-ছুঁ জমিদারের অন্য কারণে খ্যাতি আছে। চারপাশের দশ-বিশটা তালুকের সব মানুষ জানে এই লোকটার ভীষণ আওরতের দোষ। রোজ রাতে একটা না একটা ছুকরিকে তাঁর কাছে যোগান দিতেই হয়। মেয়েমানুষের ব্যাপারে মিশিরলালজীর বাছবিচার নেই। ওরাঁও-সাঁওতাল, মুণ্ডা-ভুঁইহার, ধোবি-দোসাদ—জল-চল জল-অচল অচ্ছুৎ যাই-হোক না, যুবতী মেয়ে পেলেই তিনি খুশী। এজন্য বিজুরি তালুকের অল্প বয়সের ছুকরিরা সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। মিশিরলালজীর লোকেরা কখন যে কাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে, কেউ জানে না। অবশ্য এজন্য তিনি আওরতের ন্যায্য দামও দিয়ে থাকেন।

বড়ে সরকারের ছাদখোলা প্রকাণ্ড গাড়িটা সামনে দিয়ে চলে গেল।

সেটা দেখতে দেখতে ধর্মা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আওরতখোর (মেয়েখোর) লাকড়াটা এখানে এল কেন ? আমার ডর লাগছে। হোঁশিয়ার থাকবি কুশী।'

কুশী বলে, 'হুঁ হুঁ, থাকব। তুই ডরাস না। এখন চল—'

আবার হাঁটতে শুরু করল দুজনে। কিছুক্ষণ পর টাঙ্গি কাঁধে করে জঙ্গলের দিকে চলে যায় ধর্মা আর সাবুই ঘাসের বনে ঢোকে কুশী।

কাল বিকেলেই ফাঁদ পেতে রেখে গিয়েছিল কুশী। আজ এসে দেখল সাত-আটটা বগেড়ি পড়ে আছে।

পাখিগুলোকে ফাঁদ থেকে বার করে পায়ে দড়ি বেঁধে বালির ওপর ফেলে রাখে কুশী। তারপর নতুন করে ফাঁদ পেতে পাখিগুলো হাতে ঝুলিয়ে নেয়। এখন সে যাবে ঠিকাদারদের কাছে।

ধর্মা সঙ্গে থাকে না। তাই আজকাল আর বালি খুঁড়ে পয়সার কৌটো বার করে মাস্টারজীর কাছে গোনাতে যায় না কুশী। একলা মেয়ে সে, কেউ তাকে মেরেধরে কৌটোটা লুটে নিতে পারে। দুনিয়ায় বদমাস দুশমনের তো অভাব নেই।

ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে যে ক'টা পয়সা পাওয়া যায় তা ইদানীং নিজের ঘরে নিয়ে লুকিয়ে রাখে কুশী। ধর্মা জঙ্গল থেকে চিতার বাচ্চা ধরে আনার পর পয়সাগুলো তার হাতে তুলে দেবে।

ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে আজ আড়াইটা টাকা পাওয়া গেল। পেটের কাছের শাড়িতে টাকাটা গিঁট দিয়ে বেঁধে গুঁজে রাখল কুশী। তারপর যখন নিজেদের মহল্লায় ফিরে এল, বিকেল হয়ে গেছে।

দোসাদদের পাড়ায়, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে সাজগোজের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। সন্ধ্যে হলেই তারা নৌটঙ্কী শুনতে যাবে।

গরীবের চাইতেও গরীব ভূমিদাস অচ্ছুৎদের ঘরে সাজসজ্জার কী উপকরণই বা থাকতে পারে! সাজি-মাটি দিয়ে চুল ঘষে ক্ষারে-কাচা শাড়ি-জামা পরে, চোখে ঘরে-পাতা কাজল টেনে, চুলে ফুল গুঁজে নেওয়া—এই তো সাজের বহর। এটুকুর জন্যই বিকেল থেকে তারা শীশা, কাকুই আর ধোয়া শাড়ি-জামা নিয়ে বসে গেছে।

কুশী আসতেই তাদের উল্টোদিকের বারান্দা থেকে গিধনী চেঁচিয়ে

উঠল. 'তুরন্ত সেজে নে ; সূরয ডুবতে বসেছে।'

কুশী বলে, 'এখনও অনেক বেলা আছে। নওটঙ্কী শুরু হবে তো আন্ধেরা নামার পর।'

কুশী নিজেদের ঘরে ঢুকে কোমরের গিঁট খুলে সেই আড়াই টাকা বার করে বালিশের খোলের ভেতর পুরে রাখল। তারপর বাইরের বারান্দায় এসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। সেই দুপুর থেকে ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে একবার সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গেছে সে, সেখান থেকে ঠিকাদারদের কাছে। তারপর ঘরে ফিরেছে। এখন খানিকটা না জিরিয়ে নিলে এক পাও হাঁটতে পারবে না।

দোসাদটোলার যুবতী মেয়েরা সবাই দল বেঁধে রোজ নৌটঙ্কী দেখতে যায়। তাদের ভয়, দেরি করে গেলে আসরের সামনের দিকে জায়গা পাওয়া যাবে না। সূরয ডুববার অনেক আগেই এ-গাঁও সে-গাঁও থেকে গাদা গাদা লোক এসে ভালো ভালো জায়গাগুলো দখল করে বসে থাকবে। তাই সকলেরই আগে যাবার গরজ।

এদিক সেদিক থেকে গিধনী কুঁদরি, তিসি, মুংলী, সোমবারীরা তাড়া লাগায়, 'অ্যাই কুশী ওঠ না, তাড়াতাড়ি কর। দেরি করে গেলে শামিয়ানার বাইরে বসতে হবে।' আসলে কেউ কুশীকে ফেলে যেতে চায় না।

কুশী বলে, 'উঠছি উঠছি। আরেকটু জিরিয়ে নিই।'

কুঁদরীরা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেইসময় ঝুম ঝুম আওয়াজ কানে আসে। কুশীরা দেখল, সামনের কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটো ফীটন গাড়ি ছুটে আসছে। ঘোড়ার গলায় ঘুন্টি বাঁধা। তাই ওইরকম শব্দ হচ্ছে।

দূর থেকে দেখামাত্র কুশীরা চিনতে পারল—বড়ো সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ঘোড়ার গাড়ি। কিন্তু ফীটন দুটো এখানে এল কেন? বড়ে সরকারের ঘোড়ার গাড়ি তো কখনও এদিকে আসে না। বিমূঢ়ের মতো সবাই তাকিয়ে থাকে।

কাছাকাছি এসে ফীটন দুটো দাঁড়িয়ে গেল। আর সামনের গাড়িটা থেকে নেমে এল বগুলা ভকত রামলছমন।

দোসাদটোলার লোকজন অবাক। চোখের পলকে বকের মতো লম্বা পা ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে রামলছমন। তাকে দেখে সবাই

উঠে দাঁড়ায়।

রামলছমন বড় বড় ট্যারা বাঁকা দাঁত বার করে বলে, 'সবাই শোন্ আজ তোদের ছুটির শেষ দিন। বড়ে সরকার খুশী হয়ে তোদের নওটঙ্কীর আসরে নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনা হাতে বড়ে সরকার তোদের মরদানাদের ধোতিকুর্তা আর আওরতদের শাড়ি-জামা দেবেন।'

বলে কি বগুলা ভকত! ক'দিন ধরে এসব কী হচ্ছে! রাতারাতি তাদের ভাগ্য কি নতুন করে ফিরে গেল!

ভিড়ের ভেতর থেকে বুধেরি ভয়ে ভয়ে, খানিকটা অবিশ্বাসের গলায় জিজ্ঞেস করে, 'সচমুচ দেওতা?'

'সচমুচ না তো ঝুট নাকি? দেখবি?' বলেই সামনের ফীটনটার দিকে দৌড়ে যায় রামলছমন। ভেতর থেকে চারটে চটকদার রঙিন শাড়ি এনে ফের শুরু করে, 'তোদের বিশোয়াসের জন্যে এগুলো নিয়ে এসেছি। সমঝা?'

বিহ্বলের মতো সবাই শাড়ি ব্লাউজগুলো দেখতে লাগল। এরপর তারা যে কী বলবে, ভেবে উঠতে পারছিল না।

রামলছমন এবার এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসে। একটা করে শাড়ি জামা গিধনী. কুশী, সোমবারী আর তিসির দিকে ছুড়ে দিতে দিতে বলে, 'যা, তুরন্ত পরে আয়। ফীটনে তো বেশি লোকের জায়গা হবে না। আগে তোদের বড়ে সরকারের মকানে রেখে আসি। তারপর এসে এক এক করে সবাইকে নিয়ে যাব।'

দামী শাড়ী-জামা পেয়ে যুবতী দুসাদিনরা একেবারে ডগমগ। চুনাওর কল্যাণে ঝকঝকে হাওয়া গাড়িতে সেদিন চড়িয়েছিলেন প্রতিভা সহায়। সেটা বাদ দিলে যারা চোদ্দ পুরুষে কোনদিন ভাল গাড়িতে চড়েনি তাদের নিয়ে যাবার জন্য বড়ে সরকার তেজী ঘোড়ায়-টানা ঝকঝকে ফীটন পাঠিয়ে দিয়েছেন। অল্পবয়সী সরল গরীব মেয়েগুলো একেবারে দিশেহারা হয়ে যায়। কোন চিন্তা ভাবনা না করেই নতুন শাড়ি-জামা বুকে চেপে দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন বেরিয়ে আসে তাদের আর চেনাই যায় না।

বগুলা ভকত রামলছমন চোখ গোল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর লুব্ধ গলায় বলে, 'তোদের যা দেখাচ্ছে না— বিলকুল স্বরগকা পরী য্যায়সা। কা খুবসুরতী!' বলেই তাড়া লাগায়, 'চল

চল, তুরন্ত গাড়িতে উঠে পড়।'

গিধনী কুশী সোমবারী আর তিসি দৌড়ে গিয়ে ফীটনে ওঠে।

রামলছমন দোসাদপাড়ার বাদবাকি লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোরা কোথাও যাস না। আমি আবার ফীটন নিয়ে আসছি।' বলতে বলতে লাফ দিয়ে সামনের গাড়িটায় উঠে কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসতে বসতে বলে, 'হাঁকাও গাড়ি—'

বহুদর্শী এবং অভিজ্ঞ গণেরি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। তবে তীক্ষ্ণ চোখে রামলছমনের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিল। আচমকা তার কী যেন মনে পড়ে যেতে জোরে জোরে পা ফেলে ফীটনটার দিকে এগিয়ে যায়। ডাকে, 'বরাম্ভনজী—'

টন ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে রামলছমন, বলে, 'কা—'

'আমাকে ঐ লেড়কীদের সাথে নিয়ে চলুন—'

'তু পিছা যাওগে।'

'মগর—'

'ডরো মাত। বড়ে সরকার যেতে বলেছে; ডরের কী? বড়ে সরকার সব কোইকা মা-বাপ।'

গণেরি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে ফীটনজুটো ঝড়ের গতিতে প্রায় উড়েই হাইওয়েতে গিয়ে ওঠে। এতদূর থেকে গলা ফাটিয়ে ফেললেও তার কথা রামলছমন শুনতে পাবে না।

মেয়ে চারটেকে এভাবে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কী যেন আছে! ঠিক কী আছে, বুঝতে পারছে না গণেরি। তবে তার মনে খিঁচ লাগার মতো কিছু একটু লেগে থাকে।

কুশীদের নিয়ে ফীটনজুটো চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। ভূমিদাসদের মহল্লায় সবাই উন্মুখ হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—কখন রামলছমন আসবে, কখন ঘোড়ার গাড়িতে তুলে তাদের সবাইকে নৌটঙ্কার আসরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু নৌটঙ্কী নিয়ে গণেরির দুর্ভাবনা নেই। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে গালে হাত দিয়ে অনবরত সে ভেবে চলেছে, রামলছমন এভাবে মেয়েগুলোকে নিয়ে গেল কেন?

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে নেমে আসে। ক্রমশ রাত বাড়তে থাকে। কিন্তু না দেখা যায় রামলছমনকে, না তার ফীটনজুটোকে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই নৌটঙ্কী শুনতে বেরিয়ে পড়ে।

রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে বিশাল শামিয়ানার তলায় এসে দোসাদপাড়ার লোকজন ঠাসাঠাসি ভিড়ের ভেতর জায়গা করে বসে পড়ে। আপাতত গান শোনা যাক। পরে নয়া জামা-কাপড়ের জন্য রামলছমনকে ধরা যাবে। কিন্তু গণেরির দুশ্চিন্তা কাটে না। সে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কিন্তু আসরের কোথাও রামলছমন কিংবা কুশীদের দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে ভাবনায় তার রক্ত যেন জমাট বেঁধে যেতে থাকে। তাদেরই মেয়ে। দোসাদটোলার সবাই তাকে মুরুব্বি বলে মানে। গণেরির একটা দায়িত্ব তো আছে। কিন্তু গেল কোথায়-ওরা ?

হঠাৎ গণেরির চোখে পড়ে নৌটঙ্কীর আসরের একেবারে ধার ঘেঁষে গদী আর মখমল মোড়া দুটো সিংহাসনে পাশাপাশি বসে আছেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং আর বিজুরি তালুকের মিশিরলালজী।

মিশিরলালজীকে দেখামাত্র বুকের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় গণেরির। আওরতখোর চরণ-ছুঁ জমিদার এখানে কেন ? গারুদিয়া তালুকে মিশিরলালজীর নৌটঙ্কী শুনতে আসার সঙ্গে কুশীদের ফীটনে করে নিয়ে যাওয়ার কোনরকম সম্পর্ক আছে কি ?

একসময় গান শুরু হয়ে যায়। আজ উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর আর আজমগড় থেকে সেরা নৌটঙ্কীর দল আনিয়েছেন রঘুনাথ সিং।

মীর্জাপুরের দলটা এখন গাইতে শুরু করেছে।

দধিয়া ক্যায়সে রে মথু
কানহা ধাইলে রে মনথনিয়া
অভন ডোলে, পবন ডোলে
আউর ডোলে সারি দুনিয়া
শেষনাগকা মস্তক ডোলে
নাগিনকে রে নাথুনিয়া
তবলা বোলে ঢোলক বোলে
আউর বাজে হারমুনিয়া—
শ্রীকিষুণকি মুরলা বোলে

রাধাকে হো পায়জুনিয়া
দধিয়া ক্যায়সে রে মধু—

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই গণেরির। শামিয়ানার ধার দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মিশিরলালজীর ওপর সে নজর রাখতে লাগল।

গান যখন জমে উঠেছে সেই সময় আচমকা উঠে পড়লেন রঘুনাথ সিং আর মিশিরলালজী। লোকজন সরে সরে তাঁদের বেরুবার রাস্তা করে দিল।

গণেরি দাঁড়িয়ে ছিল অনেকটা দূরে—শামিয়ানার আরেক মাথায়। আচমকা বিজুরি চমকানোর মতো একটা ভাবনা সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ভেতর দিয়ে খেলে গেল। শামিয়ানার বাইরে দিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে ছুটল। রঘুনাথ সিংরা যেদিকে ছিলেন অনেকটা ঘুরে যখন সে পৌঁছুল, অনেকটা দেরী হয়ে গেছে। রঘুনাথ সিং আর মিশির-লালজীকে নিয়ে পুরনো আমলের একটা হুডখোলা মোটর তখন হুস করে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বত্রিশ

বিকেলবেলা রামলছমন যখন ফীটন নিয়ে ভূমিদাসদের পাড়ায় এসেছিল, সেই সময় শাল-কেঁদের জঙ্গলে কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্মা।

দুপুরের কিছু পর বেলা যখন হেলতে শুরু করেছে বনভূমিতে ঢুকেছিল সে। সেই থেকে অনবরত ঘুরেই চলেছে।

ঘুরতে ঘুরতে ঘন জঙ্গলের মাথায় রোদের রং বদলে যখন হলুদ হয়ে যেতে শুরু করেছে সেই মুহূর্তে তিনটে চিতার বাচ্চা তার চোখে পড়ল। দক্ষিণ কোয়েলের খাত থেকে একটা সরু স্রোত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। অনেকটা নহরের মতো। নানা গাছের ডালপালা স্রোতটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। জঙ্গল অবশ্য এখানে খুব ঘন নয়। বেশ পাতলাই। শাল কি কেঁদ কি কড়াইয়া গাছগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পীপর গাছের তলায় জলের ধার ঘেঁষে চিতার বাচ্চা তিনটে খেলা করছে।

দেখতে দেখতে ধর্মার চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। পুরো তিনটে

দিন সে এখানে ঘুরছে। তার আগেও কয়েকটা দিন ক্ষেতিতে কাজকর্ম চুকিয়ে সে এখানে ঘুরে গেছে। কিন্তু চিতা দূরের কথা, তার গায়ের একটা ফুটকিও চোখে পড়েনি। আশেপাশে বাচ্চা তিনটের বাপ-মা নেই। এমন অরক্ষিত অবস্থায় চিতার ছানা যে পাওয়া যাবে, ভাবতে পারেনি ধর্মা। তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে সে পীপর গাছটার দিকে এগুতে লাগল। যখন ধর্মা বাচ্চাগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে সেই মুহূর্তে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন উঠল।

চমকে বাঁ দিকে তাকায় ধর্মা। একটা ঝাঁকড়া মতো ঝোপের পাশ থেকে একটা চিতা বাঘিন গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসছে। তার চোখদুটো জ্বলছে। ধারালো দাঁতগুলো বার করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে জানোয়ারটা। গলার ভেতর থেকে গর-র-র্, গর-র-র্ করে একটা হিংস্র আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

চিতার বাচ্চাগুলোকে যত সহজে তুলে নেওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল, ব্যাপারটা তত সোজা না। কাঁধ থেকে টাঙ্গিটা নামিয়ে ধর্মা সতর্ক ভঙ্গিতে একটু তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বাঘিনটা হাওয়ায় ভর করে উড়ে এল যেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো খানিকটা সরে গিয়ে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে ঘাড়ের কাছে কোপ মারে ধর্মা।

বাঘিনটার গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে আর জন্তুটা ছিটকে গিয়ে পড়ে হাত দশেক তফাতে, পড়েই বনভূমিকে চমকে দিয়ে গর্জে ওঠে।

কয়েক পলক মাটিতে পড়ে থাকে বাঘিনটা। তারপর উঠেই আবার ধর্মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাঙ্গির ঘা খেয়ে জন্তুটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

ধর্মা এবারও আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল। বাঘিনটার মুখে টাঙ্গির ঘা ঝাড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা রক্তাক্ত হয়ে গেল সেটার। তবে নিজেকে পুরোটা বাঁচাতে পারল না ধর্মা। বাঘিনীটার সামনের দিকের একটা থাবা লেগে তার কাঁধের খানিকটা মাংস উপড়ে গেল।

ওদিকে দ্বিতীয় কোপটা খেয়ে বাঘিনটা খানিকটা দমে গেল বোধহয়। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে খানিকক্ষণ গড়াগড়ি

দিয়েই দূরে ঘন জঙ্গলের দিকে দৌড়ুল।

ধর্মা তারপরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু না, বাঘিনটার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব সম্ভব পর পর দুটো মারাত্মক ঘা খেয়ে জানোয়ারটা পালিয়ে গেছে। এদিকে জঙ্গলের মাথার ওপর রোদ নিভু নিভু হয়ে আসতে শুরু করেছে। বনভূমির ভেতরটা আরো ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকার নামার আগে এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে। ঐ বাঘিনটা ছাড়াও জঙ্গলে আরো অগুনতি হিংস্র জানোয়ার রয়েছে। বেকায়দায় পেলে ধর্মাকে তারা ছাড়বে না।

ধর্মা আর দেরি করে না। চিতার বাচ্চা তিনটেকে কোলে তুলে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায়।

খানিকটা যাবার পরই ডান দিক থেকে গর-র-র্ গর-র-র্ আওয়াজ আসতে লাগল। চমকে ঘাড় ফেরাতেই ধর্মা দেখতে পায়, খানিকটা দূরে কেঁদ গাছের আড়াল দিয়ে বাঘিনটা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জানোয়ারটা তা হলে পালায় নি।

ধর্মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে, বাঘিনটাও দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাচ্চা তিনটেকে নিয়ে এই বনভূমির বাইরে ধর্মাকে সে যেতে দেবে না।

মনে মনে ধর্মা ঠিক করে ফেলে, জঙ্গল যেখানে বেশি ঘন সেখান দিয়ে যাবে না। গাছপালা যেখানে পাতলা সেখান দিয়েই যাওয়া দরকার। কেননা ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর জখমী বাঘিনের ওপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব না।

মোটামুটি ফাঁকা জায়গা দেখে দেখে এগুতে থাকে ধর্মা। বাঘিনটাও দূরে দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চলেছে। তার ক্রুদ্ধ গর-র-র্ গর-র-র্ গর্জন এই অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেরুবার পর ফের জঙ্গল ঘন হয়ে আসে। খুব সাবধানে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে ধর্মা চলেছে। হঠাৎ মাথার ওপর গর্জন শোনা গেল। বাচ্চাগুলো কোল থেকে নামিয়ে টাঙ্গি বাগিয়ে ধরতে ধরতেই বাঘিনটা উঁচু গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল। এক থাবায় ধর্মার বুকের খানিকটা মাংস এবার ছিঁড়ে নিল জানোয়ারটা। রক্তে গোটা শরীর ভিজে যেতে লাগল তার। আর এরই মধ্যে দ্রুত কোমর থেকে ছুরি বার করে বাঘিনটার পেটে আমূল

ফলাটা বসিয়ে দেয় ধর্মা। যন্ত্রণায় জানোয়ারটা চিৎকার করে দৌড় লাগায়।

ধর্মা অপেক্ষা করল না। বাচ্চা তিনটেকে ফের কোলে তুলে নিয়ে জোরে জোরে উর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে লাগল। এই নিবিড় জঙ্গলে দৌড়ুনো অসম্ভব।

ছুরির ঘা খাবার পরও বাঘিনটা যে পিছু ছাড়েনি, একটু পরেই সেটা টের পাওয়া যায়। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে এবং মাথার ওপর—সব দিক থেকে তার গর-র-র্ গর-র-র্ আওয়াজ শোনা যেতে থাকে।

এদিকে শেষ বেলার নিভু নিভু আলোটুকু জঙ্গলের মাথা থেকে একটানে কেউ সরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে ঝপ করে সন্ধ্যে নেমে আসে।

সতর্ক ভঙ্গিতে জঙ্গলটা পার হয়ে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালির ডাঙায় এসে পড়ে ধর্মা। এখানে অন্ধকারটা বনভূমির ভেতরকার মতো অত ঘন নয়।

হঠাৎ সে দেখল, খানিকটা দূরে সেই বাঘিনটা আস্তে আস্তে পা ফেলে আসছে। অর্থাৎ জানোয়ারটা তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

গা থেকে অনেকটা টাটকা রক্ত পড়েছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল ধর্মার। বাঘিনটার সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছা তার আর নেই। জানোয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে কোন রকমে হাইওয়েতে যেতে পারলেই হয়। ওখানে মানুষজন গাড়িঘোড়া রয়েছে। বাঘিনটা হাইওয়েতে যেতে সাহস করবে না।

এবার লুকোচুরি শুরু করে ধর্মা। নদীর মরা খাত ধরে সোজা না গিয়ে কখনও অনেকখানি ডাইনে যায় সে, কখনও অনেকখানি বাঁয়ে। বাঘিনটা খুব সম্ভব তার মতলব বুঝতে পেরেছে। সে-ও মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

সাবুই ঘাসের জঙ্গলটার কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় বাঘিনটার। আর দূরে দূরে না, একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। হয়ত জানোয়ারটা বুঝতে পেরেছে আর দেরি করা ঠিক নয়, খানিকটা যেতে পারলেই ধর্মা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তার হাতের বাইরে চলে যাবে।

ধর্মাও বুঝতে পারছিল বাঘিনটার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তার বাচ্চা

তিনটেকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। একবার সে ভাবল, মায়ের ছানা মায়ের কাছেই ফেরত দেবে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, এই বাচ্চাগুলোর ওপর তাদের এবং কুশীদের স্বাধীনতা নির্ভর করছে। বাচ্চাগুলো তাদের ছ ছ'জন মানুষের মুক্তির দাম। সে ঠিক করে ফেলল, লড়াই-ই করবে। বাচ্চাগুলোকে বালির ডাঙায় নামিয়ে রেখে ধর্ম টাঙ্গি উঁচিয়ে দাঁড়াল। বাঘিনটাও ওত পেতেই রয়েছে।

দেখতে দেখতে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটা পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে উঠল। ঘণ্টা তিনেক পর দেখা গেল, বাঘিনটা বালির ডাঙার ওপর মরে পড়ে আছে। আর রক্তাক্ত ধর্মা মড়ার মতো ঘাড় গুঁজে রয়েছে। তির তির করে নাকের ভেতর দিয়ে একটু একটু নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

অনেকক্ষণ ওভাবে পড়ে থাকার পর একসময় উঠে বসে ধর্মা। চিতার বাচ্চাগুলো একধারে শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সেগুলোকে তুলে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে হাইওয়েতে চলে এল ধর্মা।

এখন মাঝরাত। চারদিকের সীমাহীন শস্যক্ষেত্র জুড়ে আশ্চর্য নিষুতি।

হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে ধর্মা ভাবল দোসাদটোলায় ফিরে যাবে। পর-মুহূর্তেই মনে পড়ল, সেখানে এখন কেউ নেই। সবাই নৌটঙ্কী শুনতে চলে গেছে। সে ঠিক করে ফেলল, সিধা রাঁচী চলে যাবে। এই সময়টায় একটা দূর পাল্লার বাস পাটনা থেকে রাঁচীর দিকে যায়। আগেও দু-একবার হরিণের শিং কি বাঘছাল নিয়ে ধর্মা এই বাসে রাঁচী গেছে। টিরকের কাছে মাল 'ডিলভারি' দিয়ে দাম-টাম নিয়ে ভোরের বাস ধরে ফিরে এসে জমি চষতে নেমেছে।

কোমরে প্যান্টের পটির ভেতর সবসময় দু-চারটে টাকা থাকে তার। কাজেই ভাড়ার জন্য চিন্তা নেই। এক অসুবিধা নিজের জখমী চেহারা। আঁচড়ে কামড়ে বাঘিনটা তার হাল 'বুরা' করে দিয়েছে। জামা-প্যান্ট ছিঁড়েটিড়ে গেছে। কিন্তু কী আর করা যাবে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। একটু পরেই রাঁচীর বাস এসে ধর্মাকে তুলে নিয়ে গেল।

শেষ রাতে রাঁচীর হোটেলে গিয়ে টিরকেকে জাগায় ধর্মা। তার অবস্থা দেখে টিরকে ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি হোটেল-এর মেডিক্যাল অফিসারের নিদ ভাঙিয়ে ধর্মার হাতে-পায়ে-বুকে ব্যাণ্ডেজ

করিয়ে দেয়। তারপর তাকে নিয়ে যায় আমরিকী সাহেবের কাছে। সাহেব সব দেখেশুনে এবং দুটোর জায়গায় তিনটে চিতার বাচ্চা পাওয়ায় দারুণ খুশি হয়ে ধর্মাকে দুশো টাকা বখশিসও করে। টিরকে কথামতো দাম আগেই চুকিয়ে দিয়েছিল।

তেত্রিশ

দামটাম বুঝে ধর্মা যখন ফেরার বাস ধরল, তখনও অন্ধকার রয়েছে। গারুদিয়া তালুকে এসে হাইওয়ের ওপর নেমে দৌড়ুতে দৌড়ুতে দোসাদপাড়ার দিকে ছুটল সে। আজ সে ছ'জন মানুষের মুক্তি কিনে আনতে পারবে। জীবনে এত বিপুল আনন্দ কখনও তার হয়নি। আজ থেকে এই পৃথিবীতে সে আর কারো ভূমিদাস নয়, এক মহিমান্বিত স্বাধীন মানুষ। প্রায় অর্ধেক রাত বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই করে সে স্বাধীনতার দাম নিয়ে এসেছে।

দোসাদটোলায় ধর্মা যখন পৌঁছুল, বিরাট সোনার থালার মতো সূর্যটা আকাশের তলা থেকে উঠে আসছে।

মহল্লায় পা দিয়েই সে থমকে গেল। কুশী গিধনী সোমবারী আর তিসিদের ঘরের সামনে গোটা পাড়া জড়ো হয়েছে। আর ঐ চারটে মেয়ের মা-বাপ কপাল চাপড়ে সমানে ডুকরে কেঁদে চলেছে। বাকী সবাই শোকাচ্ছন্ন বিষাদ-মাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু দূরে আধবুড়ো মুরুব্বি গণেরি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

ধর্মার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এক রাত সে এখানে ছিল না। তার ভেতর কেউ কি মরে গেল? আস্তে আস্তে ধর্মা গণেরির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া চাচা?'

'সব খতম—' বলে একটু থেমে গণেরি ভাঙা ভাঙা গলায় যা বলে তা এইরকম। কাল বিকেলে ধোঁকা দিয়ে মহল্লার চারটে মেয়েকে রামলছমন নিয়ে গিয়েছিল। তাদের শেষ পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয় মিশরীলালজীর হাতে। সারা রাত আটকে রাখার পর খানিকক্ষণ আগে তাদের পৌঁছে দিয়ে গেছে বড়ে সরকারের পহেলবানেরা।

শুনতে শুনতে হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যেতে থাকেধর্মার। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। টলতে টলতে বসে পড়ল।

সেদিনই দুপুরের দিকে মুনশী আজীবচাঁদের সঙ্গে দেখা করে ধর্মা। সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। গারুদিয়া তালুকে সে আর একটা দিনও থাকবে না। পূর্ব পুরুষের 'করজে'র টাকা শোধ করে কুশীদের নিয়ে গারুদিয়া তালুক ছেড়ে চলে যাবে।

আজীবচাঁদ জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, কী খবর?' 'তোর হাল এরকম হল কী করে?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধর্মা বলে, 'আমাদের 'করজে'র কাগজ দিয়ে দিন। রুপাইয়া শোধ করে এখান থেকে চলে যাব।'

আজীবচাঁদ খাড়া হয়ে বসে। চশমার ফাঁক দিয়ে ধর্মাকে দেখতে দেখতে বলে, 'রুপাইয়া শোধ দিবি! পেলি কোথায়! চোরি করেছিস, না ডাকাইতি?'

'যাই করি, আপনাদের রুপাইয়া নিয়ে নিন।'

'কত রুপাইয়া হুঁশ আছে?'

'আছে। কুশীদের আর আমাদের মিলে দো হাজার ' ধর্মা বলে। সঙ্গে করে পুরো টাকাটাই নিয়ে এসেছে সে। আসার আগে মাস্টারজীকে দিয়ে গুনিয়ে নিয়েছে।

আলমারি থেকে কী একটা কাগজ বার করে দেখতে দেখতে আজীবচাঁদ বলে, 'দো হাজার তোকে কে বলল! পুরা পাঁচ হাজার।'

ধর্মার মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড শব্দ করে যেন চৌচির হয়ে যেতে থাকে। কাঁপা গলায় সে বলে, 'আগে যতবার আপনাকে পুছেছি বলেছেন দো হাজার। এখন বলছেন পাঁচ হাজার!'

'ঝুট! কক্ষনো তোকে দো হাজার বলি নি। যা, ভাগ। আমার জরুরী কাম আছে।'

রাগে ধর্মার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। হাতের কাছে টাঙ্গিটা থাকলে সে আজীবচাঁদের ঘাড়ে হয়ত বসিয়ে দিত। আজীবচাঁদ জানে না, এই মুহূর্তে একটি পরাধীন ভূমিদাসের বুকে কতখানি বিস্ফোরকের সৃষ্টি করল সে।

প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে আসে ধর্মা।

চৌত্রিশ

সুতরাং বাপ-ঠাকুর্দা এবং তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মতো আবার হাল-বয়েল নিয়ে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে নামে ধর্মা। লাঙলের ফলায় ফলায় পাথুরে মাটি উপড়ে ফেলতে থাকে। তার পেছন পেছন আগাছা বাছতে বাছতে কুশীও অনবরত দৌড়ুতে থাকে।

এরই মধ্যে একদিন গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে ভোট হয়ে গেল। ভূমিদাসদের পাড়ার চার ঘর আর গণেরিরা বাদে বাকী সবাই লাইন দিয়ে চুনাওর কাগজে মোহর মেরে এল।

পাঁচ ঘরের ভোট না পড়াতে কিছুই যায়-আসে নি। রঘুনাথ সিং শেষ পর্যন্ত সুখন রবিদাস আর প্রতিভা সহায়ক হারিয়ে জিতে গেলেন।

জেতার পর তাঁকে ঘিরে নতুন করে অকালে ফাগোয়া শুরু হল। আবীর আর গুলালে গোটা গারুদিয়ার আকাশ বাতাস লাল হয়ে যেতে লাগল। গলায় গোছা গোছা মালা পরে একটা জিপে উঠে হাতজোড় করে গাঁওয়ের পর গাঁওয়ে ঘুরতে লাগলেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। যারা তাঁকে ভোট দিয়েছে তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে বেরিয়েছেন। তাঁর চুনাওকর্মীরা 'রঘুনাথ সিং অমর রহে—' করে করে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে। আর পা-চাটা কুত্তারা 'হোয় হোয়, রামরাজ আ গিয়া রে' করতে করতে গলায় রক্ত ওঠাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ভূমিদাসদের পাড়ায় এলেন রঘুনাথ সিং। ভোটের রেজাল্ট বেরুবার পর তিনি আজ লাঙল চষা থেকে ছুটি দিয়েছেন ওদের।

রঘুনাথ সিং জীপে দাঁড়িয়েই বললেন, 'তোদের জন্যেই আমি জিততে পারলাম। তোদের কী বলে যে ধন্যবাদ দেব! আর দেবই বা কেন? আমি তো তোদেরই একজন—তোদেরই লোক। তোদের ভালাইর—'

ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল ধর্মা আর দেখছিল। রঘুনাথ সিংয়ের কথা শেষ হবার আগেই চিৎকার করে উঠল, 'ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনিকো আদমী নেহী। তুই আমাদের লোক না, আমাদের লোক না, আমাদের লোক না—'

আচমকা বাজ পড়লেও কেউ এত চমকাতো না। মুহূর্তে সমস্ত

এলাকাটা স্তব্ধ হয়ে যায়। আর তার মধ্যেই বিস্ফোরণের মতো গারুদিয়া-বিজুরির সীমাহীন মাঠ প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধর্মার কণ্ঠস্বর চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, 'তুই আমাদের লোক না, তুই আমাদের লোক না—'

এই একটা কথা উচ্চারণ করতে কয়েক পুরুষ আর কয়েক শো বছর কেটে গেছে তাদের।